505

গৃহশ্রী

রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
কবিশেখর বি-এ, ডি-লিট

(খ্যাতনামা ডাক্তার, কবিরাজ ও বিশেষজ্ঞগণের
লিখিত পরিশিষ্ট-সহিত)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

চৈত্র—১৩৩০

মূল্য দুই টাকা মাত্র
রাজসংস্করণ আড়াই টাকা

প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

নবম সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

বঙ্গসাহিত্যের চির-হিতকামী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়-কল্পতরু

বদান্যবর, ধর্ম্মনিষ্ঠ

লালগোলাধিপ

শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ

রায়বাহাদুরের

শ্রীকর-কমলে

ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে আমার এই

"গৃহশ্রী"

অর্পণ

করিলাম

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন



ভূমিকা

বাড়ীর মেয়েদিগকে ঘরকরণা সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়া এই পুস্তকের সূত্রপাত করিয়াছিলাম, তখনই ইহা অন্তঃপুরের সীমার বাহির করিয়া প্রকাশ করার সঙ্কল্প করি নাই। কিন্তু লিখিতে লিখিতে পুঁথি বাড়িয়া গেল এবং ইহার অবয়ব দস্তুরমত একখানি বহির মত হইয়া গেল, এজন্য কয়েকজন বন্ধুর আগ্রহে এই পুস্তক প্রকাশ করা হইল। নিজের বহুদর্শিতার ফল ইহাতে দিতে চেষ্টা করিয়াছি, শাস্ত্র ঘাঁটিয়া শ্লোকের অর্থ বাহির করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে যাই নাই।

আমার কতিপয় বন্ধু পুস্তকখানি যাহাতে সকল বিষয়ে কাজে লাগে, এইজন্য নিঃস্বার্থভাবে শ্রম করিয়া আমাকে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের লেখা লইয়াই পরিশিষ্ট। তাঁহাদের নিকট এজন্য আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। পরিশিষ্টের যে অংশে মাসিক ও দৈনিক বেতনের হার এবং জিনিষপত্রের ওজন ও দর দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ প্রমথনাথ সরকারের সাহায্যে প্রস্তুত করিয়াছি। বেতনের দৈনিক হার দিতে যাইয়া কড়া-ক্রান্তিগুলি অনাবশ্যক বোধে বাদ দিয়াছি। চিকিৎসা সম্বন্ধে নিতান্ত শিশুদের পক্ষে যে সকল ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোন কোনটি যদি প্রচলিত ব্যবহারের অনুকূল না হয়, কিংবা তৎসম্বন্ধে যদি গৃহস্থের কোন দ্বিধা বা সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে বিশ্বাসী চিকিৎসকের মত লইয়া কাজ করাই ভাল। বলা বাহুল্য, যাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কৃতী ও বিখ্যাত ব্যক্তি, তাঁহাদের ব্যবস্থা সর্ব্বজনাদৃত। তৎসম্বন্ধে আমার অধিক আলোচনা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র।

পুস্তক রচনার সংবাদ পাইয়া ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত লালগোলার রাজা-বাহাদুর গ্রন্থকারকে ৫০০৲ টাকা দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার বদান্যতা চির-পরিচিত। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার নামে পুস্তক-

খানি উৎসর্গ করিলাম। উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়া তিনি আমাকে করিয়াছেন। মলাটের ছবিখানির মালীক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপ তাঁহার অনুমতিক্রমে উহা ছাপাইতে পারিয়াছি। ৫০ পৃষ্ঠার ১০-১২ ভাবে যে ছবিখানি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কলিকাতা জুবিলি-আর্ট-এক প্রিন্সিপাল ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রণদাপ্রসাদ গুপ্ত আঁকিয়া দিয় ইঁহাদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৭, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা
১লা ফাল্গুন, ১৩২২ বাং

শ্রীদীনেশচন্দ্র ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এক বৎসরের মধ্যেই 'গৃহশ্রীর' প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হই সুতরাং পুস্তকখানি সাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে, এরূপ মনে এবার পুস্তকখানি স্থানে স্থানে সংশোধন করিলাম।

১২ই বৈশাখ, বাং ১৩২৪
বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ৫

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দুই বৎসর হইতেও অল্প সময়ের মধ্যে এই পুস্তকের দুইটী স নিঃশেষ হইল, ইহাতে অনুমান হয়, পুস্তকখানি সাধারণের নিকট লাভ করিয়াছে। এবার পুস্তকখানি মাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় মে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই সংস্করণে পুস্তকখানি আদ্যন্ত শোধিত হইল। সুহৃদ্বর ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় f এম-ডি, মহাশয় তাঁহার লিখিত অংশ কতকটা পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিয়া তাঁহার এই নিঃস্বার্থশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

২৮শে মাঘ, ১৩২৪ বাং
বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ৫

সূচী

গৃহশ্রী

১

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে

গৃহিণীর উপরই গৃহ-সুখ নির্ভর করে। শুধু প্রচুর অর্থ থাকিলেই গৃহের ব্যবস্থা ভাল করা যায় না। কোন দরিদ্রের সংসারেও গৃহিণীর নিপুণতায় গৃহটি উজ্জ্বল দেখায়; আবার কোথাও বা প্রচুর দ্রব্যাদি ও নানা মূল্যবান্ উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সুব্যবস্থার অভাবে গৃহটি একেবারে শ্রীশূন্য হইয়া যায়। অনেক বাড়ীতে দেখা যায়, বহুমূল্য কিংখাপের শয্যা ধূলায় লুটাইতেছে; সুন্দর সুন্দর তামা-কাঁসার দ্রব্যাদি যথা তথা পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে; সেগুলি উত্তমরূপে মাজা না হওয়াতে তাহাদের দীপ্তি নাই; বড় বড় হল নানাপ্রকার দ্রব্যাদি লইয়া ব্যাপারীর নৌকার মত বোঝাই হইয়া আছে। বাড়ীতে অনেক ভৃত্য ও পরিচারিকা থাকা সত্ত্বেও কার্য্যের শৃঙ্খলার অভাবে তাহারা বাজে কাজে নিযুক্ত থাকিয়া গৃহস্থালীর কোনও উপকারে আসিতেছে না। কেহ ঘুমাইতেছে, কেহ বা ক্রমাগত বাজারে ঘুরিতেছে; একেবারে যাহা আনিতে পারে, তজ্জন্য দশবার ঘুরিতেছে। যাহা কিছু গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয়, তদপেক্ষা অনেক বেশী সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও যেন কিছুতেই সংসারের অভাব মিটিতেছে না। গৃহখানি রাশি রাশি উপকরণ লইয়াও শোভা-সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে!

গৃহে শৃঙ্খলা

আবার এমন অনেক সংসারও আছে, যাহাতে সকল জিনিষই সুন্দর দেখাইতেছে; তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলিও যেন দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া দারিদ্র্যের মলিনতা ঢাকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। সাধারণ একটা বিজ্ঞাপনের ছবি বাঁশের ফ্রেমে বাঁধাই হইয়া ঘর আলো করিতেছে; অতি সামান্য শয্যা পরিষ্কার চাদর ঢাকা থাকিয়া সুন্দর দেখাইতেছে; গৃহের উঠানটি ধব্‌ধবে, ভাঁড়ারে চাল-ডাল অতি যত্নসহকারে রক্ষিত; দরিদ্রের সংসার, তবুও দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণীর হস্তের কুশলতা যেন সমস্ত মালিন্য ঘুচাইয়া দিয়াছে; গৃহে দারিদ্র্য প্রবেশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভুল করিয়াছে বলিয়া যেন শঙ্কিত হইয়া আছে!

ধনীর বাড়ীতে বহু খরচ-পত্র হইতেছে। বড় বড় রুই কাতলা আসিতেছে; ভাল ঘি ও নানাবিধ শাক-সবজী মাথায় করিয়া মুটে দিনরাত্রি আনাগোনা করিতেছে; কিন্তু হয় ত ব্যবস্থার অভাবে তাহা কাহারও তৃপ্তিসাধন করিতে পারিতেছে না। ভাঁড়গুলি মলিন, তাহাদের গায়ে তৈল, ঘি, ময়দা প্রভৃতির সঙ্গে বহুদিনের ময়লা জমিয়া গিয়াছে। ভাঁড়ারে চাল ডাল ময়দা কতক কতক মাটীতে পড়িয়া আছে, যরে যে ইচ্ছা, সে সেই ভাবে তাহার ব্যবহার করিতেছে; ইন্দুর, কাক, আরশোলা সেখানে দস্তুরমত বাসা করিয়া আছে; রান্নাঘরে কয়লা ও তৈলের শ্রাদ্ধ হইতেছে; চাকর-চাকরাণীরা ও রাঁধুনী সুবিধা পাইলেই চুরি করিতেছে ও নানা খাদ্যদ্রব্য ও মিষ্টান্নের সমাগম সত্ত্বেও হয় ত কর্ত্তা ও শিশুগণ খাবার সময় অনেক জিনিষই পাইলেন না। যাহার অসুখ, সে সময়মত পথ্য পাইল না; ঔষধ খাইবার সময় দেখা গেল, একটা অনুপান ভুলক্রমে আসে নাই; রাত্রে হঠাৎ কাহারও জ্বর হইলে দেখা গেল, ভাঁড়ারে এক টুক্‌রা মিশ্রি নাই, বার্লি খাওয়ার সময় একটু কাগজি-লেবু পাওয়া গেল না, তখন বাজার বন্ধ।

কেবল অর্থে সংসারের সুখ হয় না, এবং অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থা সত্ত্বেও গৃহস্থ গৃহ-সুখ হইতে বঞ্চিত না হইতে পারেন। গৃহিণীর গুণপনা ও কার্য্যকুশলতার উপরই সংসারের সুখ-দুঃখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এজন্য আমাদের মেয়েদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া দরকার, যাহাতে তাঁহারা ভালরূপ গৃহস্থালী শিখিতে পারেন। যাঁহাদের অবস্থা খুব ভাল, তাঁহাদের গৃহেও যদি গৃহিণী সুনিপুণ ও কার্য্যকুশলী না হন, তবে সে গৃহও অনেক সুখ হইতে বঞ্চিত থাকে ; আর যাঁহারা দরিদ্র, তাঁহারা সুগৃহিণীর অভাবে সংসারের সমস্ত সুখ হইতেই বঞ্চিত হইবেন।

কোন কোন গৃহিণী প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে পারেন ; তাঁহাকে রান্নাঘরে বসাইয়া দাও, তিনি বড় বড় ডেগ ও কড়াইয়ের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়া দিবারাত্র রাঁধিতেছেন ; এবং যাহা রাঁধিতেছেন, তাহা খাইয়াও হয় ত লোকে সুখ্যাতি করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ গৃহিণীর সংখ্যা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্ত্রীলোক শুধু রান্নার কার্য্যে নিপুণা হইলেই কি সুগৃহিণী-পদবাচ্য হইবেন ?

গৃহিণী শুধু রাঁধুনী বা পরিচারিকা নহেন

এমনও দেখা যায় যে, সেই গৃহিণীর শিশু-পুত্র রান্নাঘরের এক কোণে বসিয়া আলপিন গিলিতেছে, কিংবা কেরোসিনের ডিবির কালী মুখে মাখিতেছে, কিংবা জলের কলসী ফেলিয়া দিয়া জলের মধ্যে গড়াগড়ি যাইতেছে ; গৃহিণী কড়াতে তৈল প্রদান ও মৎস্যে হলুদ মাখা কার্য্যে এত ব্যস্ত যে শিশুপুত্রের দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর পাইতেছেন না ; অথবা যদি সেই দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, অমনই উঠিয়া এক বৎসরবয়স্ক শিশুর পৃষ্ঠে কষিয়া চড় মারিতেছেন। হয় ত অবস্থা তেমন ভাল নহে, বেশী চাকর-চাকরাণী নাই, সেই সময় স্বামী আফিসে যাইবার সময় তাঁহার জামা খুঁজিয়া চীৎকার করিতেছেন ; গৃহিণী রান্নাকার্য্যে মনোযোগ বেশী থাকাতে, সে দিকে

মোটেই লক্ষ্য করিতেছেন না। এরূপভাবে অনেক সময় অহেতুক কলহের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যিনি রান্না করিবেন, তাঁহার এটাও দেখা উচিত, যে সকল বস্ত্র শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বৃষ্টিতে ভিজিতেছে কি না; ছোট ছোট শিশু সকলের কে কোথায় কি অবস্থায় আছে; যাঁহারা যে সময় খাইয়া থাকেন, তাঁহারা খাইয়াছেন কি না; রুগ্ন ব্যক্তির খাদ্য যথাসময়ে প্রদত্ত হইয়াছে কি না; বাড়ীর সকলের অভাবাদির কি কি পূরণ হয় নাই এবং শিশুরা রাস্তায় ঘুরিয়া ফেরীওয়ালার নিকট হইতে ভাজা-কড়াই কিনিয়া খাইতেছে কি না। এই কার্য্য দুরূহ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মীকে ঘরে আনিতে হইলে বিনা তপস্যায় চলিবে কেন? চারিদিকে মনোযোগ না রাখিলে গৃহস্থালী সুসম্পন্ন হইতে পারে না। যিনি কর্ত্রী হইবেন, তাঁহাকে সেই সকল শিক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। যাঁহার অনেক পরিচারক ও পরিচারিকা আছে, তাঁহারও মনটি এইভাবে দশদিকে রাখিতে হইবে। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চাকরদিগকে যথাযোগ্য কর্ত্তব্যে নিযুক্ত করিবেন। মূল কথা, গৃহস্থালীর সমস্ত চিন্তাটি যে রমণীর মাথায় থাকিবে, তিনিই গৃহিণীপদের যোগ্যা। এ কথাটি মনে রাখিতে হইবে, গৃহিণী শুধু রাঁধুনী নহেন, তিনি শুধু পরিচারিকা নহেন, তিনি গৃহাশ্রম চালাইবার শুধু একটা যন্ত্র নহেন। গৃহের যাহা কিছু, তিনি তাহার সকলের নিয়ন্ত্রী। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

রান্নাঘরে

কোন কোন গৃহিণীর নিজের রান্নাবান্না করিবার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তথাপি রান্নাঘরের তিনিই কর্ত্রী, রাঁধুনী নহেন। তাঁহার ইঙ্গিতে রাঁধুনী পরিচালিত হইবে, কারণ, কোন্ জিনিষটি বাড়ীর কে খাইতে ভালবাসেন, সেই গৃহে তাহার শরীরের পক্ষে কোন খাদ্য উপযোগী, এ সমস্ত গৃহিণীই জানেন; রাঁধুনী উনানে

আগুন চড়াইয়া ডেগ ও হাঁড়ি নামাইয়া দিলেই খালাস, সুতরাং তাহার উপর একেবারেই নির্ভর করা চলে না। বিশেষ যাহার উপর সম্পূর্ণরূপে জীবন নির্ভর করে, সেই খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করার ভার বেতনভুক্ ব্যক্তির উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। সুতরাং অবস্থা উন্নত হইলে যে, স্ত্রীলোক রান্নার সঙ্গে সম্পর্কবর্জ্জিত হইবেন, এ ধারণা ভুল। কোন সময়ে তিনি স্বয়ং রান্নাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন—তখন তাঁহার অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি। তিনি শুধু রান্না করেন ও পরিবেশন করেন, এজন্য তিনি অন্নপূর্ণা নহেন, রাঁধুনীও তাহা করিয়া থাকে। তাঁহার রান্না ও পরিবেশন সমস্তই স্নেহ-জড়িত; গৃহে কর্ত্তা হইতে ভৃত্যগণ, এমন কি, গৃহপালিত কুকুরটি পর্য্যন্ত সকলের প্রতিই তাঁহার স্নেহের দৃষ্টি থাকিলে, সেই রান্না অমৃত-তুল্য হইয়া থাকে। এই জন্য তিনি অন্নপূর্ণা। আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণ বহু স্থানে এই অন্নপূর্ণা-গৃহিণীর চিত্র কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শিবায়নে পরিবেশন-নিরতা উমার মূর্ত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"দিতে নিতে গতায়াত নাহি অবসর।
শ্রমে হ'ল সজল কোমল কলেবর॥
ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে॥"

যাঁহারা সুগৃহিণীর রাঁধা অন্ন খান নাই, তাঁহারা এই অন্নপূর্ণার চিত্র কোথায় পাইবেন?

কিন্তু যে সময়ে তিনি নিজে রান্না ও শ্রমভার অপরের হাতে দিবেন,—তখনও তিনি নিজে পরিবেশনের তত্ত্বাবধায়িকারূপে উপস্থিত থাকিবেন, কারণ, গৃহের এই ব্যাপারটি গৃহিণীর অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। গৃহের কে কি খাইল,—এইজন্য উৎকণ্ঠা নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহজনিত; এই বৃত্তি নষ্ট করিলে রমণীর স্বভাবের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।

স্ত্রী-শিক্ষা

স্ত্রীলোক পুরুষের মত উচ্চ শিক্ষা করিবেন কি না, সেই দুরূহ প্রশ্নের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখন আমাদের সমাজে যে অবস্থা আছে, তাহাতে গৃহস্থালী শিক্ষাই তাহার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা। সমাজ যদি সম্পূর্ণরূপে ভিন্নভাব ধারণ করে, তবে কেহ বা আজন্ম কুমারী থাকিবেন, কেহ রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা বিষয়ধর্ম্ম বিভাগে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে অগ্রসর হইবেন; যদি সত্য-সত্যই এরূপ অবস্থান্তর ঘটে, তখন কি ভাল হইবে, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা চিন্তা করিবেন, এখনও সেরূপ চিন্তা করার সময় উপস্থিত হয় নাই। গৃহের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে পারিলেই স্ত্রী-শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় তাহাই মনে করিতে হইবে।

বর্ত্তমানকালের উপযোগী শিক্ষা কি?

এই শিক্ষা কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৃহের সমস্ত সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, সমগ্রভাবে চিন্তা করিয়া গৃহের ব্যবস্থা করিবার যে শিক্ষা, ইহা তাহাই। এই শিক্ষা যিনি পাইয়াছেন, তিনি কেন যে উচ্চশিক্ষিতা বলিয়া গণ্য হইবেন না, তাহা বুঝিতে পারি না। লেখাপড়া অল্পাধিক পরিমাণে সকলকেই করিতে হইবে; কতকটা সাহিত্য, অঙ্ক ও ইতিহাস জানা থাকা উচিত, হাতের লেখা সুন্দর হওয়া প্রয়োজন। ইংরাজীও কিছু জানা থাকিলে ভাল হয়, যিনি ইহা অপেক্ষা উচ্চশিক্ষার অভিলাষিণী হইবেন, তিনি সংস্কৃত রামায়ণখানি সম্পূর্ণ পড়িলে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। মহাভারত অত্যন্ত বিরাট্ পুস্তক; মাঝে মাঝে তাহা হইতে উপযোগী অংশগুলি পড়িলে জ্ঞানলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

ইদানীং আমরা দেখিতে পাই, যিনি বিবাহের জন্য কোন মেয়ে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আসিয়াই হয় ত জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি কি বই পড় ?" মেয়ে হয় ত "নীতিবোধ," "সরল-সাহিত্য" এবং এরূপ আরও দু পাঁচখানা বহির নাম করিল ; খানিকটা পড়িতে দেওয়া হইল, মেয়ে হয় ত তাহা পড়িয়া গেল ; হাতের লেখা দেখাইল ও ইংরাজী ফার্ষ্ট বুক হইতে ভেড়ার গল্পের ৪।৫ ছত্র পড়িয়া ফেলিল ; কোন কোন অভিভাবককে দেখিয়াছি, মেয়েকে ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাশিকের পরীক্ষা লইতে যাইয়া তাহাকে কাহিল করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা ছাড়া উলের টুপি তৈয়ারী, লেস্-বুনান, উলের ছবি তোলা প্রভৃতির নমুনা লইয়া ত ঘরে ঘরে মেয়েরা প্রস্তুত আছেনই।

বরপক্ষের পরীক্ষা-প্রণালী

এগুলি ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের কি দরকার, তাহাই আগে ঠিক করা প্রয়োজন। মেয়েরা ধরিয়া ধরিয়া লিখিয়া সুন্দর হাতের লেখা দেখাইয়া বরের পিতা ও অভিভাবককে অনেক সময়ে তুষ্ট করেন ; কিন্তু অনেক সময়ে তাঁহাদের এই প্রয়োজনের জন্য এক সেট্ পোষাকী হাতের লেখা থাকে, তাহা দেখাইয়া তাঁহারা প্রশংসালাভ করেন। বিবাহের পর কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়াছে, সামান্য চিঠিখানি লিখিতে তাঁহারা অনেক ভুল করেন, এবং অক্ষরগুলি আঁচড়-কাটার মত বিশ্রী হয়। যাঁহারা ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত শিখিয়াছেন, কার্য্যকালে দেখা যায়, তাঁহারা সামান্য বাজার-খরচের হিসাব রাখিতে অপটু এবং ধোপার হিসাব রাখিতে যাইয়া মোট মিলাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। এরূপ কেন হয় ? তাহার কারণ এই যে, অধিকাংশ স্থলে পিতা কন্যার শিক্ষার কোন যত্ন লয়েন না, কেবলমাত্র বর-পক্ষীয়দিগকে কন্যার, কোনরূপ মুখোস্ পরার মত, একটা কৃত্রিম বিদ্যা-বত্তার পরিচয় দেখাইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টিত থাকেন।

পোষাকী বিদ্যা

মেয়েকে নিত্য নিত্য কি শিখিতে হইবে ?

মেয়েকে যদি অল্প বয়স হইতে বাজার-খরচের হিসাব রাখিতে দেওয়া হয়, ধোপার হিসাবের ভারও তাহার উপর দেওয়া হয়, এবং ভাণ্ডারে জিনিসপত্র কি আছে কি নাই, এবং প্রতিদিন কোন্ জিনিসের কতটা দরকার হয়, ইত্যাদি নিত্য নিত্য প্রশ্ন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে বোধ হয়, জ্যামিতি পড়া ও ত্রৈরাশিক অঙ্ক কষা হইতে অনেক বেশী ফলোদয় হইতে পারে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, বৎসরাবধি চাল, ডাল, তৈল নিজ হাতে গৃহিণী খরচ করিয়াছেন, অথচ মাসে কোন্ জিনিষ কতটা খরচ হইল, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতে পারেন না। সপ্তাহে সপ্তাহে ধোপার বাড়ীতে কাপড় গণিয়া দিয়াছেন, বৎসরে ধোপার হিসাবে কত টাকা গেল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। শিশুকাল হইতে এই সমস্ত শিক্ষায় মেয়েকে ব্রতী করিলে স্বামি-গৃহে যাইয়া তিনি অনায়াসে গৃহবাসী সকলকে স্বীয় পটুতা দ্বারা চমৎকৃত করিয়া তুলিতে পারেন। এই সকল শিক্ষা অতি সামান্য—অথচ ইহাতে পরিশুদ্ধ জ্ঞানের দরকার। জিনিষপত্রের ওজন খুব ঠিকরূপে জানা, যোগ করিয়া মোট টাকা নামাইতে ভুল না হওয়া প্রভৃতি বিষয় শিশুকাল হইতে শুদ্ধভাবে শিক্ষা না করিলে ভাবী জীবনে নানা প্রকার ক্ষতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যিনি ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাশিকে ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া বধূরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন, তিনি ধোপাকে কাপড় দিবার সময় একবার গণিয়া বলিতেছেন ৩০ খানি, আর একবার বলিতেছেন ৩৪ খানি; কিছুতে মোট মিলাইতে না পারিয়া চন্দ্রমুখ মলিন হইয়া যাইতেছে। গৃহে শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গীয় এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে যদি শিশুকাল হইতে অভিজ্ঞতালাভের পথ সুগম না হয়, তবে পোষাকী বিদ্যার্জ্জনে কোন ফল নাই ও তাহা ভবিষ্যতে নানাপ্রকার ক্ষতি হইতে গৃহিণীকে রক্ষা করিতে পারে না।

হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া আবশ্যক এবং বর্ণাশুদ্ধি না ঘটে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত; হাতের অক্ষর ভাল হইলে যে শুধু দেখিতে লেখাটি সুন্দর হইল এবং লোকে দেখিয়া প্রশংসা করিবে, ইহাই মাত্র লাভ নহে; সংসারে সুন্দর ও শুদ্ধ লেখা গৃহিণীর পক্ষে দরকার। তিনিই ভবিষ্যতে তাঁহার শিশুসন্তানদিগের গুরু হইবেন, ইহা মনে রাখিতে হইবে। আমার একজন বন্ধু তাঁহার বড় বড় ছেলের শিক্ষক মনোনীত করিবার সময়ও শিক্ষকের হাতের লেখাটি আগে দেখিতে চাহিতেন। শিক্ষক মহাশয় বি, এ, এম এ পাশ করিলেই শিক্ষাকার্য্যের উপযুক্ত হইবেন ইহা তিনি মনে করিতেন না, তাঁহার হাতের অক্ষর ভাল না হইলে ছেলেদের শিক্ষার ভার তাঁহার হাতে দিতে সম্মত হইতেন না, কারণ, যাঁহার নিজের হাতের লেখা ভাল নহে, তিনি অপরের হাতের লেখা সম্বন্ধে ভার পাইবার উপযুক্ত নহেন, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। ছেলেদের হাতের লেখা সুন্দর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা ইউনিভারসিটিতে পরীক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যদি হাতের লেখা খুব ভাল হয়, তবে ছেলেরা ঢের বেশী নম্বর পাইয়া থাকে। অনেক সময় পরীক্ষায় হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়ার জন্য প্রকাশ্যভাবে শতকরা পাঁচ নম্বরের কথা থাকে, কিন্তু লেখা ভাল হইলে প্রকৃতপক্ষে ছেলেরা শতকরা পাঁচ হইতে অনেক বেশী নম্বর পাইয়া থাকে। কারণ, হাতের লেখাটা বেশ সাজান ও ভাল দেখিলে পরীক্ষকের মন স্বভাবতঃই প্রীত হয়, এবং তিনি মুক্তহস্তে নম্বর দিয়া থাকেন। হাতের লেখা কদর্য্য হইলে, অনেক সময় পরীক্ষক উত্তরের সকল অংশটা পড়িয়া উঠিতে পারেন না এবং তাঁহার মনও স্বভাবতঃ বিরক্ত থাকে, এ অবস্থায় তিনি কুণ্ঠিত হইয়া নম্বর দিয়া থাকেন। মেয়েদের পক্ষে হিসাব রাখিতে গেলে হাতের অক্ষর সুন্দর হইলে জমা-খরচ পরিষ্কার থাকে এবং তাহাতে ভুল হইবার সম্ভাবনা কম হয়। অতি শৈশবে যদি হাতের

হস্তাক্ষর ও বর্ণাশুদ্ধি

লেখার প্রতি যত্ন না লওয়া হয়, তবে একবার অক্ষরের ছাঁদ বিশ্রী হইয়া পাকিয়া উঠিলে চিরকালই তাহা খারাপ থাকিয়া যায়। সেই অতি শৈশবে মাতাই শিশুর আদিগুরু। তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর হইলে তিনি অনায়াসে ছেলে-মেয়েদের হাতের অক্ষর সুন্দর করিতে পারেন। যাঁহার অবস্থা ভাল, সুতরাং যিনি প্রথম হইতেই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে সমর্থ, তাঁহার পক্ষেও আমাদের উপদেশ তুল্যরূপেই উপযোগী। যদি তিনি নিজে সুন্দর লেখার পক্ষপাতী হন, তবে গুরুমহাশয় শিশুগণের শিক্ষাকার্য্যে কিরূপ যোগ্য এবং তাঁহার শিক্ষাগুণে তাহাদের উন্নতি হইতেছে কি না, তাহা বুঝিতে পারিবেন। শুধু মাসে মাসে শিক্ষকের বেতন জোগাইয়া নিজের কর্ত্তব্য হইতে মুক্ত হইলেন, এরূপ ধারণা যাঁহাদের, তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের অনেক সময়েই বিশেষ কোন উন্নতি হইতে দেখা যায় না। পূর্ব্বে ছেলেরা কলার পাত বা শ্লেটে লিখিতে শিখিয়া শেষে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিত। এখন তৎস্থলে দু'পয়সা দামের খাতাতেই তাহারা অনেক সময় লিখিতে সুরু করে। যদি হস্তাক্ষরের দিকে প্রথম হইতে মনোযোগ না থাকে, তবে শিশুরা হিজিবিজি লেখে কিংবা এক পৃষ্ঠায় এক ছত্র লিখিয়া তাহা খারাপ হইলে অপর পৃষ্ঠায় লিখিতে আরম্ভ করে; এইভাবে প্রতি মাসে তাহারা বহু খাতা নষ্ট করিয়া থাকে। খাতাটি শিশু অতি পবিত্র ও আদরের জিনিষ বলিয়া মনে করিবে, তাহার প্রত্যেক পত্র যেন উত্তমরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং তাহাতে যে লেখা হইবে, তাহা যেন অতি যত্নের সহিত তাহারা লিখিতে শেখে, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমার ছেলেদের মধ্যে যাহারা ম্যাট্রিকুলেসন ক্লাসে পড়ে, তাহারাও অনেক সময়ে শ্লেটে লিখিয়া শেষে খাতায় শুদ্ধভাবে যত্নের সহিত তাহা টুকিয়া লয়। যাহারা খাতায় তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সহিত হিজিবিজি লিখিয়া থাকে, তাহারা লেখা-পড়ায় খুব অগ্রসর হইতেছে বলিয়া আমি

বিশ্বাস করি না ; তাহাদের অভ্যাস এরূপ খারাপ হইয়া যায় যে, তাহারা শেষে সেলাই করিতে যাইয়া লাইন সোজা রাখিতে পারে না, রাঁধিতে বসিয়া আধসিদ্ধ ব্যঞ্জনতরকারী নামাইয়া থাকে, কোন কার্য্যই তাহারা ধীরতা বা নৈপুণ্যের সহিত করিতে পারে না।

হাতের লেখা সুন্দর হওয়ার যেরূপ প্রয়োজন, বর্ণাশুদ্ধি-সম্বন্ধে সাবধানতা প্রথম হইতে অবলম্বন করাও সেইরূপ আবশ্যক। বর্ণাশুদ্ধির প্রতি প্রথম হইতে সতর্ক না হইলে শেষে আর তাহার সংশোধন হয় না। অনেকে বি এ, এম এ পাশ করিয়াও সামান্য কিছু লিখিতে ঝুড়ি ঝুড়ি বানান ভুল করিয়া থাকেন। প্রথম হইতে এ বিষয়ে অমনোযোগ থাকায় এরূপ ঘটিয়া থাকে।

শিশুর পক্ষে জননীই আদিগুরু। সর্ব্ববিষয়েই জননী হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, শিশুর জীবনে তাহারই প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়। কারণ, অসীম মাতৃস্নেহ (যাহা জীবনের পক্ষে ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান) যে শিক্ষার নিয়ন্তা, সেই শিক্ষার তুল্য শিক্ষা কোথায়? জননীর মুখ হইতে যে কথা শুনিয়া শিশু ভাষা শিক্ষা করে, সেই ভাষা হইতে মধুর ও শ্রুতিসুখকর ভাষা কে কবে শুনিয়াছে? নিজের সমস্ত স্বার্থ ভুলিয়া, নিজে প্রাণপণ করিয়া, জননী শিশুকে প্রতিদিন যে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা শিশু-হৃদয়ে দেব-ভাষায়, দেব-কথায় চিরতরে লিখিত থাকে। সুতরাং জননীর কর্ত্তব্য সর্ব্ববিষয়ে পালন করিবার জন্য তাঁহার যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। শুধু স্তন দিয়া শিশুকে পোষণ করায়, ও স্নেহ-সুধায় তাহাকে ডুবাইয়া রাখিলেই তাহার উন্নতি হইবে না। তাহাকে সংসারের যোগ্য করিয়া তুলিতেও মাতাই প্রথম সহায় হইবেন, এ সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিত-ভাবে লিখিতেছি।

জননীর কর্ত্তব্য

রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান এ দেশের মেয়েদের চিরন্তন প্রিয় সামগ্রী। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শিক্ষার পক্ষে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এ দেশে আর হইতে পারে না। সীতা ও সাবিত্রীর দুঃখ, দময়ন্তী ও চিন্তার পাতিব্রত্য এবং বিবিধ কষ্টের বিবরণ নয়নের জলে লিখিত; তাহা পড়িয়া স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক কোমল হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। উপন্যাসেও অনেক সময়ে দুঃখ-কষ্টের বিবরণ থাকে, তাহা পড়িয়াও অনেক সময় চক্ষু হইতে জল পড়ে। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বর্ত্তমান উপন্যাসাদির একটা পার্থক্য আছে। বর্ত্তমান লেখকগণ অনেক সময় শুধু মনে কষ্ট জাগাইবার জন্য কোন পারিবারিক ঘটনার বর্ণনা করেন। শুধু দুঃখ-কষ্টের বিবরণ পড়িয়া মনে ব্যথা পাওয়াতে কি লাভ? অনেক সময় শিশু যেরূপ প্রজাপতিটি ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার পাখা ও পা' গুলি ছিঁড়িয়া আমোদ পায়, লেখকও সেইরূপ কোন রমণী বা পুরুষের এক দুঃখ হইতে অপর দুঃখে পড়িবার কথা করুণরসের সহিত বর্ণনা করিয়া ব্যথা দিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ অনর্থক দুঃখ পাঠকের মনে জাগাইয়া কি লাভ হয়? যদি ধর্ম্মের জন্য কিংবা কোন মহৎ ভাবের জন্য কেহ আত্মত্যাগ করিয়া কষ্ট পান, তবে সেই বিবরণ পাঠে পাঠকের মন উন্নত হয়, এবং মহৎ ধর্ম্মভাবগুলি হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে। স্বামীর প্রাণলাভের জন্য বেহুলা কিংবা সাবিত্রী যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কোন্ মহিলার মন বিস্ময় ও উচ্চভাবে পূর্ণ না হইবে? কেহ বা পিতৃসত্য-পালনের জন্য বনে গিয়াছেন, কেহ বা বাল্যকালেই সর্ব্বত্যাগী যোগী সাজিয়া ভগবৎ-আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেহ বা পিতৃস্নেহে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ বা নানারূপ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনের উপর পদাঘাত করিয়া পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। এই সকল উপাখ্যানের

পৌরাণিক উপাখ্যান

অন্তর্নিহিত পবিত্রতা পাঠকের মনকে পবিত্র করিয়া থাকে। তৎস্থলে কোন দুঃশীলা ভ্রাতৃবধূ অকারণে তাহার দেবর-স্ত্রীকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিতেছে, তাহার ফলে সেই নিরীহ রমণী আফিম খাইতেছেন; কিংবা সকল সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে গ্রাসের জন্য কোন পিতৃব্য তাঁহার ভাইপোকে ধীরে ধীরে বিষপ্রয়োগ করিয়া হত্যা করিতেছেন, এ সকল বৃত্তান্ত শুনিলে বা পড়িলে সাময়িক উত্তেজনা বা কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার বিবরণ পাঠ করিয়া কোন উপকার-লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না। অন্যান্য দেশের সাহিত্যে এইরূপ ঘটনায় যে একটা নিষ্ঠুর আমোদ পাওয়া যায়, তাহাই লেখক ও পাঠক চূড়ান্ত মনে করিয়া থাকেন! কিন্তু আমাদের দেশে লোক উপন্যাস ভিন্ন বড় বড় কাব্য-গ্রন্থেও অন্য উদ্দেশ্য স্বীকার করেন নাই, এবং তাই বলিয়া যে এই সকল কাব্যে সাহিত্যিক রস-ধারার অভাব হইয়াছে, তাহা নহে; পবিত্র জীবনের কাহিনীর সঙ্গে আত্মত্যাগ-জনিত নানা কষ্টের কথা জড়িত থাকাতে কাব্য-কথা যেরূপ মনোহারিণী হইয়াছে, সেইরূপ তাহা নৈতিক উন্নতির সহায় হইয়াছে।

উপন্যাস পড়া

উপন্যাস পড়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে আমি বলিতেছি না; কারণ, এখন স্রোত সেই দিকে বহিতেছে,—এই স্রোতের যেটুকু খারাপ অংশ, তাহা আমাদিগকে সামলাইতে হইবে। কতকগুলি উপন্যাস বেশ ভাল আছে, তাহা ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। কিন্তু বাজে ডিটেকৃটিভ-কাহিনী ও গল্প, যাহা রাশি রাশি স্ত্রীলোকেরা পাঠ করেন, সেগুলি পাঠ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া ভাল। বৃথা কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য সেই সকল অসার গল্প পড়িয়া অনেক সময় তাঁহাদের মন সংসার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে।

আমার মনে আছে, শ্যাম-সন্ধ্যায় বা নিবিড় নৈশ অন্ধকারে একটি

ক্ষীণ দীপ-শিখার আলোকে আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী যখন রামায়ণ ও মহাভারত সুর করিয়া পড়িতেন, তখন আমার মন এই সংসার হইতে এক উন্নততর পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিত। ঠাকুরমাতার মুখে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান শুনিয়া যে আনন্দ ও শিক্ষা পাইয়াছিলাম, আর কিছুতে তাহা পাই নাই। ধ্রুব পিতার সভা হইতে তাড়িত হইয়া কঠিন অভিমানে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছিল, তাহার মায়ের একটি কথায় সে আরাধনার পথ পাইল,—মায়ের কথায় পাঁচ বৎসরের ছেলের কি পরিবর্ত্তন ঘটিল! অপূর্ব্ব বিশ্বাসে পাঁচ বৎসরের ছেলে ঘোর রজনীর আঁধারে চলিয়া গেল—কাহাকে পাইতে? যাঁহাকে কত প্রবীণ যোগী আজন্ম তপস্যা করিয়াও পান নাই; যাঁহার পাদপদ্মের জন্য বিশ্ব জুড়িয়া কান্না উঠিয়াছে; যাঁহাকে কে পাইয়াছে জানি না, কিন্তু যাঁহাকে পাইবার জন্য স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া ছুটিয়াছে; ধ্রুব পাঁচ বৎসরের শিশু বনে বনে তাঁহারই সন্ধানে পাগলের মত ছুটিল। কত উপবাস, কত তপস্যা, কত কান্নার স্রোত বহিয়া গেল। অবশেষে সেই বনের ফুলগুলি একত্র হইয়া বনমালা হইয়া গেল, তাহাদের অপূর্ব্ব সুগন্ধিতে বালক দিশেহারা ও চঞ্চল হইয়া উঠিল,—সরোবরের পদ্মগুলি যেন একত্র হইয়া এক বিরাট্ পাদপদ্মের আভাস দেখাইল; আকাশের নক্ষত্রগুলির দীপ্তি রাজরাজেশ্বরের অপূর্ব্ব মুকুটমণি হইল, সমস্ত বিশ্বের কৃষ্ণ ও নীল-জ্যোতি এক বরবপুর কান্তিস্বরূপ হইল, ধ্রুব চক্ষের জলে কি দেখিল, কি যেন পূর্ণরূপে দেখিতে পাইল না;—তাহার কর্ণ শত শত বীণাধ্বনি শুনিল, তাহার নাসিকা শত শত কুসুমের সুরভিতে মত্ত হইল। কিন্তু সেই রূপ চক্ষের জলে সে ভাল দেখিতে পাইল না। সেই ধ্রুবের মূর্ত্তি—বালক যোগীর মত তন্ময়ভাব প্রবীণের অনায়ত্ত, ভক্তিযোগে লভ্য—সেই পরমানন্দের আভাস, আমি যাহা ঠাকুরমাতার মুখে পাইয়াছিলাম, তাহা

ধ্রুব-উপাখ্যান

আর কোথায় পাইব? যাঁহারা গৃহিণী হইবেন, তাঁহারা শিশুকাল হইতে এই সকল ছবি হৃদয়ে আঁকিয়া রাখুন—তাঁহাদের শিশুরা তাহা হইলে এ দেশের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে। কারণ, মায়ের মুখের কথায় এই সকল ছবি শিশুর প্রাণে যেরূপ অঙ্কিত হইবে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু বা রবি বর্ম্মার তুলিতে তাহা হইবে না।

সাংসারিক কাজের জন্য মেয়েদের ইতিহাস শিক্ষার খুব একটা বেশী প্রয়োজন নাই, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোক, কনিষ্ক, আকবর প্রভৃতি বড় বড় রাজাদের কীর্ত্তিকথা, এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতি ধর্ম্মগুরুগণের জীবনী কতক কতক জানা থাকিলে ভবিষ্যতে গৃহিণী স্বীয় সন্তানগণের ইতিহাস শিক্ষার বেশ একটা ভিত্তি গড়িয়া দিতে পারিবেন। ইতিহাসের খুঁটিনাটি, তারিখ বা ছোট ছোট ঘটনা জানার ততটা দরকার নাই। ভারতের ইতিহাসের মোটামুটি ধারাবাহিক একটা জ্ঞান থাকিলে কাজে লাগিবে। যে সকল পুস্তকে ইতিহাস সহজ কথায় গল্পের মতন করিয়া লেখা আছে, তাহাই পড়া দরকার। ইংরেজী ভাষায় এই রকমের অনেক বই আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় বেশী নাই, তবে সেরূপ পুস্তকের সংখ্যা এখন ক্রমশঃ বাঙ্গালা ভাষায় বেশী হইতেছে, এরূপ মনে হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস অপেক্ষা বঙ্গদেশের ইতিহাসের জ্ঞান একটু বেশী চাই। সিংহবাহুর কথা, বড় বড় পাল ও সেন-রাজগণের কথা এবং হুসেন সাহ প্রভৃতি মুসলমান সম্রাটগণের কথা ও আধুনিক শাসনকর্ত্তাদের কাহিনীর মোটামুটি একটা জ্ঞান থাকা চাই। কেহ মেয়েদের উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় গল্পের মতন করিয়া ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ইতিহাস প্রণয়ন করিলে ভাল হয়। একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাসে, অপরাপর কথা সংক্ষেপে সারিয়া বঙ্গদেশের ইতিহাস কতকটা বিস্তারিত করিয়া লিখিত হইলে বোধ হয়, মেয়েদের বেশী উপযোগী হইবে।

ইতিহাস শিক্ষা

ভূগোল সম্বন্ধেও সেই কথা; মোটামুটি পৃথিবীর একটা মানচিত্রে বড় বড় রাজ্য, তাহাদের রাজধানী, বড় পর্ব্বত, হ্রদ, সমুদ্র, নদ-নদীর নাম ও সংস্থান জানিয়া রাখিলে কাজ চলিবে। ভারতবর্ষের বড় বড় নগর, পর্ব্বত ও নদ-নদীর নাম ও সংস্থান জানা চাই, কিন্তু বঙ্গদেশসম্বন্ধে একটু বেশী জানা দরকার। শুধু নদ-নদী ও নগরের নাম জানিলেই যথেষ্ট যইবে না, বাঙ্গালার কোন্ পল্লীতে কোন্ ধর্ম্মনেতা বা মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, তিনি কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, কোন্ পল্লী কোন্ শিল্প-সামগ্রীর জন্য প্রসিদ্ধ, এ সকল ভাল করিয়া জানা দরকার; বড় বড় রেলের লাইন কোন্ দিক্ হইতে কোন্ দিকে গিয়াছে এবং তাহাদের ধারে কোন্ কোন্ নগর ও প্রসিদ্ধ পল্লী আছে, সেগুলিও জানা উচিত।

ভূগোল-শিক্ষা

আমি যে সকল শিক্ষার কথা বলিলাম—ইহার জন্য খুব বড় বড় বই পড়িবার দরকার নাই। প্রতি গৃহেই মেয়েদের জন্য অনায়াসে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। অনেক স্কুল-পাঠশালায় এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু শিক্ষকগণ অনেক সময় জানেন না, মেয়েদের সেই বিষয়গুলির শিক্ষায় কি লাভ। তাঁহারা সনাতন-পদ্ধতি অনুসারে পড়া বুঝাইয়া যাইতেছেন ও মেয়েরা কলরব করিয়া মুখস্থ করিয়া যাইতেছে। আমি, অল্পদিন হইল, একটি বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম, শিক্ষক মহাশয় একটা ইতিহাস-পুস্তকের দুইটি সমগ্র পাতা কোন এক শ্রেণীর বালিকা-দিগকে মুখস্থ করিতে দিয়াছেন, তাহারা গ্রীষ্মকালে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া সেগুলি বিকালে ও সকালে মুখস্থ করিয়া আসিয়াছে, তৎপর যখন পাখীর মত গলা বাড়াইয়া তাহারা আবৃত্তি করিতে লাগিল, তখন আমার মনে হইল, তাহারা সত্যই তোতাপাখী; তাহারা যাহা এত কষ্ট করিয়া মুখস্থ করিয়াছে,

মুখস্থ করা বিদ্যা

তাহার কিছুই তাহারা বোঝে নাই। অমৃত-তুল্য মধুর বুদ্ধদেবকাহিনী তাহারা মুখস্থ করিয়াছিল। কিন্তু এই উপাদেয় বিষয়কে সমস্ত রস হইতে বঞ্চিত করিয়া শিক্ষক মহাশয় এমন শ্রমসাধ্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছিলেন যে, আমার মনে হইল, তিনি সন্দেশকে কুইনাইন মাখাইয়া সেবন করিতে দিয়াছিলেন।

ইংরাজী-শিক্ষা

ইংরাজী শিক্ষা-সম্বন্ধে অবশ্যই কতকটা মতদ্বৈধ থাকিবে। কিন্তু সমাজের উপর যখন যে স্রোত আসিয়া পড়ে, উহা নিজের ইচ্ছার অনুকূল না হইলে দেখিতে হইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে কি না; যদি না থাকে, তবে সেই স্রোতের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইয়া সেই স্রোতকে স্বীয় সমাজের যথাসাধ্য অনুকূল করিয়া আনা উচিত। গল্পে আছে, মিস্ প্যারিঙ্গটন নামক জনৈক বৃদ্ধা রমণী আট্লাণ্টিক মহাসাগরের তীরে কুটীর বাঁধিয়াছিলেন। একদা আট্লাণ্টিক মহাসাগর তীর অতিক্রম করিয়া সেই কুটীরের দিকে আসিতেছে দেখিয়া বৃদ্ধা ঝাঁটা-হস্তে তাহার গতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। তদবধি "মিস প্যারিঙ্গটনের ঝাঁটা" প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহার অর্থ অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা। আমাদের সেরূপ বিফল চেষ্টা করার কোন কারণ নাই। মেয়েদের কতকটা ইংরাজী লেখাপড়ার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। চিঠিখানি বাড়ীতে আসিলে কাহার নামে উহা আসিয়াছে, তাহা পড়িতে পারা গেল না, বাড়ীর পুরুষবর্গ অনুপস্থিত থাকিলে জরুরী পোষ্টকার্ড বা টেলিগ্রামের অর্থবোধ হইল না, ইহাতে অনেক সময় নানাপ্রকারের অসুবিধা ও ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। এজন্য সামান্য ইংরাজীর জ্ঞান গৃহস্থের ঘরে একান্ত প্রয়োজন। শিশুকে ইংরাজী ভাষায় প্রথম শিক্ষা জননীই দিতে পারেন। আজকাল ইংরাজী-শিক্ষার পথ এত সুগম হইয়াছে যে, অভিভাবকগণ

সহজেই মেয়েদিগকে :কিছু কিছু ইংরাজী শিখাইতে পারেন। অসচ্ছল অবস্থায় যখন ছোট শিশুর জন্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করার সুবিধা হয় না, তখন গৃহিণী গৃহকার্য্যের অবকাশে শিশুকে খেলা দেওয়ার ছলে একটু একটু করিয়া ইংরাজী শিখাইলে সংসারের অনেক উপকার হইতে পারে।

এই শিক্ষা কেমন সহজে দেওয়া যাইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে দু-একটা উদাহরণ দিতেছি। এগুলি অবশ্য অতি সহজ—'জানা' কথা। কিন্তু অনেক সংসারেই এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা দেখি নাই। শিশুকে come বলিয়া কাছে আনা এবং go বলিয়া সরিয়া যাইতে বলা, sit down বলিয়া বসিতে আদেশ করা ও stand up বলিয়া দাঁড় করান, eat বা take বলিয়া খাইতে দেওয়া, এবং drink বলিয়া জলপান করিতে বলা,—এই ভাবে ছোট ছোট ইংরাজী ক্রিয়ার অর্থ ও ব্যবহার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে অনায়াসে গৃহিণী ছোট ছেলেমেয়েকে শিখাইতে পারেন। তাহা ছাড়া, this is rice, this is water, this is table, this is chair এই ভাবে ছোট ছোট নাম শব্দ শিখানাও বেশী কঠিন নহে। ইহার পরে go quickly (তাড়াতাড়ি হাঁট), go slowly (ধীরে ধীরে হাঁট), speak loudly, (উচ্চৈঃস্বরে কথা বল), speak slowly (ধীরে ধীরে কথা বল) প্রভৃতি ভাবে ক্রিয়া-বিশেষণের ব্যবহার শিখাইতে পারা যায়। Open the door (দরজা খোল), shut the door (দরজা বন্ধ কর), what is this ? (এটা কি), it is a jack (এটা কাঁটাল), it is a mango (এটা আম), it is fish (ইহা মাছ), প্রভৃতি ছোট ছোট কথা শিশু মায়ের কোলে বসিয়া বিনা শ্রমে শিখিতে পারে। এই ভাবে এখানে আমি একটা ইংরাজী ব্যাকরণের পত্তন দিতেছি,—কেহ এরূপ ভয় পাইবেন না। আমি সে ভয় দেখাইতেছি না। আমি এই বলিতে চাই যে, মাতার নিকট শিশু যদি প্রথমকার পাঠগুলি

কথাবার্ত্তার মধ্যে অভ্যাস করিয়া লয়, তবে তাহা শেষে খুব উপকারে আসিবে। গুরুমহাশয়ের কুঞ্চিত ভ্রূ, আরক্ত চক্ষু ও উদ্যত নেত্রের মধ্য হইতে সরস্বতী বালককে যে উগ্রমূর্ত্তিতে দেখা দেন, তাহাতে বিদ্যার সঙ্গে অনেক সময় সদ্ভাব প্রথম হইতে চটিয়া যায়। খেলার প্রাঙ্গণে মায়ের আঁচল ধরিয়া হাসি ও কৌতুকের মধ্যে যদি অজ্ঞাতসারে সরস্বতীর সঙ্গে মিলন ঘটে, তবে বিদ্যাদেবীও মাতার মত শেষকালে শিশুর আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া উঠেন।

স্ত্রীলোকের গীত-শিক্ষা সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। কিন্তু ভগবান্ রমণীর কোমলকণ্ঠ অনেক সময়ে গানের বিশেষ উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। যাহা স্বভাবগুণে মধুর, এবং যাহা পবিত্র ভাব উদ্দীপনার সহায় হইতে পারি,—তাহা হইতে সংসারকে বঞ্চিত রাখিয়া কোমল-কণ্ঠে গান শুনিবার তৃষ্ণা-নিবৃত্তি করিবার জন্য আবার কে কোন্ কূপে যাইয়া পড়িবে? গঙ্গা কলধ্বনি করিয়া সাগরে যাইতেছেন, যমুনার ঢেউ কত গান শুনাইয়া ছুটিয়াছে! উত্তর-পশ্চিমে হিন্দু-রমণীরা গান গাইতে লজ্জিত নহেন, আমাদের বঙ্গ-পল্লীই কি শুধু ভ্রমরগুঞ্জন ও কোকিল-কাকলি হইতে বঞ্চিত থাকিবে? এ সম্বন্ধে আমাদের সমাজ এখনও খুব অগ্রসর হয় নাই, সুতরাং আমি সভয়ে আমার মত প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারা এ সম্বন্ধে নিতান্ত প্রতিকূল, তাঁহারা মেয়েদিগকে সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত স্তোত্র ও বাঙ্গালা কবিতার আবৃত্তি শিখাইতে পারেন। ধর্ম্মমূলক স্তোত্র শ্রুতিমধুর ছন্দে উচ্চারিত হইলে অনেক সময় সুশ্রাব্য সঙ্গীতেরই মত হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক করিয়া থাকে। আগেকার দিনে মহিলারা সুর করিয়া রামায়ণ-মহাভারত পড়িতেন। সেই সুরের রেশ বহু বৎসর পরে এখনও আমার কানে লাগিয়া আছে।

গান-শিক্ষা

শেলাই শেখার দিকে আজকাল মহিলাগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু

শুধু লেস্ বুনা উলের উপর হরপ তোলা, কিংবা উলের দ্বারা কাপড়ের ছবি আঁকা ইত্যাদি পোষাকী রকমের বিদ্যাশিক্ষায় বেশী লাভ নাই। উহাতে যতটা বাহাদুরী, ততটা উপযোগিতা নাই। এজন্য পেনী, বডিস্, সার্ট, কোট প্রভৃতি জামার ছাঁটকাটা ও তাহা শেলাই করিতে শিখিলে গৃহস্থের অনেক কাজে আসিতে পারে। যাহা নিত্য প্রয়োজনীয়, যাহাতে সংসারে দুপয়সা রক্ষা করা যায়, আগে তাহা শেখা উচিত। পোষাকী বিদ্যা অপেক্ষা সংসারের অভাবমোচনের উপযোগী শিক্ষার প্রতি সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা উচিত।

শেলাই

বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পাঠক বুঝিতেছেন যে, সাধারণ ভদ্র গৃহস্থের সংসারের প্রতিই আমার বেশী লক্ষ্য। যাঁহারা সৌভাগ্যের উচ্চশেখরে আসীন, তাঁহাদিগের গায় সংসারের অভাব অভিযোগের কাদামাটী লাগিবার সম্ভাবনা নাই। সেখানে মহিলাগণের শিক্ষা-দীক্ষায় শুধু নৈতিক জীবন উন্নত হইতে পারে; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের সংসারে এই সকল শিক্ষার অভাব হইলে গার্হস্থ্যরথের চাকা আর চলিতে চায় না, সংসারযাত্রা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমার এই পুস্তকের মূল লক্ষ্য সাধারণ গৃহস্থের সংসারাশ্রম। সেইরূপ সংসারের মহিলাগণের সংখ্যাই বেশী এবং তাঁহাদের উন্নতি অবনতির উপরই আমাদের সমাজের উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

সাধারণ ভদ্রঘরের উপযোগী শিক্ষা

স্ত্রীলোকের উচ্চ-শিক্ষার কেহ ন্যায়তঃ বিরোধী হইতে পারেন না। এই হিন্দুসমাজে বহুসংখ্যক রমণী পূর্ব্বকালে উচ্চশিক্ষা পাইয়াছিলেন; ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ের বৈজয়ন্তী দেবীর কথা আপনারা হয় ত শুনিয়া থাকিবেন। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি সংস্কৃতভাষায় যে সকল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন,

স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা

তাহা সংস্কৃতের সাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপ। বিক্রমপুর জপসা গ্রামবাসী শ্রীযুত রামগতি সেনের কন্যা শ্রীমতী আনন্দময়ী ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিতা ছিলেন। প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের পীঠস্থানের চিত্র তিনি বৈদিক গ্রন্থের নির্দ্দেশানুসারে অঙ্কিত করিয়া বড় বড় পণ্ডিতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা হরি-লীলা কাব্যে তাঁহার সংস্কৃতাত্মক বাঙ্গালায় বিরচিত কবিতাগুলি পাঠ করিলে তাঁহার উচ্চ-শিক্ষার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। শিক্ষা স্ত্রীপুরুষ সকলেরই উন্নতি-পথের সোপান।

কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক জীবন-রক্ষার জন্য যে শিক্ষা না হইলে সংসারে নানা অসুবিধা ও ক্ষতির সম্ভাবনা, আমরা মাত্র সেই শিক্ষা সম্বন্ধেই লিখিয়া যাইব। যাঁহারা সঙ্গীতে মীরাবাই, শাস্ত্রালোচনায় গার্গী, গুণপনায় অরুন্ধতী ও কবিত্বে আনন্দময়ী হইবেন, আমরা তাঁহাদের পথে কাঁটার বেড়ার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু আমরা আটপৌরে গৃহস্থালীর জন্য যে শিক্ষার দরকার, তাহাই লইয়া এই পুস্তক লিখিতেছি, এটি পুনঃ পুনঃ পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমাদের ক্ষুধায় অন্ন এবং তৃষ্ণায় জলের ব্যবস্থা যাহাতে হয়, ছেলেদের পীড়ায় শুশ্রূষা ও তাহাদিগকে ভদ্র-শান্ত করিয়া তুলিয়া উন্নতির পথে প্রবর্ত্তিত করিবার যে শিক্ষা, পুরমহিলাগণ যাহাতে সেইরূপ শিক্ষার কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন, আমরা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি। এই পুস্তকে তদতিরিক্ত শিক্ষার প্রসঙ্গ বেশী থাকিবে না।

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় শিক্ষা

ডাক্তারের সাহায্য ব্যতীত কাহারও সংসার চলিতে পারে না। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কাহারও ছেলেদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। দরজীর সাহায্য ছাড়াও ভদ্রগৃহস্থ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। আমরা যে মহিলাদিগকে এই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিনী করিয়া বহির্জ্জগতের সঙ্গে কারবার উঠাইয়া দিতে পারিব, এমন আকাশ-কুসুম-কল্পনা বা অসম্ভব আশা কখনই

পোষণ করি না। যদি দুচার ঘণ্টা ডাক্তারের আসিতে দেরী হয়, তখন রোগীর জন্য পূর্ব্বেই যে সামান্য ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা মহিলাগণের শিক্ষা করা উচিত। সামান্য কাসি, সর্দ্দি-জ্বর ও পেটের অসুখ প্রভৃতি হইলেও যে ৪৲ টাকা বিজিট্ দিয়া ডাক্তার ডাকিতে হইবে, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। গৃহস্থ অনায়াসে এই ক্ষতি পরিহার করিতে পারেন। পূর্ব্বে প্রায় সমস্ত বঙ্গীয় মহিলারাই নানাপ্রকার টোট্‌কা ঔষধ জানিতেন। পুরুষেরা কষ্ট করিয়া অর্জ্জন করিবেন, মহিলারা যথাসাধ্য গৃহের ক্ষতি সামলাইয়া লইবেন, পুরুষ ও স্ত্রীর এই সমবেত চেষ্টায় গৃহাশ্রম সুখের হইয়া থাকে। এখন টোট্‌কা ঔষধের উপর নানা কারণে বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে। প্রধান কারণ যে, তাহার মধ্যে নানারূপ ভেল ও ভ্রম ঢুকিয়াছে। যাহা হউক এখন ডাক্তারী বা কবিরাজী ঔষধের সঙ্গে সামান্যরূপ পরিচয় স্থাপন করা প্রত্যেক মহিলার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। থার্ম্মেটার দিয়া রোগীর গায়ের তাপ পরীক্ষা করা এবং ঘড়ি দেখিতে জানা এখন ললনাগণের একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার অঙ্গীয় হইয়া পড়িয়াছে। সুখের বিষয়, অনেক ভদ্র-ঘরে, মহিলাদিগের এই বিষয়ে অপরের সাহায্য লওয়ার দরকার হয় না।

ডাক্তারকে ডাকিবার পূর্ব্বে যে সামান্য ডাক্তারী দরকার, তাহা শিক্ষা করা যেমন মহিলাগণের কর্ত্তব্য, সেইরূপ শিক্ষকের হস্তে শিশুকে সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে তাহার যে শিক্ষাটুকু দরকার, গৃহিণী সে শিক্ষার সেইরূপ ভার লইবেন। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে বস্ত্রের দোকানের নানারূপ প্রসার বাড়িয়াছে। বৈদিক যুগের মহিলারা নিজেরা মাকু চালাইয়া বস্ত্র-বয়ন করিতেন। এখন সেই সোণার যুগ আর ফিরিয়া আসিবে না। তখনকার দিনের সামান্য অভাব অতি সামান্য চেষ্টায়ই পূর্ণ হইত, এখনকার সভ্যতা পর্ব্বতপ্রমাণ অভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু বস্ত্রের দোকানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

সামগ্রীর জন্য ছুটিতে না হয় এজন্য গৃহিণী সামান্যরূপ দরজীর কাজ শিখিবেন। ছেলেদের জন্য সর্ব্বদাই জামার দরকার, যদি সেগুলি অবসর মত গৃহিণী প্রস্তুত করেন, তবে কত উপকার হয়! বঙ্গে অনেক গৃহের গৃহিণীরা এ বিষয়ে নিপুণতার পরিচয় দিতেছেন, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে ঘরে ও বাহিরে একটা স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপিত হইবে। ঘরে কতকটা শিখিয়া বালক বাহিরে বিদ্যালয়ে যাইবে, কতকটা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা পাইয়া রোগী দরকার হইলে বাহির হইতে ডাক্তার ডাকিবেন। অনেকগুলি সাধারণ সার্ট, কোট প্রভৃতি বাড়ীতেই প্রস্তুত হইবে, তারপর প্রয়োজন হইলে গৃহস্থ বাজারে যাইবেন। এই সকল শিক্ষা অতি সামান্য ও উহা ব্যয়সাধ্য নহে। দরিদ্র-গৃহস্থও মেয়েদের এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন।

শিশুদিগের শিক্ষা

মাতার শিশুর প্রতি যে স্নেহ, তাহা প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রতি তাহার রক্ষার জন্য ঈশ্বরেরই দয়ার ব্যবস্থা। মাতার স্নেহে দয়াময়ের দয়ার প্রকাশ, মাতাকে স্নেহ শিখাইতে যাওয়ার বাতুলতা কাহার হইতে পারে?

কিন্তু অনেক সময়ে মাতার অত্যধিক স্নেহই শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠে। অবশ্য, মাতা যে শিশুর সর্ব্বপ্রকার হিত-ইচ্ছা করেন, এ সম্বন্ধে সংশয় কাহারও নাই; যিনি শিশুর শুভ-চিন্তা করিয়া তাহার কল্যাণার্থ অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন, তাঁহার বুঝিবার দোষে শিশুর অনিষ্ট হইতে পারে। এজন্য শিশুপালন শিক্ষা করা মহিলাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

কোন কোন মাতা অতি সাবধান ; একটু হিম বা রৌদ্র পাছে শিশুর গায়ে লাগে, এজন্য তাহাকে বাহিরে যাইতে দেন না ; খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে অনেক সময় অতি অল্প কারণে শিশুকে একেবারে শুকাইয়া রাখেন। আমি একজনের সম্বন্ধে জানি, তাঁহার ছোট ছেলেদের কেহই তাঁহার ঠিক নিকটে শুইতে চাহিত না। কারণ এই যে, যে শিশু তাঁহার খুব কাছে শুইত, তিনি সারারাত্রিই তাহার গায়ে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতেন ; এবং কোন সময় যদি তাঁহার কল্পনা এরূপ হইত যে, শিশুর গায় একটু তাপ বেশী হইয়াছে, অমনই পরদিন তাহার ভাত বন্ধ করিয়া দিতেন। আর একজনকে জানি, তিনি তাঁহার যোগ্য ছেলেকে যৌবনে বড় নদী উত্তীর্ণ হওয়ার ভয়ে মুন্সেফী লইতে দেন নাই, সেই ছেলে বৃদ্ধ-বয়সে নিদারুণ দারিদ্র্য-কষ্ট পাইয়াছেন। যে শিশুর পিতামাতা ঐশ্বরিক বিধানেও ভয় পাইয়া ইচ্ছানুসারে তাহার গতিবিধির স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করেন, তাহার ফলে সেই শিশু চিররুগ্ন, দুর্ব্বল ও সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের অযোগ্য হয় ! শিশুদের ধাবন, লম্ফন, উচ্চহাস্য ও বীরোচিত উৎসাহ স্বাভাবিক। এই সকলের মধ্যে তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্ফূর্ত্তি পাইয়া সবল হয়। দৌড়াইলে পায়ের গোড়ালি মচ্‌কাইবে, খেলায় যোগ দিলে বল্ আসিয়া মাথায় পড়িবে, গঙ্গার ধারে গেলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইবে, উচ্চহাস্য করিলে মাথা ধরিবে, এই আশঙ্কায় সর্ব্ববিষয়ে শিশুর প্রকৃতিকে বাধা দিলে, সে কালে যে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অসাবধান হইলে কতকটা বিপদ্ ও পীড়ার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং প্রয়োজনানুসারে যথোচিত সতর্ক করিয়া শিশুকে মুক্ত-বায়ুতে খেলা ও কৌতুকের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

অতি যত্ন

অনেক পিতামাতা শুধু যে কেবল শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত

পরিমাণে ভীত, তাহা নহে। তাহার নৈতিক অবনতি না হয়,—এই জন্ম তাঁহারা অতি চিন্তিত। যখন নীতিজ্ঞান কি, তাহা শিশুর ধারণা হয় নাই ও না হওয়াই উচিত, তখন হইতে শিশুকে সাবধান করা হয়। এই-ভাবে তাহার অর্থশূন্য কাকলিতে বাধা দেওয়া হয়, "আপন মনে বসিয়া কি ছাই বকিতেছিস্?" বলিয়া তিন বৎসরের মেয়েকে তিরস্কার করা —চীৎকার করিয়া কথা বলা খারাপ, তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টাচ্ছলে নানা-প্রকার নীতি-মূলক উপদেশ ও গঞ্জনা দ্বারা শিশুবয়স হইতে তাহাকে ভীত ও পীড়িত করিলে সরল নীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

এইরূপে সর্ব্বদা তাড়না খাইয়া একটি শিশু এরূপ ভয়াতুর হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোনরূপ কষ্ট পাইলে সে মনে করিত, বুঝি কোন অন্যায় করিয়াছে। তাহার একটা ফোঁড়া হইয়াছিল এবং তজ্জন্য খুব যন্ত্রণাভোগ করিতেছিল, তখন সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি আর করব না।" এইরূপে পালিত ও বর্দ্ধিত কোন কোন পঞ্চদশ-বর্ষ-বয়স্ক বালককে দেখিয়া ও তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া আমার ভুল হইয়াছে, এ কি পঞ্চাশৎ বর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিতেছি! হঠাৎ সে এমনই বয়সের অতিরিক্ত বড় বড় জ্ঞানের কথা কহিয়া ফেলিয়াছে যে, সে সকল কথা যেন তাহার মাথা ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে; তাহার সেই জ্যেষ্ঠতাতত্ব কিছুতেই শোভনীয় বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। এই ভাবের অকাল-পক্কতায় শিশু-চরিত্র যে একেবারেই উপাদেয় হয় না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

শিশুকাল হইতেই কতকটা সংযম শিক্ষা দেওয়া যেরূপ অভিভাবকের কর্ত্তব্য, তাহার চরিত্রের সরলতা ও স্বাভাবিকতা নষ্ট না হয়, ইহাও সেইরূপ লক্ষ্য রাখা উচিত।

এই অতিরিক্ত সাবধানতাও বরং ভাল, কিন্তু তাচ্ছিল্য ও অনবধানতায়

শিশুরা অনেক সময়ই একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। মাতার স্নেহ সর্ব্বদাই জাগ্রৎ, কোন অবস্থায়ই আমরা তাহার ত্রুটি কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু সেই স্নেহ ভবিষ্যৎ শুভচিন্তা ও শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত না হইলে শিশু-চরিত্রগঠনে সহায় হয় না। অনেক সময়েই অভিভাবকগণ ছেলেদের কোন যত্নই লন না। মাতা রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়াইয়া—নিজ কর্ত্তব্য সমাধা হইল, এইরূপ মনে করেন,—পিতা তাহাকে স্কুলে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হন; ইহা ছাড়া শিশু কি করিতেছে, দিনের কোন্ অংশ কি ভাবে ব্যয় করিতেছে, তৎপ্রতি তাঁহাদের একেবারেই লক্ষ্য নাই।

অযত্ন

কলিকাতার ছেলেদের প্রধান বিপদ্ ঘুড়ি ও মার্ব্বেল খেলা। ইহাতে শত শত ছেলে একেবারে মাটী হইয়া যাইতে দেখা যায়। ঘুড়ি লইয়া খেলা ছেলেদের অনেক সময় একটা নেশায় পরিণত হয়; এই উপলক্ষে পাড়ায় যত অকর্ম্মা দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে শিশুর একটা পরিচয় হয়, এই পরিচয়ই অনেক সময় তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে।

ঘুড়ি ও মার্ব্বেল খেলা

আমি অনেক ছেলেকে দেখিয়াছি,তাহারা ঘুড়ি লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়, খাবার সময় আসিয়া চারিটি খাইয়া স্কুলে যায় এবং তথা হইতে পলাইয়া কুসঙ্গীদের সহিত মিশে, এবং বিকেলবেলায় পুনরায় ঘুড়ি লইয়া বাহির হইয়া রাত্রি হইলে বাড়ীতে আইসে। পিতামাতা ঘুড়ি উড়ান নির্দ্দোষ আমোদ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু এই ঘুড়ির উপলক্ষে বালক একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ছেলে কুসঙ্গে মিশিয়া কোকেন্ ধরে,—এবং আরও একটু বড় হইলে নৈতিক অবনতির কূপে পতিত হয়। পাড়া-গাঁয় ঘুড়ি খেলাতে এরূপ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা কম, কারণ, সহরের রাস্তায় যেরূপ দুষ্ট ছেলেদের আড্ডা, পাড়া-গাঁয় তাহা নহে।

অনেক সময় তথায় ঘুড়ি নিজেই উড়াইয়া আমোদ বোধ হয়, কুসঙ্গীর দলে পড়িবার আশঙ্কা কম থাকে। মার্ব্বেল খেলা উপলক্ষেও সেই একই বিপদের আশঙ্কা; এ গলি হইতে ও গলি, এইভাবে নানা গলিতে যাইয়া মার্ব্বেল খেলিতে খেলিতে দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, এই সকল আড্ডা বা দলে পড়িলে ছেলেদের আর রক্ষা নাই। ছেলেদিগকে অল্প বয়সে জুজুর ভয় দেখান হয়, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত জুজু এই কুসঙ্গ; জুজু কখনও কোন ছেলেকে ধরিয়াছে বলিয়া জানা নাই, উহা শুধু গল্পের কথা; কিন্তু মার্ব্বেল খেলা উপলক্ষে ও ঘুড়ি উড়াইবার ফলে যে কত ছেলে প্রকৃতই কুসঙ্গে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত, ইহা গল্পের কথা নহে। আমাদের পাড়ায় এরূপ কত ছেলেকে নষ্ট হইতে দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন শুধু খাবার সময় দিন ও রাত্রির মধ্যে এক আধ ঘণ্টা বাড়ী আসিয়া মুখ দেখাইয়া যায়,—তারপর যে কোথায় অন্তর্হিত হয়, এবং দিন-রাত্রি কি করে—তাহার ঠিকানা নাই।

শিশ দেওয়া

এই সকল ছেলেদের মধ্যে একটা বিকট শিশ্ দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। তাহাদের একজন অপর সকলকে ডাকিয়া আনিবার জন্য হাত মুখে লাগাইয়া কপোল টিপিয়া সেই উচ্চ শিশ্-ধ্বনি করে,—সেই শ্যামের বাঁশী বাজিয়া উঠিলে অপরাপর সমধর্ম্মী বালকেরা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, তাহাদের অঙ্গ একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে। যে উপায়ে পারে, সে উপায়ে দলে আসিয়া পড়িবে কি পড়িবেই। এই সকল ছেলেরা অনেক সময়ে ৪।৫ বর্ষ, এমন কি তাহা হইতেও অল্প বয়সে চুরুট ধরিয়া থাকে। অভিভাবকগণ এ বিষয়ে সাবধান থাকিবেন—ছেলেরা বিনা অপরাধে শুধু পিতামাতার তাচ্ছিল্যে এরূপ নরকে না পড়ে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন। এই সকল আড্ডায় মিশিয়া তাহারা অধোগতির নিম্নতম স্তরে নিপতিত হয় এবং

সর্ব্বপ্রকার নীতিজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া পড়ে; অশ্লীল ভাষা তাহাদের কথাবার্ত্তার অঙ্গীয় হইয়া পড়ে; মারামারি ও চুরি প্রভৃতি এই সকল আড্ডাধারীর নিত্য-কর্ম্মে পরিণত হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, ছোট ছোট ছেলেরা সারাটা বৈকাল ছাতে উঠিয়া হাঁ করিয়া উর্দ্ধমুখে ঘুড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে; তাহাদের খাওয়া-দাওয়া জ্ঞান নাই, অন্য চিন্তা নাই, কেবল ঘুড়ির সূতা ধরিবে কিংবা কোন্ ঘুড়ি ছাতে আসিয়া পড়িবার উদ্যত হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিতে থাকে। যে রোগের কথা বলিয়াছি, এইখানেই সেই রোগের সূচনা। সহরবাসী অভিভাবকগণ এই বিষয় হইতে শিশুকে অল্প বয়সেই দূরে রাখিবেন, নতুবা এই রোগ বৃদ্ধি পাইলে বিপদের সম্ভাবনা। ছেলে-দিগকে যতটা সম্ভব গৃহে রাখাই উচিত। কারণ, কলিকাতার রাস্তায় বড় বিপদ্, উহা অনেক সময়ে নরককুণ্ডেরই রাস্তা। ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলায় বিপদের আশঙ্কা অল্প। কারণ, যাহারা এই সব খেলা খেলে, তাহারা মার্ব্বেল-খেলওয়াড় ও ঘুড়ি-চালকদের শ্রেণী অপেক্ষা সাধারণতঃ ভাল। তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া খেলে এবং খেলার সময় বাজে গল্প ও আত্মীয়তা করিবার সুবিধা পায় না। খেলার অবসানে তাহারা এতটা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে যে, শেষে বাড়ীতে আসিতে পারিলে বাঁচে। দুঃস্থ গৃহস্থগণেরই বিপদের আশঙ্কা অধিক; কারণ তাহাদের ছেলেদেরই মার্ব্বেল ও ঘুড়ি লইয়া বাহিরে আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু অতি শিশুকাল হইতে যদি মাতা শিশুকে এইরূপ বাহিরে যাইতে নিষেধ করেন এবং কুসঙ্গ হইতে সতর্ক করেন, তবে তাহার সুবুদ্ধির সঞ্চার হইবে এবং নিশ্চয়ই শিশু এরূপ বিপদে পড়িবে না। আসল কথা, মাতার সর্ব্বদা শিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত,—শিশুকে বাঁধিয়া রাখিতে বলিতেছি না,—এবং তাহার স্বাভাবিক

ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন

উত্তম নষ্ট করিতে কেহই উপদেশ দিবেন না। কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে মাতার স্নেহাতুর সতর্ক-দৃষ্টি রাখা উচিত। ঘুড়িটা আকাশে ছাড়িয়া দিয়া খেলোয়াড় অনেক সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে,—ঘুড়ি আপন মনে আকাশপথে বিচরণ করিতে থাকে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে মালিক সূতা টানিয়া ঘুড়ির গতিবিধি সংশোধন করিয়া লয়। ছেলেকে ছাড়িয়া দিয়াও পিতা-মাতার সেইভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। এবং সে গৃহ-শাসনের বাহিরে যাইয়া না পড়ে, এরূপ ব্যবস্থা রাখা দরকার।

ক্রিকেট প্রভৃতি খেলায় ছেলেকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, যে দলের সঙ্গে খেলা করিতে দেওয়া হইবে, তাহারা কি রকমের ছেলে। যে সকল ছেলে স্কুলে ও কলেজে ভাল, এবং যাহাদের ভাল বলিয়া সুনাম আছে, সেইরূপ ছেলের দলের সঙ্গে মিশিতে দিলে আশঙ্কার কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, ছেলেটির শরীরের অবস্থা কিরূপ, তাহাও ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। যদি বুকের অবস্থা, অথবা, মাথা ভাল না হয়, যদি ছেলে রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য হয়—তবে তাহাকে ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলাইতে না দেওয়াই ভাল। ব্যাডমিণ্টন ও টেনিস্ অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রমের খেলা, যদি তাহাও ছেলের সহ্য না হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে বৈকালে একক বা কোন ভাল ছেলের সঙ্গে গঙ্গার তীরে আধ-ঘণ্টার জন্য ভ্রমণ করিতে দেওয়া ভাল। ফুটবল খেলা অনেক ছেলের পক্ষেই বিপজ্জনক। আমি দুই তিনটি ছেলেকে ফুটবল খেলার ফলে বিষম ব্যাধির কবলে পড়িয়া চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। কিন্তু যাহাদের শরীর বেশ ভাল, স্নায়ু সবল, তাহাদের পক্ষে ফুটবল্ খেলায় কোন হানি নাই। কিন্তু এই খেলা সর্ব্বদাই একটু সতর্ক হইয়া খেলা উচিত।

যাঁহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহারা নিজেদের বাড়ীর উঠানে ক্রিকেট, টেনিস্ ও ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা রাখিতে পারেন।

স্কুলে

কিন্তু ছেলেদের বিপদ্ শুধু রাস্তায় নহে, তাহাদের প্রধান বিপদ্ অনেক সময় স্কুলে। স্কুলে পাঠাইয়া পিতা মাতা নিশ্চিন্ত থাকেন, এই জন্য এই বিপদ্ আরও বেশী হয়, কারণ, উহা নিতান্ত অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করে। অনেক স্কুলের ছেলে স্কুলের নামে বাহির হইয়া কুসঙ্গীর দলে মিশিয়া পড়ে, সেই কুসঙ্গী শুধু গুণ্ডা ও কুচরিত্র নহে, কোন কোন স্থলে গুপ্তষড়্যন্ত্রকারী ও দস্যু—ধর্ম্ম ও উচ্চ উদ্দেশ্যের মুখোস্ পরিয়া বালকের সর্ব্বনাশ করিতে দাঁড়ায়। এই জন্য অনেক সময় বালকের বরং মূর্খ হইয়া বাড়ীতে থাকা ভাল, তথাপি যদি সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান না করিতে পারা যায়, তবে তাহাদের স্কুলে পাঠাইয়া কোন লাভ নাই, বরং ঘোর অনিষ্টের সম্ভাবনা। যে স্কুল বাড়ীর খুব নিকটবর্ত্তী, তাহাতে পড়িতে দেওয়া হউক; তাহার পর ছেলে রোজ স্কুলে কয়টার সময় যায় এবং কয়টার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া আসে এবং এই সময়ের মধ্যে ক্লাস হইতে পলায় কি না, এ বিষয়ে সর্ব্বদা অনুসন্ধান রাখা হউক। যদি কোন দিন চারিটার বেশী পরে স্কুল হইতে ফিরে, তবে সেই দেরীর কারণ বিশেষ করিয়া জানা এবং সাধারণতঃ যাহাতে আসিতে বিলম্ব না ঘটে, তৎপ্রতি অভিভাবকগণের সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। নিকটবর্ত্তী স্কুলে ছেলে দেওয়ার কথা লিখিয়াছি, তাহার অন্য কোন কারণ নাই, তাহাতে সর্ব্বদা ছেলের সন্ধান লওয়ার সুবিধা হয়; এবং পাড়ার স্কুলে পাড়ার ছেলেদের মুখে সর্ব্বদা তাহার গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তত্ত্ব-সংগ্রহ করা সহজ হয়, এই জন্য উহা লিখিয়াছি। যদি একটু দূরের স্কুল ভাল হয় এবং তথায় শিক্ষক পরিচিত থাকেন, তথায় পিতামাতা নিশ্চিন্ত হইয়া ছেলে পাঠাইতে পারেন, তাহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই।

কিন্তু যদি কুসঙ্গে পড়িবার আশঙ্কা থাকে, তবে ছেলে স্কুলে না দেওয়াই ভাল, কারণ, যে ব্যাপারে লাভ নাই—সর্ব্বস্ব-নাশের সম্ভাবনা, এমন ব্যাপারে কে হাত দেয়? মূর্খ ছেলে সচ্চরিত্র ও বিশ্বাসী হইলে তাহারও একটা শুভ-ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায়; কিন্তু হাজার মেধাবী হইলেও ছেলে যদি খারাপ হয়, তবে সে একবারে সমাজের বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার বুদ্ধি যত প্রখর হইবে, সে তত বেশী ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইবে।

ছেলে স্কুলে গেল ও নিয়মিত সময়ে স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিল, কিংবা যথাসময়ে প্রমোসন্ পাইল, ইহাতেই খুব আহ্লাদিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ নাই। তাহার পড়াশুনার কি উন্নতি হইয়াছে, তাহা নিজেরা না পারিলেও কোন শিক্ষিত আত্মীয় কিংবা বন্ধুর দ্বারা সময়ে সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত; তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া যে ছেলে ছোট একখানি ইংরাজী পত্র লিখিতে ভুল করিবে, কিংবা সংস্কৃতে ছোট ছোট কথার অনুবাদ করিতে অক্ষম হইবে—সে কিছুই পড়ে নাই। সামান্য ভগ্নাংশের অঙ্ক কি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা সে সমাধান করিতে পারে কি না,—দেখা দরকার। তাহার হাতের লেখা সুন্দর হইয়াছে কি না এবং লিখিতে বর্ণাশুদ্ধি হয় কি না, ইহা পিতামাতা অনেক সময়ে নিজেরাই দেখিয়া লইতে পারেন। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, বিধাতার আশীর্ব্বাদে ছেলের যেমন বয়স স্বাভাবিক নিয়মে বিনা চেষ্টায় বাড়িয়া যাইতেছে, স্কুল-মাষ্টারের অনুগ্রহে সে বিনা গুণে সেইরূপ প্রমোসন্ পাইয়া যাইতেছে; তার পর প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া তাহার সেই শ্রীবৃদ্ধি ক্ষান্ত হইয়া গেল। স্কুলের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সে কিছুতেই আর কলেজে ঢুকিবার পথ পাইল না।

অনেক সময় যখন পিতামাতা কত কষ্টে নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কুচিত করিয়াও ছেলেদের পড়াশুনার খরচ চালাইয়া থাকেন, তখন কষ্টার্জ্জিত সামান্য আয়ের বৃহৎ অংশ একবারে নিষ্ফল হইয়া কেন পড়িবে,

এটা কি দেখার বিষয় নহে? এই ব্যয় করিয়াই কোন কোন ছেলে জীবনে চরমোন্নতি লাভ করিয়া সমাজের ভূষণ-স্বরূপ হইতেছে, অথচ অধিকাংশ স্থলে মনস্বিতা থাকা সত্ত্বেও ছেলের ভাবী উন্নতি নিষ্ফল হইয়া পড়িতেছে; পিতামাতা এ বিষয়ে উদাসীন না থাকেন, ইহাই আমার বক্তব্য। ইহা নিশ্চয় জানিবেন, পরের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা এ সংসারে চলে না। নিজের দেখিবার ক্ষমতা না থাকিলে অজ্ঞাতসারে যে ক্ষতি সংসারের উপরে আসিয়া পড়িবে, তাহা অনিবার্য্য।

মেয়েদের স্কুলে যাওয়া

মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাইয়া কুসঙ্গীর হাতে পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, কিন্তু তাহাদের অনেক সময় শিক্ষার উন্নতি ভাল হয় না। শিক্ষকের এবং শিক্ষা-প্রণালীর দোষেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় স্কুলে ৫ ঘণ্টা আবদ্ধ থাকার ফলে মেয়েদের স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায়, তাহারা রোগা হইয়া যায়। রূপলাবণ্য যখন মেয়েদের একটা প্রধান মূলধন, তখন তাহা খোয়ান উচিত নহে।

গৃহিণী যতটা শিক্ষিতা হইবেন, সেই পরিমাণে শিশু-সন্তানের উন্নতি-সাধনের যোগ্যা হইবেন। তিনি সকল বিষয়েই শিশুসন্তানের ভাবী জীবন স্মরণ করিয়া এই সমস্ত বিষয়ে উন্নতির অনুকূল শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। অনেক গৃহিণীই ছেলেদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখেন না। শিশু যখন হাঁটিতে শিখিল, তখন হইতেই তাহার একটু একটু শিক্ষার দরকার। অনেক সময়েই দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত বড় ছেলে-মেয়েদেরও অভ্যাসের দোষে বিছানা শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। গৃহিণী অনায়াসে এ সম্বন্ধে ছেলেদের অভ্যাস ভাল করিয়া দিতে পারেন। ঠিক সময়ে শিশুকে শয্যা

শয্যা সম্বন্ধে সাবধানতা

হইতে নামাইলে তাহার অভ্যাস শীঘ্রই সংশোধন হইয়া যাইবে। যিনি সংসারের জন্ত বহু শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত নহেন, যিনি রাতদিন উনানের জলন্ত অগ্নির ধারে বসিয়া গার্হস্থ্য

সাধনা করিতেছেন, তিনি একটু সামান্যরূপ সতর্ক থাকিলেই বিছানাগুলি সময়ে নষ্ট হইয়া যাওয়ার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না, এবং ছেলেদেরও স্বভাব প্রশংসার্হ হইতে পারে। সামান্য ব্যাপারে এই অনবধানজনিত ক্ষতি ও বিড়ম্বনা কেন হইবে?

অনেক সময় দেখা যায়, গৃহিণীর পরিশ্রম-শক্তি ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রশংসিত, অথচ তিন বৎসরের শিশু একটু জল খাইতে চাহিল, তখন তিনি তাহাকে কলসী দেখাইয়া বলিলেন, "যা, ঐ কলসী হইতে গ্লাসে ভরিয়া খা।"

অবিচার

শিশু কলসী বা কুঁজা হইতে জল ভরিবার চেষ্টায় কলসীটি উপুড় করিয়া সমস্ত জল ফেলিয়া দিল, কিংবা কুঁজাটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল; তখন গৃহিণী নির্দ্দয়ভাবে শিশুকে প্রহার করিলেন। যে, যে কার্য্যের উপযুক্ত নহে, তাহাকে তাহার ভার দেওয়া অসঙ্গত। অনেক স্থলে দেখা যায়, শিশুগণ কল হইতে জল খাইতেছে বা তথায় যাইয়া আঁচাইতেছে। কল হইতে জল খাওয়া কোন সময়েই উচিত নহে। একটু বেশী বয়স হইলে বালকবালিকা কলে যাইয়া নিজে আঁচাইতে পারে। কিন্তু ৩।৪ বৎসরের শিশুকে কলের ধারে যাইতে দেওয়া অনুচিত। তাহারা জল বাহির করা বেশ একটা খেলার বস্তু মনে করিয়া দিনরাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কলের কাছে যায়। আঁচাইবার চেষ্টায় জলে তাহাদের মাথা ভিজে এবং তাহাদের জামা ও জ্যাকেট্ জলসিক্ত হইয়া থাকে। সেই জল মাথায় শুকাইয়া যায়, এবং ভিজা কাপড় গায় শুকায়--গৃহিণীর অনেক সময় তাহা দেখিবার অবকাশ হয় না। ফলে যখন ছেলের জ্বর বা নিউমোনিয়া হয়, তখন গৃহিণী

জলের কলে

সংসার শূন্য দেখিয়া সাশ্রুনেত্রে দেবতার নিকট মানত করেন। এবং আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিনরাত্রি যন্ত্রের মত রোগীর শয্যায় বসিয়া শুশ্রূষা করিতে থাকেন। সামান্য ত্রুটির জন্য যে এইরূপ অচিন্তিত বিপদ্ আসিতে পারে, ইহা তাঁহার জানা উচিত।

ছেলেদের বৃষ্টিতে ভিজা, কলের জলে ভিজা, এই দুইটি বিষয়ে সাবধান রাখিলে অনেক বিপদ্ ও ডাক্তারের খরচ বাঁচিয়া যায়; মাতার পক্ষে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া অতি সহজ। তাঁহার যদি এ বিষয়ে লক্ষ্য থাকে, তবে ছেলেরা প্রথম হইতেই এ বিষয়ে নিজেরা সতর্ক হইবে।

ছেলে-মেয়েরা যাহাই করুক না কেন, তাহা প্রশংসনীয়ভাবে করে কি না, তাহা মাতা দেখিবেন। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাজ করিতে অভ্যাস করিলে, পরিণামে নিন্দার ভাজন হইতে হয়। হাতের লেখাটি যেরূপ যত্নের সহিত বিশুদ্ধ ও সুন্দর করা দরকার, সংসারের সকল কাজের মধ্যে তেমনই নিপুণতার প্রয়োজন। মেয়েটিকে এক গ্লাস জল আনিতে বলা হইলে, সে গ্লাসের জল ফেলিতে ফেলিতে লইয়া আসিল কিংবা গ্লাসের গায়ে মাটী লাগিয়া আছে, তাহা লক্ষ্য করিল না। গৃহিণীর এ সকল বিষয়ের সূচনাতেই সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত, এই তাচ্ছিল্য গুরুতর অপরাধ। দোষ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া মেয়েকে সংসারে খুব খাটাইতে হইবে, আমার বলার ইহা উদ্দেশ্য নহে। যে কাজটুকু সে করিবে, তাহা যেন শোভন হয়, তাহাতে তাচ্ছিল্যের ভাব না থাকে, এই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। পাণ আনিতে বলা হইলে, সে হাতে করিয়া পাণটী লইয়া আসিল। যা' হোক্ একখানা রেকাব বা পাণের বাটা বা ছোট পাত্র, এমন কি, কিছু না থাকিলে একটা শালপত্রে করিয়া তাহা আনিলে শোভন হয়। গৃহস্থের গৃহে কন্যাকে অনেক সময়ে ঘর ঝাঁট দিতে হয়। কেহ কেহ এরূপ ভাবে ঝাঁট দেয় যে, গৃহকোণে অনেক আবর্জ্জনা ও ময়লা থাকিয়া যায়;—অসম্পূর্ণ কাজ একেবারেই ভাল নহে। উহাতে যে নিপুণতার অভাব ও মনোযোগের ত্রুটি থাকে, তাহা উত্তরকালে ভাল গৃহস্থালীর অন্তরায় হয়। এই জন্য যে কাজই করিবে, তাহা নিপুণভাবে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া করার যে শিক্ষা, তাহাই শৈশব হইতে গ্রহণীয়। রুচি

কাজে যত্ন

হাতের ছোট কাজে যদি একটু মনোযোগ ও যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তাহা সেই কচি হাতের সোণার বালার মতই উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখায়।

দরিদ্র গৃহস্থের গৃহে নয় দশ বৎসরের বালিকা হয় ত ছয় মাস কি এক বৎসর-বয়স্ক ভাই কি বোনকে অনেক সময়েই কোলে করিয়া থাকে; ইহা না করিলে সংসার চলিবে কেন? মা হয় ত রাঁধিতেছেন কিংবা সংসারের নানা কাজে অক্লান্ত হইয়া খাটিতেছেন, শিশু ভাই বা বোনটিকে কে রাখিবে? কিন্তু সর্ব্বদা ছেলে কোলে করিয়া থাকিলে দেহশ্রী কখনই রক্ষিত হইবে না,—যে সকল মেয়েকে এরূপ করিতে হয়, তাহারা প্রায়ই কৃশ ও রোগা হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে উপায়ান্তর নাই, আমি শুধু এ বিষয়ে পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। শিশুরক্ষার শ্রম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; অল্প সময়ের জন্য উহা আমোদকর; কিন্তু সারাদিন এই শ্রমের ভার থাকিলে বালিকার দেহ কখনই পুষ্ট হইতে পারে না। অনেক গৃহে বালিকারা এই শিশু-রক্ষায় নিযুক্ত থাকে; এমনও দেখা যায় যে, তৎসম্বন্ধে সামান্য ত্রুটি হইলেই সেই কুসুম-কোমলা ধাত্রীটি, পিতা বা মাতার প্রহারে জর্জ্জরিত হয়, সেই দৃশ্য বড় কষ্টের। পিতামাতা বালিকাদিগকে এ বিষয়ে যতটা ছুটি দিতে পারেন, ততই ভাল, আমার এতদতিরিক্ত আর কিছু বলিবার নাই।

ভাই-বোন কোলে রাখা

দরিদ্র-সংসারে শুক্‌না কাপড় গুছাইয়া রাখা, শয্যা প্রস্তুত করা, পরিবেশন করা প্রভৃতি কার্য্যের ভার বালিকাগণের উপর দেওয়া যাইতে পারে। গৃহিণী সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন, বালিকা এ সকল কাজ কি ভাবে করিতেছে। কাপড়গুলি রোদে শুকাইলে ঠিক গুছাইয়া যথাস্থানে রাখা হইয়াছে কি না, বিছানা পরিষ্কারভাবে পাতা হইয়াছে কি না, পরিবেশনের সময় বালিকা ধপাৎ করিয়া ডালের বাটি ফেলিতেছে কি না; কিংবা

কাজ করা নয়, কাজ শিক্ষা

হাতায় করিয়া ব্যঞ্জনাদি পরিবেশনের সময় উহা চারিদিকে এবং ভোজনকারী মহাশয়ের গাত্রে ছিটাইয়া পড়িতেছে কি না; কেহ লবণ চাহিলে বালিকা উক্ত সামগ্রী পরিমাণের চেয়ে ঢের বেশী দিয়া গেল কি না,—কেহ খৈ খাইতে চাহিলে বালিকা ধান বাছিয়া উহা দিল কি না,—এবং কাগজীনেবু কাটিয়া দেওয়ার সময় কর্ত্তিত অংশের ভিতর বীজ রহিয়া গেল কি না, গৃহিণী চিকের আড়াল হইতে বা জানালা দিয়া সর্ব্বদা তাহা লক্ষ্য করিবেন। মনে করিতে হইবে, বালিকা কাজ করিতেছে না,—সে শুধু কাজ শিখিতেছে। গৃহিণী সর্ব্বদা চিন্তা করিবেন যে, বালিকা যাহা কিছু করিতেছে—সকলই তাহার ভাবী জীবনের শিক্ষা! সুতরাং যে সকল ত্রুটি তাহার অশুভকর হইবে, তাহা শৈশবেই সংশোধিত হয়, এজন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিবেন।

পরিষ্কার থাকা

ছেলেদের ছোটকাল হইতেই, মাতা পরিষ্কার থাকার অভ্যাস করাইবেন, জামায় ধূলা লাগিলে যে জামাটা খারাপ হইয়া যায়—ইহা তাঁহার ইঙ্গিতে ছেলেরা বুঝিবে,—নতুবা ক্রমাগত জামা-কাপড় ঝাড়িতেছেন, কাচিতেছেন, ও বকিতেছেন, এরূপ করায় পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। আমি একটি দেড়বৎসর-বয়স্ক শিশুকে দেখিয়াছিলাম, তাহার গায়ে সামান্য একটু কাদা কি ময়লা লাগিলে সে অস্পষ্ট ভাষায় তাহার দিকে লক্ষ্য আকর্ষণ করিয়া, যে পর্য্যন্ত সে ময়লা ধোয়াইয়া না দেওয়া হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত হাত কি পা যেখানে উহা লাগিয়া আছে, তাহা বাড়াইয়া দিয়া অঙ্গুলি দ্বারা তাহা দেখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু যখন তাহার ছয় বৎসর বয়স, তখন তাহাকে আবার দেখিলাম, তখন সে একটা ধূলি-কাদার পুতুল সাজিয়া আছে, তাহার কাপড়ে স্থানে স্থানে তৈল ও কালী মিশিয়া ধোপার অসাধ্য হইয়া আছে, তাহার মাথার চুলে তেলের গাদ জমিয়া জটা ধরিয়া গিয়াছে, এবং ফরসা পা দুখানিতে স্থানে স্থানে বহুদিনের ধূলি-বালিতে কাল বর্ণের ছোট বড় অক্ষর রেখা হইয়া আছে। এইরূপ

হইবার কারণ কি? তাহার স্বাভাবিক পরিষ্কার থাকার একটা জ্ঞান ছিল,—কিন্তু সে সংসারে ধূলি-বালুতে গড়াগড়ি যাইত, সুতরাং তাহার জন্মের সংস্কার সেই সংসারে বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারিল না।

কাপড়ে সামান্য একটু ময়লা লাগিলেই শিশুর দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করা উচিত,—এবং তাহার সম্মুখে মুছিয়া দিয়া বা ধুইয়া ফেলিয়া তাহাকে বুঝান উচিত যে, কাপড় ময়লা করা ভাল নহে। ইহাতে ক্রমশঃ সে সতর্ক হইবে। অনেক বালিকার আঁচল প্রায়ই ধরাশায়ী হইয়া আছে, সেই অঞ্চল-লগ্ন ধূলিতে অঙ্গ মলিন হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী বালিকার দন্তধাবন হইতে স্নানের সময় পর্য্যন্ত, তাহার অঙ্গ পরিষ্কার রাখার প্রতি দৃষ্টিতে রাখিবেন। পা দুখানি বেশ পরিষ্কার থাকে, গ্রীবা ও কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে ময়লা জমিয়া না থাকে,—তৈল ও জলের দ্বারা দেহটি ঝক্‌ঝকে ও পরিষ্কার থাকে, এই সকল দেখা উচিত; অনেক ছেলে-মেয়ের পায়ে এরূপ ময়লা জমিয়া থাকে যে, তাহা আবিষ্কারের পর ক্রমাগত আট দশ দিন সাবান ঘষিয়াও তাহা তুলিতে পারা যায় না।

কোন কোন গৃহিণী গৃহ পরিষ্কার রাখিবার জন্য উৎকট শ্রম করিতেছেন, এরূপ দেখা যায়। একবারের জায়গায় দশবার ঘরে ঝাঁট পড়িতেছে। এই ঝাঁট দিয়া গেলেন, আবার ছেলেরা কাগজ ছিঁড়িয়া, কালী-জল ফেলিয়া ঘর অপরিষ্কার করিয়া গেল; গৃহিণী ছেলেদিগকে গালি দিতে দিতে আবার ঝাঁট দিয়া গেলেন, পুনরায় আসিয়া দেখেন, ধৌত কাপড়ের বস্তা নামাইয়া শিশুরা এদিকে ওদিকে কাপড় ছড়াইয়া ফেলিয়াছে, পুনরায় টুক্‌রা কাগজ ছিঁড়িতেছে এবং গ্লাস ও আপ-খোড়ায় মাটি মাখিয়া উপুড় করিয়া রাখিয়া দিতেছে। এইরূপে গৃহের আবর্জ্জনা কিছুতেই কমিতেছে না, বানের জলের মত ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। গৃহিণীর নিজের যদি গৃহের পরিচ্ছন্নতার দিকে প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টি থাকে, তবে ছেলে-মেয়েরা তাঁহার

চোখের ইঙ্গিতে সাবধান হইয়া যাইবে ; যাহাতে গৃহ অপরিষ্কার হয়, এরূপ কাজ কখনই করিবে না,—কাগজ ছেঁড়া, ধুলি-বালির সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা-স্থাপন, কালীফেলা প্রভৃতি রোগ তাহা হইলে একেবারে সারিয়া যাইবে। সুধু বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইয়া বালকবালিকার পৃষ্ঠদেশে বাস্তকরের ঢোলের মতন সময়ে অসময়ে পিটিলে যে সংশোধন হয়, এ বিশ্বাস আমার নাই। স্নেহ ও যত্নে প্রকৃত সংশোধন হয়,—শাসন দ্বারা যে সর্ব্বদা স্থায়ী শিক্ষা হয়, তাহা মনে হয় না। মৃদুস্বরে নিজের কষ্ট বুঝাইয়া যদি জননী শিশুকে সাবধান করেন, তবে সে নীরবে মাতার কথা বুঝিবে ও হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবে। কারণ, মা যদিও শিশুর চক্ষের জল অনেক সময়েই উপেক্ষা করিয়া থাকেন, মাতার চোখের জল শিশুর প্রাণে বড় লাগে। স্নেহসিক্ত অশ্রুর সঙ্গে মাতা ধীরে ধীরে যে শিক্ষা দান করেন, তাহা কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। এজন্য অবিরত গৃহ পরিষ্কার করার শ্রম ও বিরক্তি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, যাহাতে গৃহ মোটেই অপরিষ্কার না হয়, সেই দিকে বেশী লক্ষ্য রাখা উচিত। গৃহ অপরিষ্কৃত হইলে ঝাঁটার সাহায্যে তাহা শোধরাইয়া লইব, এই ভরসা না করিয়া, যাহারা গৃহ অপরিষ্কার করিয়া থাকে, তাহাদের স্বভাব সংশোধন করা উচিত। দুর্দ্দান্ত ছেলেকে আমি ভয় করি না, যাহার স্বভাব মাতাপিতার তাচ্ছিল্যে বিগড়াইয়া গিয়াছে, সেই ছেলেকেই ভয় করিতে হয়।

জিনিসপত্র লইয়া খেলা

ছেলেদের আর একটা স্বভাব এই যে, যখন বাজারের জিনিসপত্র আসিবে, তখন যাইয়া তাহার প্রতি আক্রমণ করা ;—হয় ত কেহ একটা আস্ত আলু খাইতে বসিল ; কেহ বা একটা বেগুন টানিয়া কাটিতে বসিল ; কেহ বা রন্ধনের সময় মায়ের কাছে বসিয়া এটা ধরিয়া টানিয়া, ওটা ভাঙ্গিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। যদি ছেলে-মেয়েকে তখন সে স্থান হইতে দূরে রাখিতে অসুবিধা হয়, তাহা

হইলে মাতা তাহাদিগকে তাহাদের শক্তি অনুসারে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন ; কাহাকেও কোন জিনিস ঠিক জায়গায় রাখিতে বলিবেন, কাহাকেও বা আর একজনের হাতে কিছু দিয়া আসিতে বলিবেন ; এই ভাবে তাহাদের স্বাভাবিক উদ্যমের একটা ক্ষেত্র আবিষ্কার করিলে, তাহাদের দ্বারা কিছু কিছু কাজও হইবে, তাহারাও কার্য্যের একটা প্রণালী শিক্ষা পাইবে এবং মাতাও আর বিরক্ত হইবেন না। যদি কোন মেয়েকে ভাঁড়ার হইতে কিছু আনিতে বলা হয়, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে, সে জিনিসগুলি—যথা ডাল কি চাল—ছড়াইতে ছড়াইতে আনিতেছে কি না, কিংবা ভাঁড়ার-ঘরে সে মুড়ি-মুড়কি এক করিয়া, চাল-ডাল ছিটাইয়া, একাকার করিতেছে কি না ; গৃহ-কর্ম্মে যদি অতি অল্প বয়স হইতে সাবধানতা শিক্ষা না হয়, তবে গৃহিণী-পদে অভিষিক্ত হইয়াও সেই স্বভাবের আর পরিবর্ত্তন হয় না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে এজন্য সূচনা হইতেই সুশিক্ষার প্রয়োজন।

শুচিবায়ু

আমাদের দেশে "শুচিবায়ু" বলিয়া একটা ব্যাধি আছে ; কোথায় একটা ভাতের মত অপবিত্র জিনিসের সঙ্গে বস্ত্রের স্পর্শ হইল ; কোন নীচ-জাতীয় লোকের পায়ের জলে ধরণী অশুদ্ধ হইয়া আছেন, পাছে সেই অপবিত্র জায়গায় নিজের পা পড়ে, যে কাপড় পরিয়া পুরুষেরা বাহির হইতে আসিয়াছেন, হঠাৎ যদি তাহার কোন অংশ নিজের আঁচলে ঠেকিয়া যায় ; কোন কাক মুসলমানের বাড়ী হইতে উড়িয়া আসিয়া স্বীয় পবিত্র রান্নাঘরের উপর বসিয়াছে, এরূপ বিপৎপাতে কোন কোন মহিলা একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়েন। মা গঙ্গা অবিরত তাঁহাদের সেবায় লাগিয়াই রহিয়াছেন, অথচ কিছুতেই তাঁহারা স্বীয় শুচির আদর্শ রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। এই শুচিবায়ু থাকা সত্ত্বেও গৃহ বাস্তবিক পক্ষে কিসে অপরিষ্কার হয়, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত উদাসীন ; গৃহের মধ্যে যদি একটা পচা গোময়ের স্তূপ থাকে, তবে তাঁহারা

পরম পবিত্র ভাবে অনুভব করেন ; গৃহের কোন জিনিস কিরূপ অনাদরে মাটীতে পড়িয়া ভাঙ্গিতেছে বা পচিতেছে, সে দিকে তাঁহাদের মোটেই লক্ষ্য নাই। শুচির এই বিকৃত আদর্শ ত্যাগ করিয়া, যাহাতে গৃহ প্রকৃত-পক্ষে পরিচ্ছন্ন থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কেহ কেহ দৈব-ক্রমে একটা ভাত বা ব্যঞ্জনের ছিটা বুঝি গায় লাগিল, এমন একটা অমূলক সন্দেহেও লেডি ম্যাক্‌বেথের ন্যায় কেবলই হাত ধুইয়াও যেন সোয়াস্তি পাইতেছেন না, অথচ ছেলেরা কাদা মাখিয়া কালী-বালিতে অঙ্গরাগ করিতেছে, সে দিকে দৃক্‌পাত নাই ; এই অবস্থা ভাল নহে।

কু-অভ্যাস

অনেক ছেলের দেয়ালে খড়ি বা কয়লা দিয়া লেখার রোগ আছে ; কেহ বা লৌহনির্ম্মিত কিছু দিয়া দেয়ালে আঁচড় কাটে ; কেহ কেহ বা বাক্স দেখিলেই তাহার তালার মধ্যে কাঠি চালাইতে থাকে ; অথবা যে কোন একটা চাবি দিয়া তালা খুলিবার চেষ্টা করে, এই সকল অভ্যাস খারাপ ; যাহাতে এরূপ না করে, তজ্জন্য সূচনাতেই সাবধানতা আবশ্যক ; কারণ, এই সকল অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে তাহারা সংসারের জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া এবং ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া ফেলিবে।

মশারির উপর জিনিস রাখা

মশারির উপর কোন জিনিস রাখা একেবারেই উচিত নহে। অথচ অনেক বাড়ীতেই দেখিতে পাওয়া যায়, মশারির উপরটা একটা বড় বাক্সের মত ব্যবহার করা হয় ; তাহার ফলে দিনরাত্র ছেলেরা মশারি ধরিয়া টানা-টানি করিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলে। মশারির উপর জিনিস রাখিলে ছাদের সেই অংশটা নীচু হইয়া পড়ে, এবং খুব ছোট ছেলেরাও তাহা হাতে নাগাল পায়, এবং জিনিস পাড়িবার চেষ্টায় শুধু আমোদ করিবার জন্য মশারির ছাদ লইয়া এইরূপ উদ্দণ্ড ক্রীড়া করে যে, ঘেরগুলি নীচে পড়িয়া যায় এবং তাহাদের অল্পপ্রাণ কিছুতেই সে দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে পারে না।

খাট কিংবা তক্তাপোষের উপর শয়নের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে ছেলেরা যেন না উঠে; অনেক ছেলের চৌকি, খাট ও তক্তাপোষ ঝাঁকা কিংবা তাহাদের উপর খুব উদ্যমের সহিত নৃত্য করা একটা অভ্যাস। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহাতে ঐ সকল জিনিসের আয়ু অতি শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়। কেহ বা ঘটি-বাটিকে খেলার বস্তুতে পরিণত করিয়া ধপাস্ করিয়া তাহা উপরতলা হইতে নীচে ফেলিয়া থাকে, সিমেণ্ট-মাটী বা পাথরের উপর পড়িয়া উহা কুজ-মুাজ হইয়া যায় বা ভাঙ্গিয়া পড়ে। কাঁসার থালা-বাটির ফেরিওয়ালা এই জন্য কোন কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রায়ই আমন্ত্রিত হইয়া আনাগোনা করিয়া থাকে। অনেক সময় ভদ্র-পরিবারের সামান্য আয়ে এই সকল বাজে-খরচ মিটাইয়া কিছুতেই সংকুলান হয় না। আমি শুধু সামান্য কয়েকটা দোষের উল্লেখ করিলাম। যাহাতে গৃহের দ্রব্য-সামগ্রীর ক্ষতি হয়, তৎপক্ষে উই আর ইন্দুরের মত শিশুর দল প্রায়ই লাগিয়াই আছে, তফাৎ এই যে, উই আর ইন্দুরকে শিখান যায় না, কিন্তু শিশুদিগকে অনায়াসে যত্ন দ্বারা সকল বিষয়েই সৎ-শিক্ষা দিয়া ভাল করা যায়।

দ্রব্য-সামগ্রী নষ্ট করা

অনেক গৃহিণী কোন পরিশ্রমেই পরাঙ্মুখ হন না, অনেক অকাজে রাতদিন খাটেন; কিন্তু যাহাতে পারিবারিক উন্নতি হয়, তৎপক্ষে একেবারে উদাসীন। ছেলেমেয়ে তাহাদের স্বভাব-সুলভ ক্রীড়াশীলতায় এটা-ওটার জন্য বায়না ধরে, তখন বিরক্তির সহিত নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া থাকেন; কিংবা তাহাদের খুব ন্যায়-সঙ্গত দাবী সহ্য না করিয়া তাহাদিগকে গালা-গালি দেন, অথচ যে সকল বিষয়ে সংশোধন হইলে তাহাদের প্রকৃত উন্নতি হয়, সে গুলি দেখিয়াও দেখেন না। পূর্ব্বে যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার অনেকটার দিকে তাঁহারা কতকটা উদাসীনতা দেখাইয়া থাকেন। কোন কোন গৃহিণী রান্নার কার্য্য লইয়া এত ব্যাপৃত থাকেন

যে, অন্যদিকে মোটেই তাঁহার লক্ষ্য নাই; বরং তরকারী-ব্যঞ্জনাদির সংখ্যা কমাইলে কোন ক্ষতি নাই; শিশুদিগের প্রতি একটু যত্ন, স্বামীর দরকারী দ্রব্যাদির প্রতি একটু মনোযোগ ও সংসারের চারিদিকের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি-রাখিয়া এই সকলের দিকে একটু যত্নবান্ হওয়া সর্ব্বদা শুভকর।

শিশুদিগের শিক্ষা ও নৈতিক উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে গৃহেই নানারূপ আমোদ ও কৌতুকে রাখিতে হইবে। না হইলে তাহাদের জীবন শুষ্ক হইয়া পড়িবে। ব্যায়ামের জন্য যে সকল ক্রীড়া বা ভ্রমণাদি আবশ্যক, তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য; তাহা ছাড়া গৃহে ছবির বই হইতে ছবি দেখান, ও নানারূপ গল্প বলা ও গান-বাদ্যের চর্চ্চা দ্বারা তাহাদের মন প্রফুল্ল রাখা দরকার। উপদেশপ্রদ পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুনাইয়া তাহাদের মনে উচ্চভাব জাগ্রত করিতে পারিলে ভাল হয়। আগেকার দিনে সেই সকল ব্যবস্থা ছিল; তখন ধর্ম্মমূলক যাত্রা ও কথকথা এবং রামমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল প্রভৃতি কীর্ত্তন, পল্লীর শিশুগুলির হৃদয় সরস করিয়া রাখিত। প্রকৃত ভক্তির সঙ্গে যে সকল পূজা-অর্চ্চনা হইত, তাহাতেও তাহারা নির্ম্মল আমোদ পাইত। চিত্ত সরস থাকিলে দেহের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এবং রস বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি উচ্চভাবের সংযোগ থাকে, তবে মণিকাঞ্চনের যোগ হয়।

আমোদ প্রমোদ

আমাদের সেই উৎসব ও আনন্দ-নিলয় প্রাচীন সমাজ এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; যে সকল আমোদ ও উৎসব আমরা সভ্যতার সোপানে দাঁড়াইয়া বিদায় দিয়াছি, তাহার স্থলে শিশুদিগকে আমরা কি দিতে পারিয়াছি? আমরা সমস্ত প্রাচীন বৈভব ত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্তহস্ত হইয়াছি। যে সকল প্রাচীন উৎসবে ভক্তি ও স্নেহ-মমতার আদর্শ জাগিয়া উঠিত—যাহা চোখের জলের

থিয়েটার

সঙ্গে শুনিতাম ও দেখিতাম, তাহার স্থলে আমরা থিয়েটার পাইয়াছি। এই থিয়েটার-সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলিতে চাহি না। বর্ত্তমান বঙ্গীয় থিয়েটার-গুলির রুচি ও প্রলোভন তরুণবয়স্ক বালক-বালিকাগণকে যে পথে লইয়া যায়, তাহার শেষ কোথায়, আপনারাই কল্পনা করুন। এই দিকে শিশুদিগের ঝোঁক না হয়, গৃহিণীগণ তাহা দেখিবেন। সে ভূত একবার কাঁধে চাপিলে নামান শক্ত। যদি ধর্ম্ম বা উচ্চভাবমূলক কোন নাটক অল্পকালের জন্য ছেলেরা অভিনয় করিতে পারে, তবে ততদূর অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, অনেক সময় তাহা নির্দ্দোষ আমোদের জিনিসই হইয়া থাকে; কিন্তু এই সূত্রে যদি সাধারণ নাট্যশালাগুলির অভিনয় দর্শন করিয়া যোগ্যতালাভের চেষ্টা হয়, তবে সেই শিক্ষার চেষ্টা অনেক সময় মারাত্মক হইয়া উঠিবে।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় কোন কবি এক কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাব এই যে, "হে মন, যদি নৃত্যই দর্শন করিবে, তবে বনে যাইয়া ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া আইস; আলোকমালাসজ্জিত আসর দেখিবার ইচ্ছা হইলে নক্ষত্রবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের সভা দেখিয়া লও; যদি গান শুনিবে, তবে কোকিলের কাকলির মত মিষ্ট কি আছে? এই সকল দেখিতে বা শুনিতে হইলে বৃথা অর্থক্ষয় হয় না, এবং আসনের তারতম্যহেতু শ্রোতা বা দর্শকের মনে জ্বালার উৎপত্তি হয় না; প্রকৃতির উৎসবের অবারিত দ্বার, সেখানে রাজা-প্রজার তুল্য অধিকার।"

প্রকৃতি চারিদিকে নিত্য যে মহোৎসব করিতেছেন, তাহা দেখিবার ও বুঝিবার জন্য ও হৃদয়ের শিক্ষার দরকার, সুতরাং কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভাল; কিন্তু মনুষ্যের সঙ্গীত ও মনুষ্যের নৃত্য দেখা পাপ, এ কথা কেহ স্বীকার করিবেন না। গানে ও নৃত্যে ভগবানকে পাওয়া যায়; রামপ্রসাদ গান করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছিলেন, চৈতন্যদেব নৃত্য করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছিলেন।

আমার বলিবার উদ্দেশ্য, যে সকল আমোদের পরিণাম বিনাশ বা ক্ষতি, তাহা হইতে শিশুগণকে রক্ষা করা দরকার। কোন্ কোন্ আমোদ বা খেলায় শিশুদিগের দুর্গতি হয়, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না, কারণ, তাহার দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে রহিয়াছে। চিত্রগুপ্তের খাতায় তাহাদের অপরাধের কথা লিখিত থাকুক বা না থাকুক, অনেক দুঃখার্ত্তা জননীর বুকে ও নিরাশ পিতার মর্ম্মে সেই সকল কাহিনী লিখিত রহিয়াছে।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা গোড়াকার কথাটা বলি নাই, সকল শিক্ষার উপর ধর্ম্ম-শিক্ষা। শিশুকালে এই মূলধন পাইলে সংসার-যাত্রা সুখের হইবে। আগে আমরা প্রাতে ভগবানের নাম লইয়া শয্যা হইতে উঠিতাম, তাঁহার নাম লিখিয়া অপর লেখাপড়া সুরু করিতাম,—সে সকল পাঠ এখন উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু মহিলাগণের মধ্যে এখনও অনেক পরিমাণে ধর্ম্মভয় আছে, আমার এই বিশ্বাস। যাঁহারা সংসারের জন্য নিঃস্বার্থ হইয়া কেবল স্বামী, পুত্র ও অপরের জন্য খাটেন,—নিজে না খাইয়া পরকে খাওয়ান, এবং সেই স্বামী, পুত্র যখন তাঁহাদের মর্ম্মে আঘাত করিয়া অসহ্য কষ্ট দেন, তখন যাঁহারা কিছু না বলিয়া তাহা নীরবে সহ্য করেন,—কখনও বা বুক-ভাঙ্গা কষ্ট সহিতে না পারিয়া অকালে ফুলটির মত ঝরিয়া পড়েন, সেই মহিলাকুল যে তাঁহাদের নীরব দুঃখ-কষ্টের ভার সহিতে সহিতে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিবেন এবং যখন তখন চোখের জলে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহারই পাদপদ্মে শরণ লইবেন, ইহা বিচিত্র কথা নহে।

ধর্ম্ম-শিক্ষা

আমাদের দেশের রমণীরা বিনা অপরাধে শত শত দুঃখ পাইয়া থাকেন। স্বামী সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দিলেন; কত চোখের জল কত অনুনয়-বিনয় করিয়াও তিনি তাঁহাকে সংশোধন করিতে পারিলেন না;—তারপর দুর্দ্দিন আসিল, যৎসামান্য খাদ্য পতিপুত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া নিজে

অপরের অলক্ষ্যে ক্রমাগত উপবাস করিতে লাগিলেন, তখন তিনি কাহাকে ডাকিয়া থাকেন! যিনি নিজের অদৃশ্য-অঞ্চল দিয়া মায়ের মতন গোপনে আসিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দেন, দুঃখের সময় তাঁহারই শরণ লইয়া তিনি সান্ত্বনা পাইয়া থাকেন। এই ভাবে শাস্ত্র না পড়িয়াও ভগবানের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। উপবাস ও দুশ্চিন্তায় শরীর কৃশ, সমস্ত সংসারের ভার তাঁহার উপর। ছেলে খারাপ হইয়া গিয়াছে, দুই দিন বাড়ী আসে নাই; স্বামীকে বলিতে গেলে তিনি মুখ ভার করেন ও কুপুত্রের নাম শুনিতে চান না,—কিন্তু মাতৃস্নেহ কি কোন কালে ন্যায় অন্যায়ের বিচার করিয়া থাকে?—তিনি দুহাতে চক্ষের জল মুছিয়া তখন কাহার শরণ লন?—অপরের অদৃশ্যভাবে কাহার পায়ে আত্মনিবেদন করিয়া দেন? অন্যায়ভাবে স্বামী গালি দিয়া গেলেন, কারণ, সাহেবের অপমানে তাঁহার মেজাজ কটু হইয়া আসিয়াছে; হয়ত এত কষ্টের রান্নায় কোন সামান্য ত্রুটি ধরিয়া কোন ছেলে ভাত না খাইয়া উঠিয়া গিয়াছে,—হয়ত সকলকে খাওয়াইয়া নিজের খাইবার ব্যঞ্জনাদি কিছু নাই, ভাতেও কম পড়িয়াছে, এ সমস্ত কাহাকে অবিরত স্মরণ করিয়া তিনি সহ্য করেন? তাঁহার দুঃখের কথা অনেক সময়ই বলিবার নহে—"বদন থাকিতে না পারি বলিতে তেঁই সে অবোলা নাম"—হিন্দু-ললনা এইভাবে তাঁহার দেবতাকে দিন রাত্রি ডাকিয়া থাকেন। কেহ যখন দুঃখ বুঝিবার নাই, দুঃখ বুঝাইবার শক্তি নাই,—তখন দিনরাত্রি তাঁহাকেই ডাকেন—যিনি সকলের অনন্ত-শরণ, একমাত্র গতি। রোগীর পার্শ্বে বসিয়াও সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়কে স্মরণ করা ভিন্ন তিনি কি করিতে পারেন!

আমাদের দেশে রমণীরা স্বভাবতঃই ধর্ম্মভীরু। তাঁহাদিগকে আমি ধর্ম্মের কথা কি বুঝাইব? তবে তাঁহারা যদি শিশুদিগকে ধর্ম্মের উপদেশ দেন, কোন নিয়মিত সময়ে উপাসনা, জপ বা নামকীর্ত্তনের জন্য তাহা-

দিগকে নিযুক্ত করেন, তবে এই মাতৃদত্ত মূলধনের বলে তাহারা প্রকৃতই ধনী হইবে। আমি শৈশবে কত মহিলার ভক্তি দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। একদা একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি মন্দিরে গিয়াছিলেন, কি দেখিয়া আসিলেন?" তিনি বলিলেন,—"ঠাকুর-দর্শন ঘটে নাই,—যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের পায়ের ধূলার কাছে প্রণাম রাখিয়া আসিয়াছি।" গদ্গদ-কণ্ঠে এই কথা বলার পরে দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু জলে পূরিয়া আসিয়াছে। সেই ভক্তিময়ীরা এখনও আছেন,—এই যে তীর্থদর্শনের জন্য রমণীকুলের এত ব্যাকুলতা, তাহার মূলে এক আকাঙ্ক্ষা। যাঁহাকে তাঁহারা দিবারাত্রি খোঁজেন, কোথায় তাঁহার উপলব্ধি বেশী হইবে, সেই চেষ্টায় তাঁহারা তীর্থস্থানে যাইবার জন্য আগ্রহাতুরা।

ছেলেদের প্রাতঃকালে যদি আধঘণ্টা কিংবা পনের মিনিট এই ভাবে ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত রাখা যায়, তাহার ফল খুব বেশী পাওয়া যাইবে। সংসার কত দুঃখ, বিপদ্ ও সঙ্কট লইয়া নিরন্তর সম্মুখীন হইতেছে। যদি শৈশব হইতে ভগবান্‌কে ডাকিবার অভ্যাস না হয়, তখন বিপদের দিনে তিনি সাড়া দিবেন কেন? যাঁহাকে তুমি সুখের সময় একেবারে ভুলিয়া রহিয়াছ, দুঃখের সময় তিনিও ভুলিয়া রহিবেন। কিন্তু শিশুকাল হইতে মন যদি এমন একটা জায়গা পায়, যেখানে ধ্যানস্থ হইয়া সংসার হইতে একটু উর্দ্ধে উঠিতে পারে, তবে ক্রমশঃ মন প্রকৃত আশ্রয়ের সন্ধান পাইবে; তাহা হইলে যেদিন সংসারের বিষে হৃদয় দগ্ধ হইতে উদ্যত হইবে, সে দিন সে তাহার মনকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া শান্তির জায়গায় লইয়া যাইতে পারিবে। প্রথমতঃ ভগবানের নাম জপ বা উপাসনার সময় দেখা যাইবে যে অলক্ষিতভাবে মন সংসারের বাজে বিষয় লইয়া আবার ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবৎ-বিষয়ে যতই মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিবে, ততই দেখিবে, মন অজ্ঞাতসারে

সংসারের চিন্তাজালে জড়িত হইতেছে, ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থায় আধঘণ্টা কাল এই ভাবে চেষ্টা করিলে এই কথার সত্যতা পরীক্ষিত হইবে। কিন্তু যেমন বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়া পাথরকেও ক্ষয় করে, সেইরূপ নিত্য নিত্য চেষ্টার ফলে সংসারের আবর্জ্জনা মন হইতে ক্রমে দূর হইবে। অবশেষে অভ্যাসবলে মনঃসংযোগশক্তি এরূপ দাঁড়াইবে যে, অনায়াসে সংসারের নানা কষ্টের ভিতরও মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সহজ হইয়া পড়িবে। তারপরে ক্রমে তাঁহার দয়া স্মরণ ও তাঁহাকে ধ্যান-ধারণা করিলে নিজের সুখ-দুঃখ-বোধ চলিয়া যাইবে। আনন্দময়কে যিনি ঘরে আনিয়াছেন, তাঁহার আবার দুঃখ কোথায়! দেহ-মন তাঁহারই পদে সমর্পণ করিলে সাংসারিক বিপদ্ দুঃখ তুচ্ছ বোধ হইবে। আমি তাঁহার, আমি আর কাহারও নহি; তাঁহারই নির্দ্দেশে চক্ষু, কর্ণ ও ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য করিবে—আমি নিজের সুখের জন্য—নিজের ভোগের জন্য কিছু চাহি না; তিনি যে কার্য্যে প্রীত—আমি সেই কার্য্যের কর্ম্মী, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু করিব না। তিনি কি কার্য্যে প্রীত, জানিতে হইলে মনকে ধ্যান, ধারণা ও উপাসনা দ্বারা শান্ত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হইবে, এরূপ হইলে তিনি স্নেহে চুপে চুপে কানে কানে কত মধুর উপদেশের কথা কহিবেন এবং কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে—কোন্ সাংসারিক সমস্যা কি ভাবে পূরণ করিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া দিবেন। কারণ, তিনিই আমাদের গুরু ও উপদেষ্টা. আমরা মহাধনী হইলেও তিনি ভিন্ন আমাদের কেহ নাই, মহা দরিদ্র হইলেও তিনি ভিন্ন আমাদের কেহ নাই। তিনি কখনই আমাদিগকে ভোলেন না, আমরাই তাঁহাকে ভুলিয়া সর্ব্বদা বিপদে পড়ি। আমরা তাঁহাকে চাই না,—কিন্তু তিনিই তাঁহার দুর্ভাগ্য সন্তানদিগকে সর্ব্বদা চাহেন,—এই জন্য দুঃখ দিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁহার বুকের কাছে টানিয়া লন।

ছেলেদিগকে জননী এইভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া প্রত্যহ শুইবার পূর্ব্বে যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন—কে কতটি মিথ্যাকথা বলিয়াছে, কে কতবার অপরের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে, কে বিনা কারণে ঝগড়া করিয়াছে, তাহা হইলে শিশুরা প্রথম হইতেই নৈতিক বিচার করিতে শিখিবে, এই নৈতিক বিচার হইতেই ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশ। নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিলেই সেই অপরাধের শেষ ও ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইবে।

ইনফ্যাণ্টাইল লিভার

ছেলেদের খাদ্য-সম্বন্ধে গৃহিণীর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। কলিকাতার অনেক শিশু ইনফ্যাণ্টাইল লিভার নামক উৎকট ব্যাধিতে মৃত্যুকবলে পতিত হয়। ইহার একমাত্র না হউক, প্রধান কারণ—বাজারের দুগ্ধ পান। অনেক বাড়ীতে যেরূপ একজন গৃহশিক্ষক রাখিয়াই ছেলের অভিভাবক নিশ্চিন্ত থাকেন, কারণ, তিনি রীতিমত তাঁহার বেতন যোগাইয়া থাকেন, এবং ছেলেও দুই এক ঘণ্টা তাঁহার কাছে বসিয়া চেঁচাইয়া পাঠ বলিতে থাকে, অথবা পেন্সিল লইয়া খাতার উপর আঁচড় কাটে—সেইরূপ টাকায় /৪ সের দুধ কিনিয়াই গৃহস্থ মনে করেন, ছেলের খাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, শিশুর পক্ষে, গোয়ালার দুধ বিষের ন্যায় কাজ করে। অযোগ্য গৃহ-শিক্ষকের দোষে যেরূপ বালকগণের প্রথম হইতেই কু-শিক্ষা আরম্ভ হয়, এবং সেই শিক্ষার ফল পাকিয়া উঠিলে কিছুতেই আর ভবিষ্যতে তাহার সংশোধন চলে না, সেইরূপ গোয়ালার দুধ খাওয়ার ফলে শিশুর যকৃতের যে দোষ ঘটে, শেষে বড় বড় ডাক্তারগণও তাহার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না।

এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেকে কিছুতেই গোয়ালার দুধ খাইতে দেওয়া না হয়, ইহাই আমার উপদেশ। আমাদের পরিবারে নানা বিপদ্ ও দুঃখের দ্বারা এই বহুদর্শিতা লাভ হইয়াছে—সুতরাং ইহা পুঁথিগত উপদেশ

নহে। যে সকল দুধ গোয়ালা সারাদিন বিক্রয় না করিতে পারে, ও ফলে বাসি হইয়া যায়, সেই দুধ তাহারা কথনই ফেলিয়া দেয় না, তাহা কোন উপায়ে রক্ষা করিয়া নূতন দুধের সঙ্গে মিশায়, ইহাই বিষ হইয়া দাঁড়ায়। শুধু জল মিশাইলে এতটা বিপদের সম্ভাবনা থাকিত না। গোপকুল কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া দুধের বিড়ম্বনা করে, তাহা আমি জানি না,—অনেক রকম অনুমান করিতে পারি, এইমাত্র; সে সকল গুপ্ত বিদ্যার মর্ম্ম জানারও বেশী প্রয়োজন নাই। তবে ইহা নিশ্চয়, অন্ততঃ এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আপনারা কেহই শিশুকে গোয়ালার দুধ খাওয়াইবেন না। আমি সহরের শিশু-দিগের সম্বন্ধেই বলিতেছি, মফঃস্বলের গোয়ালারা মাথার উপর ঈশ্বর আছেন, এ কথাটা বোধ হয়, জানে; কারণ তাহাদেরই কুলে ভগবানের শৈশব ও কৈশোর লীলা হইয়াছিল, এরূপ লিখিত আছে। কিন্তু সেই ভগবান্ যে নিত্য শিশুরূপে তাহাদের নিকট এখনও দুগ্ধপ্রার্থী, এ কথা মনে থাকিলে সহরের গোয়ালারা পূতনা সাজিয়া বিষ দুধ তাহাদের মুখে দিতে পারিত না। এখন তাহাদের সমাজে নন্দ-যশোদা আর নাই, এখন তাহারা পূতনা ও তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতির ন্যায় শিশুকুল-সংহারে সংকল্প করিয়া বসিয়াছে।

গোয়ালার দুধ

যাহা হউক, সাধারণতঃ এক বৎসর পর্য্যন্তই ইনফ্যাণ্টাইল্ লিভার হওয়ার সময়। এই রোগ এরূপ মারাত্মক যে, ইহা হইলে শতকরা ৯৯টি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গোয়ালার দুগ্ধ এ সময় পর্য্যন্ত শিশু যেন কিছুতেই না খায়, তাহা সহরের অভিভাবকগণ দেখিবেন। অনেক সময় এরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, চাকর, গোয়ালার বাড়ীতে ঘটী হাতে যায় এবং তাহার সম্মুখে দুধ দোহাইয়া দেওয়ার কথা থাকে। চাকরেরা অবশ্য ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নহে, এবং যেখানে অর্থের লোভ আছে,

সেখানে গোয়ালার সঙ্গে তাহার একটু আত্মীয়তা স্থাপন করা অতি সহজ; সুতরাং উক্তরূপ বন্দোবস্ত একেবারেই নিরাপদ নহে। গরু বাড়ীতে আনিয়া দুধ দোহাইয়া দিয়াছে, অথচ গোয়ালার অসামান্য হস্ত-চালনার গুণে তাহারই মধ্যে দুধের সঙ্গে কিছু মিশাইয়া লইতে আমি দেখিয়াছি; এরূপ অবস্থায় যে কোন বন্দোবস্ত হউক না কেন, গোয়ালার দুগ্ধের উপর কিছুতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। সম্মুখে গরু রাখিয়া দুধ দোহাইয়া দিবে, এই করারে আমি এক গোয়ালাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম ও আমার একটি ছেলে চাকরকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া দুধ আনিবে, এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু ২।৪ দিন পরে ছেলে বলিল, সেই গোয়ালার গোয়ালে ৩০।৪০টা গরু আছে, গোয়াল-ঘরটা আঁধার এবং যে গরু হইতে দুধ দোয়া হইবে, তাহা গয়লা সকলের পশ্চাতে রাখিয়া দেয়। ৩০।৪০টা শিঙ্গনাড়া খাইয়া ও বিপুল-আয়তন গোবরের মধ্যে হাঁটিয়া যাইয়া সেই আঁধারে নির্দ্দিষ্ট গরুর কাছে উপনীত হইতে হইবে। এই দুঃখে বিগলিত হইয়া কাকুতি করিয়া গোয়ালা বলিত, "বাবু, আপনি কি করিয়া এই কষ্ট সহ্য করিবেন? আমাদেরই না হয় পেটের দায় সমস্তই করিতে হয়, আপনি এখানে বসুন, আমি দুধ দোহাইয়া লইয়া আসিতেছি।" ভৃত্যবরও কোন অজ্ঞাত কারণে গোয়ালার পক্ষপাতী, সে বলিত, "না হয় আমি যাই, আপনার আসিবার দরকার কি?"

এক বৎসর পর্য্যন্ত শিশু যদি সুস্থ মাতার স্তন পায়, তাহা হইলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট খোরাক তাহার কিছুই হইতে পারে না; তাহা যথেষ্ট না হইলে এলেনবারী ১ কি ২ নম্বর তাহার পক্ষে ভাল। কিছু যদি বেশী ব্যয় হয়, তবে মনে করিবেন, ইনফ্যাণ্টাইল লিভার একবার হইয়া পড়িলে কি ভয়ানক বিপদ্! তাহাতে ছেলের জীবনসঙ্কট ঘটে ও হাওয়া পরিবর্ত্তন ও ডাক্তারের খরচে গৃহস্থ একেবারে বিব্রত হইয়া পড়েন। অপেক্ষাকৃত



অনুতপ্তা মাতা

দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষেও এলেনবারী ফুডের খরচ সে তুলনায় অতি সামান্য হইবে। যাঁহার ঘরে গরু আছে, তিনি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, কিন্তু সহরে কয়জন গরু রাখিতে পারেন? স্থানের অভাব, বিশেষ দোর্দ্দিণ্ড-প্রতাপ মিউনিসিপ্যালিটীর টুপি-ওয়ালা পরিদর্শকগণ গৃহস্থের গরু থাকিলে তাঁহাকে অনেক সময় অতি নির্দ্দয়ভাবে ভয় দেখাইয়া থাকেন; অতিসূক্ষ্ম মিউনিসিপ্যাল বিধির প্রত্যেকটি অক্ষর মান্য করিয়া গরু পোষা কয়জনের ভাগ্যে হইতে পারে?

ফেরীওয়ালা

শিশু বড় হইয়া উঠিলে সর্ব্বদাই তাহার আহারের সময় মাতার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। অধিকাংশ সময় মাতা তাহাকে কাছে বসিয়া খাওয়াইয়া থাকেন। কিন্তু কোন কোন ঘরে মাতা এ বিষয়ে উদাসীন। রাঁধুনীর হাতেই এই ভার অর্পিত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাড়ী-ঘরের পার্শ্বে নানাবিধ স্বরে ফেরিওয়ালা তেলেভাজা জিলিপি, এক পয়সায় বত্রিশ ভাজা, ঘুগ্‌নি, মটর-ভাজা, পাঁপর-ভাজা, ফুলুরী প্রভৃতি ফেরী করিয়া বেড়ায়; তাহাদের আহ্বান অনেক সময় ছেলেদের নিকট ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় মিষ্ট। অনেক সময় মিহি-সুরে ঘুগ্‌নি-দানার ছড়া গাইয়া ফেরীওয়ালারা শিশুগণের মনোহরণ করিয়া থাকে। এই সকল বস্তু কিনিয়া খাওয়া ছেলেদের একটা রোগ হইয়া দাঁড়ায়; বাজারের পচা খাবার খাওয়ারও অভ্যাস অনেকের আছে। কলিকাতার শিশুবর্গ এইরূপ ফেরিওয়ালার হাতে পড়িলে, তাহাদের আর উদ্ধার নাই। ঐ সকল খাবার শুধু স্বাস্থ্যের হানি করে, এমন নহে, উহাতে একেবারে ক্ষুধা নষ্ট করে; বালকেরা ঐগুলি দিয়া পেট ভরিয়া ফেলিলে ভাত খাইতে চায় না। তাহারা ভাত না খাইয়া ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়,—কলিকাতা সহরে অনেক ছেলে ১৮—২৫ বৎসরের মধ্যে থাইসিস্ পীড়ায় ভুগিয়া থাকে; অন্নের দুর্ভিক্ষবশতঃই অনেক সময় এই ব্যাধির সৃষ্টি

হয়। মটর-কলাই ভাজা বা চিনে-বাদাম ভাজা খাইয়া মোটেই ভাতের ক্ষুধা থাকে না ;—ভাত না খাইতে খাইতে বালকের হাড় বাহির হইয়া পড়ে, এবং কালে তাহার পেটের অসুখ হইয়া টাইফয়েড জ্বর হয়, অথবা থাইসিসের চিহ্ন দেখা দেয় ; কারণ, ক্ষীণজীবিগণের উপরই এই সকল রোগের আক্রমণ বেশী।

থাওয়া সম্বন্ধে নিয়ম

এজন্য ছেলেরা ভাত ঠিকমত খাইল কি না,—মাতা তাহা দেখিবেন ; যদি ভাত না খায়, তবে কেন এরূপটি হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধানের ফলে ফেরিওয়ালার সঙ্গে বালকের গুপ্ত ঘনিষ্ঠতা বাহির হইয়া পড়িবে। ছেলেরা যখন খাইবে, সে সময়ে তাহাদিগকে গালি দেওয়া উচিত নহে, অপরাধী হইলেও সে সময়ে মাতা অপরাধ ভুলিয়া মিষ্টমুখে তাহাকে খাওয়াইবেন,—এ কথা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। দরিদ্রের সংসারে এক হাতা দুধের সঙ্গে এক বাটি ভাত মাখিয়া ছেলেকে বৈকালে খাইতে দিলে, ঘি নামধারী চর্ব্বিতে ভাজা লুচি, শিঙ্গাড়া ও কচুরী হইতে তাহা ছেলের দৈহিক পুষ্টি-সাধনে বেশী সহায় হইবে। খাওয়া সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বাঁধাবাঁধি থাকা আবশ্যক। অনেক বাড়ীতেই এ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। ছেলেরা সারাদিনই ইতর-জন্তুর ন্যায় রোমন্থন করিতেছে, এরূপ দেখা যায়। নিতান্ত ছোট-শিশুরা, যে খাইতেছে, তাহারই সঙ্গে বসিয়া ক্ষুধায় অক্ষুধায় খাদ্য গালে পুরিতেছে। অভিভাবকবর্গেরও কোন জ্ঞান নাই ; এই খাওয়া-দাওয়া করিয়া ছেলে গণেশের মত পেট ভাসাইয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি নিজে তৃপ্তির সঙ্গে যাহা খাইতেছেন, তাহার একটা ভাগ শিশুকে কবলিত করিতে দিয়া মায়া দেখাইতেছেন। শিশু ছোট-দাদা, বড়-দাদা, সেজ-দাদা প্রভৃতি সকলের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে খাইতে বসিতেছে ও কতটা ওজনের জিনিস তাহার উদর ধারণ করিতে সমর্থ, তাহা নিজেও ইয়ত্তা করিতে পারিতেছে না, এবং

স্নেহশীল আত্মীয়মণ্ডলীও কেবল খাওয়াইয়াই সুখী হইতেছেন। শিশুর পরিপাক-শক্তির একটা সীমা আছে, তাহা একবারও ভাবিতেছেন না।

আমি কলিকাতার দুই একটি বড় লোকের বাড়ীতে দেখিয়াছি, ছেলেদের খাওয়ার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ও খাদ্যের পরিমাণ আছে, তাহা তাহারা সহজে অতিক্রম করিতে পারে না। যে গৃহে আসিল, তাহারই সঙ্গে নির্ব্বিচারে আত্মীয়তা করা যেরূপ উচিত হয় না, সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট খাদ্য ছাড়া আগন্তুক যে খাদ্য আনিল, তাহাকেই শরীরের মধ্যে স্থান দিতে হইবে, তাহা নহে। অনেক জননী দুধ খাওয়াইতে যাইয়া শিশুর হজম-শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখেন না; যতটা সাধ্য রোরুদ্যমান শিশুর গলনলীর ভিতর জোর করিয়া ঝিনুক দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিতে থাকেন। এতদুপলক্ষে শিশুর হাত-পা ছোঁড়া ও কান্নাকাটি যত বাড়িতেছে, ততই তাহাকে জোর করিয়া দুধ খাওয়াইবার সঙ্কল্প তাঁহার বাড়িয়া যাইতেছে; এরূপ মল্লযুদ্ধের কখনও প্রশংসা করা যায় না। অবশ্য, এমন অনেক ছেলে আছে, যাহারা সহজে দুধ খাইতে চায় না, কিন্তু ছেলেকে সংশোধন করা ও নূতন অভ্যাস লওয়াইবার শক্তিও মাতার আছে—ইহা আমি কখনও অস্বীকার করিতে পারি না। অনেক সময় দেখা যায়, এইরূপ জোর করিয়া দুধ খাওয়াইবার সময় ছেলে দাঁত বন্ধ করিয়া দুধ খাওয়ার পথে বাধা দিতেছে, ফলে ঝিনুকের সমস্ত দুধ গড়াইয়া তাহার দুই কানে প্রবেশ করিতেছে। শিশুগণের কর্ণরোগের এই ভাবে উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং দুধ খাওয়াইবার সময় কানে দুধ না ঢোকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দুধ খাওয়াইতে বসিলে ভাল হয়। একখানা টোয়ালে বা রুমাল দ্বারা অনায়াসে ইহা নিবারিত হইতে পারে। গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিয়া বা অন্য কোনরূপ শিশুর মনোরঞ্জন করিয়া তাহাকে সহজে দুধ খাওয়াইতে

ছেলেকে দুধ খাওয়ান

পারিলে বাড়ীর একটা মস্ত বৃথা কলরব চলিয়া যায়। শিশুদিগকে লইয়া এইরূপ চীৎকার ও উচ্চ কলরব যতই কম করা যায়, ততই ভাল। একজন একটি গল্প বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পাড়ার একদিক হইতে তাঁহারা ক্রমাগত এক ব্যক্তিকে প্রাণপণ চীৎকার করিতে শুনিতে পাইলেন; সে ব্যক্তি খুব চীৎকার করিয়া কেবলই বলিতেছে—"টান্ দে—বাঁকা কর, টানিয়া উঠা"—এই অবিরত চীৎকারে কৌতূহল বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং ভীত হইয়া পাড়ার লোকেরা সেই বাড়ীতে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, :এবং "মহাশয় কি হইয়াছে" বলিয়া বহুকণ্ঠে একেবারে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। চীৎকারকারী লজ্জিত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়, কিছু নয়, ছেলেটাকে 'ক' লেখাচ্ছি।" ছেলে লইয়া এইরূপ অভিনয় ও বৃথা কলরব ভাল নহে। অনেক সময় আবার জননী তাঁহার অষ্টম কি নবম-বর্ষীয়া কন্যার উপর ছোট শিশুটির দুধ খাওয়াইবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, অনেক সময় পরিচারিকাদের হাতেও এই ভার পড়িয়া থাকে। কিন্তু জননী সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন, শিশুকে পরিমাণের বেশী দুধ খাওয়ান হইতেছে কি না, এবং তাহার দুই কানে দুধ গড়াইয়া পড়িতেছে কি না। কোন কোন সময়ে অজ্ঞাত কারণে বাটিতে দুধ নষ্ট হইয়া যায়। হয় পূর্ব্বদিনের দুধের অংশ বাটিতে লাগিয়াছিল, তাহারই সংস্পর্শে আসিয়া দুধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিংবা অন্য কোন কারণে সেরূপ ঘটিয়া পড়িয়াছে; এইজন্য শিশুকে দুধ খাওয়াইবার পূর্ব্বে সর্ব্বদা সেই দুধ পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। যদি জননী শিশুকে নিজে না খাওয়াইয়া অপরকে দিয়া এই কাজ করান, তবে তিনি এই সকল বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া তবে অপরের উপর শিশুর দুধ খাওয়াইবার ভার দিবেন।

আমি শিশুকালে মায়ের হাতের অনেক চড়-চাপড় খাইয়াছি। এখন

মনে হয়, সে চড় সে থাপ্পড় কত মিষ্ট—অনেকেই এই ভাবের মাতৃপ্রসাদ-লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা মাতৃহারা, সেরূপ প্রসাদ পান নাই, তাঁহারা কি দুর্ভাগ্য! হয় ত কোন সাধু পুরুষ ভগবৎ কৃপা সম্যক্ লাভ করিয়া মনে ভাবিবেন, তিনি যত দুঃখ কষ্ট দিয়াছিলেন, তাহা মাতৃদত্ত চড়-চাপড়ের মতই তাঁহার উপকারে আসিয়াছে। এই চড়-চাপড় ও মায়ের কথা মনে হইলে মায়ের করুণার কথাই মনে হয়, কিন্তু তথাপি আমি বলিতে বাধ্য, শিশুর প্রহার আমি একেবারেই পছন্দ করি না। কেহ কেহ এক বৎসর বয়স্ক ছেলের উপর মা'র-ধর চালাইতেছেন, ইহাও দেখা যায়। অবশ্য, মাতা অনেক বিরক্ত না হইলে এরূপ করেন না, মাতাকে স্নেহ শিখাইতে চেষ্টা করার নাম বাতুলতা, ইহা একবার লিখিয়াছি। কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশুর উপর হস্তচালনা অপেক্ষা নৃশংসতা আর কি কল্পনা হইতে পারে? ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই যাহার পিঠে মা'র-পিটের এরূপ মুক্তহস্ত পরিবেষণ আরম্ভ হয়, সে ছেলের স্বভাব একেবারে বিগড়াইয়া যায়, কয়েকবার জেল খাটিয়া আসিলে যেরূপ কয়েদীর আর জেলের ভয় থাকে না, একবার মা'রধর সেইরূপ শিশুর হাড়ে সহিয়া গেলে—সে আর মারকে একেবারেই ভয় করে না। শিশুর গায়ে হাত তোলা ভাল নহে, অনেক সময় এইরূপ মারিতে যাইয়া পিতা-মাতা বড় বিপদে পড়েন। আমার মামাত ভাই মহেন্দ্রনাথ সেন বাহির হইতে বিরক্ত হইয়া আসিয়া ঘরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার একটি ছেলে উঠানে পড়িয়া কাঁদিতেছে; তখন রাগের ঝোঁকে তাহাকে একটা কঞ্চি ছুঁড়িয়া মারেন, সেই কঞ্চির ডগা বিঁধিয়া শিশুর একটা চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। মহেন্দ্রবাবু এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, যদি আমার প্রাণ বা দুটি চক্ষু লইয়া কেহ উহার ঐ চক্ষুটা সারাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি তাঁহার কেনা গোলাম হই।" শিশুকে আঘাত

ছেলেকে মারা

করিয়া বেশী অনিষ্ট না হইলেও মাতা ও পিতার মনে এইরূপ অনুতাপ হইতে পারে। কত মাতা স্বীয় হস্তের চড়ের দাগ শিশুর গায় দেখিয়া নীরবে কাঁদিয়া থাকেন। গায়ে চড়ের দাগে রক্তচিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে, সেই স্থানগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে, তথাপি শিশু প্রহারকর্ত্রী মাতার মুখ দেখিয়া আপনা ভুলিয়া সস্তোদ্‌গত দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিতেছে; এই দৃশ্য দেখিলে মাতার মন কিরূপ ব্যথিত হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

শিশুর মনে যদি স্নেহজনিত ভয় থাকে, তবেই তাহার উন্নতি হয়। এমন মা অনেক আছেন, যাঁহার চক্ষের ইঙ্গিত নিদারুণ প্রহার অপেক্ষা ছেলেকে বেশী সংশোধন করে; এইরূপ এক মা তাঁহার চা'র বছরের ছেলেকে কোন অপরাধের জন্য সামান্য একটি চড় মারিয়াছিলেন। বালক ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল ও তক্তাপোষের নীচে মড়ার মত হইয়া ভয়ে লুকাইয়াছিল; তার পর মা যখন হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন, তখন সে মায়ের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। কত মাতাকে দেখিয়াছি, ছেলেকে কাঠের চেলা দিয়া নিষ্ঠুরভাবে মারিয়াছেন, অথচ তাহাতে তাহার কোন ভয় হয় নাই; যতই মার খাই-তছে, ততই সে বিগড়াইয়া গিয়াছে। এরূপ জননীরা অনেক সময় দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন, "বল, আর কি করিতে পারি? উহাকে কেবল প্রাণে মারি নাই,—যেরূপ মারিয়াছি, যদি তাহা দেখিতে! তথাপি ত উহার সংশোধন হইল না।" আমরা বলিব, মা ঠাকুরুণ, উহা আদবেই সংশোধনের পথ নহে, আপনি রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছেন, মায়ের হাতে সংশোধনের এক অমোঘ অস্ত্র আছে—তাহা মাতৃ-স্নেহ। আপনি তাহা ছাড়িয়া গুরুমশায়গিরি আরম্ভ করিয়াছেন। বেতের লাঠি ক্ষয় হইয়া যাইবে, কিন্তু ছেলের কোন উপকার হইবে না। আপনার হাতের অঙ্গুলিগুলি ব্যথা পাইবে, কিন্তু

ছেলের ব্যথা বোধ আপনি একেবারে নষ্ট করিতেছেন। সর্ব্বদা যে ছেলেকে "দূর দূর" করা হয়, যাহাকে সর্ব্বদা বলা হয়, "তুই কোন কর্ম্মের নহিস্," তাহার আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের গোড়া কাটিয়া ফেলা হয়; সে ছোট ছোট অপরাধ হইতে ক্রমশঃ গুরুতর অপরাধের পথে চলিতে থাকে।

আসল কথা, যিনি বিচার করিবেন, তাঁহার বিচার-বুদ্ধি আগে স্থির হওয়া দরকার। ছেলেকে মারিবার পূর্ব্বে তিনি একবার নিজের মনের দিকে লক্ষ্য করিবেন। যদি তখন বোঝেন যে, তিনি নিজে রাগিয়াছেন, তখন তিনি আর ছেলের গায়ে হাত তুলিবেন না; কারণ, তখন তিনি নিজে অপরাধী হইয়াছেন,—তিনি অপরকে বিচার করিবার অযোগ্য হইয়াছেন। যদি নিজে রাগিয়া না থাকেন,—শুধু ছেলের হিতই যখন তাঁহার বিচারের লক্ষ্য, তখন তিনি তাহাকে মিষ্ট কি রুষ্ট যাহা উচিত বোধ করেন, তদ্রূপ ব্যবহার করিতে পারেন। নিজে রাগিলে তিনি এমন একটা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলেন—যাহার চক্ষু-কর্ণ নাই; সেই পশুভাব লইয়া শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে সে শিক্ষা ছেলে লইবে কেন?

অনেক বালক শিষ্টাচার বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, তাহা জানে না। তাহার পিতার কোন বন্ধু, আত্মীয় বা বাহিরের কোন ভদ্রলোক বাহিরে ডাকাডাকি করিতেছেন, বালককে বাড়ীর কর্ত্তার কথা কি অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সে দিকে মনোযোগই দিতেছে না, কিংবা অর্থশূন্য-দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া কোন অসঙ্গত ভাবের উত্তর দিতেছে। যাহাতে ছেলেরা বিনীত হয় এবং ভদ্র ব্যবহার শিখে, তজ্জন্য পিতামাতার চেষ্টা করা উচিত। বাহিরের কেহ আসিলে বালক সম্মানের সহিত তাঁহার কথা শুনিবে ও যদি কোন প্রশ্ন করিতে হয়, "তবে আপনি কাহাকে চান্? এই ভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিবে। কাহারও নাম জিজ্ঞাসা করা শোভন নহে—তবে সে

শিষ্টাচার

এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারে,—"আপনার সম্বন্ধে আমি কি বলিব?" বয়সে বড় ব্যক্তিদের প্রতি আগে যে একটা সম্মান দেখান হইত, এখনকার শিশুরা তাহা মোটেই জানে না। আমরা যখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতাম তখন একজন এল্, এ, পাশ মাষ্টারকেও আমরা বিদ্যার জাহাজ বলিয়া মনে করিতাম। তাঁহার কাছে কথা কহিতে হইলে কত বিনয় ও ভয়ের সহিত কথা কহিতাম। এখন এণ্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র একজন এম্, এ, পাশ মাষ্টারেরও বিদ্যার দৌড়ের সমালোচনা করিয়া থাকে, এবং তিনি কোন্ কোন্ বিষয় ভাল শিখিতে পারেন নাই, হয় ত ক্লাসে বসিয়াই তাঁহাকে তাহা প্রকাশ্যভাবে শুনাইয়া বাহাদুরী দেখাইয়া থাকে। বিনয়ের এই অভাবে আমাদের সামাজিক শৃঙ্খলা একবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অর্ব্বাচীন ছেলেদের অকাল-পক্কতা, সর্ব্ববিষয়ে সমালোচনা চেষ্টা, নিজের বুদ্ধির অঙ্কুর হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধিমান্ ও গণ্যমান্য প্রবীণ ব্যক্তিদিগের টিকি ধরিতে যাওয়া,—এই সমস্ত দুর্লক্ষণ সমাজে বড় বেশী পরিমাণে দেখা যাইতেছে। ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতার জন্য গুরুজনের প্রতি ভক্তি কমিয়া যাইতেছে এবং ছেলেরা দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতেছে। আমি বেদী চাপিয়া বসিয়া গুরুগিরি করিতে চাহিতেছি না,—আমি শুধু এই বলিতে চাই, শিশু প্রথমতঃ মাতাপিতার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার চরিত্রটি যদি পিতামাতা গড়িয়া দেন, তবে গৃহের বাহিরেও তাহা উপাদেয় থাকিবে। কেবল উপদেশ-কথা বলিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। চশমাচোখে দাড়ী নাড়িয়া যে সকল লোক চাণক্য-নীতি আবৃত্তি করিতে থাকেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া অনেক সময়ে শিশুর প্রাণ চমকিয়া উঠে; সেরূপ ভাবে ভয় দেখাইয়া নীতিপথে লওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা। শিশু যে সকল স্থানে ব্যবহার ও শীলতার ত্রুটি দেখায়, সেখানে তাহাকে মিষ্ট কথায় কিরূপ করিতে হইবে, তাহাই বুঝাইয়া দিলে উপকার হইবে।

অনেক বাড়ীতে শিশুরা দেশলাই লইয়া খেলা করিয়া থাকে। ছেলের হাতে দেশলাই দেওয়া আর তাহার মৃত্যুবাণ দেওয়া একই কথা। আমার এক নিকট-আত্মীয়ের ছেলেকে তাহার জনক-জননী রোজ একটি করিয়া পয়সা দিতেন,—দেশলাই কিনিতে। সে কাপড় চোপড় পরিয়া দেশলাইয়ের কাঠি একটি একটি করিয়া জ্বালিত ও ফু দিয়া নিবাইত, তাহার সেই ফুৎকারে কাঠির আগুন নিবাইবার সময় যে হাসির রেখা মুখে ফুটিত, তাহা দেখিয়া জনক-জননী আনন্দে গলিয়া যাইতেন। সে ছেলের পরিণাম যে কি হইল, তাহা আর বলা নিষ্প্রয়োজন। 'শিশুকে আমরা নিজেরা পুড়াইয়া মারিলাম' বলিয়া যখন তাহার জনক-জননী কাঁদিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের অনুতাপ ও শোকে পাষাণ গলিয়া গিয়াছিল। ছেলে যদি কার্ণিসে হাঁটে, কি রেলিংএর উপর চড়ে, তবে তাহার কান মলিয়া—দরকার হইলে আরও শক্ত শাসন করিয়া, শোধরাইয়া লইবেন। না লইলে একদিন বাড়ী শুদ্ধ কান্নাকাটি পড়িয়া যাইবে। দেওয়ালীর দিন অনেক ছেলে আলো জ্বালাইতে ও বাজী পোড়াইতে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; সে দিন গৃহস্থ সতর্ক থাকিবেন।

দেশলাই লইয়া খেলা

শিশুগণের উপরই ভবিষ্যতে পৃথিবী-পরিচালনার ভার; ইহারাই ভবিষ্যতের সমাজ-নেতা, বিচারক, শিক্ষক এবং ধর্ম্মগুরু; ইহারা অবহেলার সামগ্রী নহে; ইহারা শুধু মাতাপিতার স্নেহ পাইবার প্রত্যাশী নহে—ইহারা পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে যাইয়া কি অভিনয় করিবে, বাড়ীর আঙ্গিনায় তাহার মহড়া দিতে শিখিবে। যে ঘোর শত্রুতায় বা লোভে পৃথিবী মনুষ্যরক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে, মাতার ক্রোড়ে বসিয়া শিশু সেই নিষ্ঠুরতার দীক্ষা প্রথম গ্রহণ করিতে পারে; আবার যে পুণ্যে অসীম স্নেহের বিনিময়ে শূলে বিদ্ধ হইয়াও সাধু ক্ষমার সহিত বলেন, "হে পিতঃ! যাহারা আমাকে

মারিতেছে, তাহাদিগকে তোমারই অজ্ঞান সন্তান বলিয়া মাপ করিবে,” সেই শিক্ষাও বালক মাতার করুণ দৃষ্টি ও ক্ষমাপূর্ণ ব্যবহার হইতে প্রথম শিখিতে পারে। মাতা শিশুর ইহকাল ও পরকালের সহায়।

একান্নভুক্ত পরিবার

আজকালকার সভ্যতায় একান্নভুক্ত পরিবারের আদর্শ ভাঙ্গিতে বসিয়াছে, উহা টল্‌টলায়মান।

কিন্তু ভাঙ্গা সহজ, গড়া শক্ত। আমাদের একান্নভুক্ত পরিবার এই সমাজের অনেক অভাব পূরণ করিয়া থাকে। বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে আমাদের সেই অভাব মিটিবে কিসে? ধরুন, ৫০৲ টাকা বেতনের এক কেরাণী বৃহৎ পরিবারের দায় হইতে আত্মরক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী অসুস্থা কিংবা অসমর্থা হইলে তাহাকে রাঁধুনী রাখিতে হইবে, ছেলেদিগকে দেখিবার জন্য ও পীড়িতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য লোক রাখা চাই। এরূপ বিপদ্ তাহার বৎসরে একবার দুইবার নহে, বহুবার আসিবে,—কারণ, বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে অসুখ-বিসুখ ত লাগিয়াই রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাহার আয় দাস-দাসী ও রাঁধুনীর বেতন দিতেই কুলাইবে না। তা ছাড়া সংসারের যাবতীয় খরচ ও ডাক্তারের ফি ও ঔষধের দাম ইত্যাদি সে কি করিয়া কুলাইবে?

এ দেশের সমাজ

বিলাতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া লোকে ভিন্ন হইয়া থাকে, সেখানে বড় বড়

চিকিৎসালয় আছে। সন্তান হইবার পূর্ব্বে সেইখানে বড় বড় লোকেরাও তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে পাঠাইয়া থাকেন। স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া সন্তান কোলে লইয়া স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসেন,—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কিংবা নিজের অসুখ হইলে অমনই চিকিৎসালয়ের শরণ লইয়া থাকেন। সেই সকল চিকিৎসালয় সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ, তাহাতে থাকার, চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদির যেরূপ সুন্দর ব্যবস্থা আছে, বড় বড় ধনীর গৃহেও সেরূপ হইবার উপায় নাই। যে অবধি সুস্থ থাকা যায়—সে অবধি গৃহ, কিন্তু অসুস্থ হইলেই চিকিৎসালয়। মাতাপিতা সেখানে শিয়রে বসিয়া শিশুদের শুশ্রূষা করেন না, শিক্ষিতা ধাত্রী ও ডাক্তারগণের উপরই সেই ভার।

গৃহের পশ্চাতে এই বিশাল আয়োজন থাকায় তথাকার লোকেরা আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার চালাইতে পারেন। বিপদের সময় তাঁহাদের কোনই বেগ পাইতে হয় না।

আমরা একান্নভুক্ত পরিবারের আশ্রয় ত্যাগ করিলাম, কিন্তু বিপদের সময় আমাদিগের ধরিবার লক্ষ্য নাই। দাতব্য চিকিৎসালয়ে শিশুদিগকে পাঠাইতে কোন্ ভদ্র পরিবার সম্মত হইবেন? ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া যাঁহারা আত্মীয়দিগের পায়ের শব্দ পাইয়া সরিয়া পড়েন, তাঁহারা কি করিয়া সন্তান হইবার প্রাক্কালে দাতব্য-চিকিৎসালয়ে যাইবেন? আমাদের পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে তাহার ব্যবস্থাই বা কোথায়? যে প্রচুর অর্থ দ্বারা এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সাধারণের চেষ্টায় হইতে পারে, তাহা এ দেশে কোন কালেই হইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না।

এইজন্য আত্মীয়-স্বজন লইয়া আমাদের ঘর-করনা। তাহাদের কেহ বা অকর্ম্মা, কোন কাজই করে না, তাস খেলিয়া, বাঁশী বাজাইয়া বেড়ায়; অনাথা দূর আত্মীয়া বিধবা হয়ত তাঁহার বিবাহ যোগ্যা কন্যা লইয়া আপাততঃ গলগ্রহের মত হইয়া আছেন; তিনি জপের মালায় অঙ্গুলি ঘুরাইতে-

ছেন ও আতপ-চাউল, কাঁচকলা নাড়াচাড়া করিতেছেন। অনেক সময় বিবাদের কথায় সমস্যা পূরণ করিয়া এ পক্ষ বা সে পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছেন; কিন্তু যখন গৃহিণী পারিলেন না, তখন তিনি একাই একশ হইয়া রাঁধিতেছেন; আমিষ পাকের রান্না সারিতে সারিতে বেলা হেলিয়া পড়িয়াছে, তার পর প্রসন্ন-মুখে নিজের উনানে আগুন ধরাইতেছেন। যে ছোঁড়া তাস খেলিয়া, বাঁশী বাজাইয়া কাল কাটাইতেছিল, সে বাড়ীর কাহারও অসুখের সময় রাত্রে তিনটার সময় ডাক্তার ডাকিয়া বেদানা-দাড়িম কিনিয়া আনিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সমস্ত কাজ প্রফুল্লমনে করিতে লাগিল,—কোন পরিবারে কেহ মরিলে এইরূপ অকর্ম্মা লোকেরাই শব-দাহের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। বিপদের সময় দেখা যায়—ইহারা গৃহস্থের কিরূপ বন্ধু! অজস্র টাকা খরচ করিয়া ভাল অবস্থার লোক যাহা না করিতে পারে,—নিঃস্বার্থ-ভাবে ইহারা তাহা করিয়া থাকে, ইহাদের দ্বারা যে সকল উপকার পাওয়া যায় তাহার তুলনায় ইহাদের পাছে খরচ অতি সামান্য।

অকর্ম্মার কাজ

সুতরাং গৃহস্থালীর পক্ষে একান্নভুক্ত পরিবারের একটা দরকার আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি বড় মানুষদের কথা বলিতেছি না, তাঁহাদের অর্থ থাকার দরুণ অনেক সুবিধা হইতে পারে, তাঁহারা একান্নভুক্ত পরিবারে শৃঙ্খল গ্রহণ নাও করিতে পারেন; কিন্তু মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের তাহা ছাড়া উপায় কি? ফলে দেখা যায়, কেহ কেহ নিজের সহোদর ও সহোদরাকে ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়দিগকে লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া আছেন। সেই সকল আত্মীয়তা যদি বেশী মিষ্ট হয়, তবে ক্ষতি কি? একভাবে একান্নভুক্ত পরিবার ভাঙ্গিয়া অন্য ভাবে তাহার পত্তন দেওয়া হইল, এই মাত্র! পিতামাতার সম্পর্কিত আত্মীয়ের যে স্বাভাবিক স্নেহ আছে, শ্বশুর-বাড়ীর লোকের তাহা ততটা থাকিবার কথা নহে;

এইজন্য একত্র থাকিতে হইলে নিজ বাড়ীর আত্মীয়দের সঙ্গে একত্র থাকা বেশী সুখের হয়, তাহাতে স্বগৃহের সম্মান অটুট থাকে এবং বংশগত প্রকৃতি ধারাবাহিকরূপে রক্ষিত হয়।

আমি এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহা সকলই আর্থিক লাভ-ক্ষতির হিসাব দেখাইয়া। কিন্তু এই ব্যাপারে একটা সাত্ত্বিক দিক্ আছে। বহু আত্মীয়ের সঙ্গে একত্র থাকায়, যে আত্মত্যাগ, ক্ষমা ও উদার ভাবের চর্চ্চা করিতে হয়—তাহাতে মানুষ উন্নত হয় ও ভগবানের বেশী সম্মুখীন হয়। কোন কোন সংসার ভোগের, কোন কোন সংসার ত্যাগের। শুধু পতি পুত্র লইয়া যাঁহারা সংসার করেন, তাঁহারা যে ত্যাগশীল হইতে পারেন না, এ কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু যৌথ-পরিবারই সেই ত্যাগের প্রকৃত ক্ষেত্র।

একত্র থাকায় বিপদ্

যেখানে ত্যাগ নাই, উচ্চ ধর্ম্মভাব নাই, সেখানে যেন কেহ যৌথপরিবার গড়িবার বিফল প্রয়াস না পান। আমি এরূপ দেখিয়াছি যে, এক বাড়ীতে পিতা-মাতা এক উনানে রাঁধিয়া খাইতেছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যেও সর্ব্বদা কলহ হওয়ার দরুণ তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে উপবাসী থাকিতেছেন। বড় পুত্র ও তাঁহার স্ত্রী এবং শিশুগণসহ এক বাড়ীতেই আর এক উনানে রাঁধিয়া খাইতেছেন। মধ্যমের আর এক উনান এবং এই সমস্ত পরিবার-ময় খুনোখুনি ঝগড়া চলিতেছে; কখন এক ভ্রাতার ঝি অপর ভ্রাতার খাওয়া-দাওয়া কিংবা চলা-ফেরা সম্বন্ধে আলোচনা করার দরুণ হঠাৎ দেখা গেল, সেই ভ্রাতা আসিয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া রক্তারক্তি করিতেছেন; বাড়ীময় পুলিস আসিয়া সকলের জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছে। অবিবাহিত সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা কখনও বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিন্দা করিয়া মধ্যম ভ্রাতার প্রাণপ্রিয় হইয়া তাহারই সংসারে কিছু অন্ন-জল পাইতেছেন, কখনও মধ্যম ভ্রাতৃবধূর হঠাৎ কোন দোষ আবিষ্কার করিয়া তাহা সর্ব্বসমক্ষে কীর্ত্তন

করার দরুণ ক্ষমা-শীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রীত হইয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বলিতেছেন, "তুই ওখানে আর যাস্ না, আমারই মধ্যে খা।" কখনও বা সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা—সত্য কথা বলার দরুণ—উভয় ভ্রাতাকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কাণ্ডারীবিহীন নৌকার ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে পিতামাতার উনানের পার্শ্বে আসিয়া বসিতেছে। কোন আত্মীয় যদি সেই বাড়ীতে গিয়াছেন, তবে মহাবিপদ্; তিনি কাহার ঘরে খাইবেন? তিনি যে গৃহ আশ্রয় করিবেন, সে গৃহ হইতে অপরাপর সংসারের লজ্জাকর কেচ্ছা তাঁহাকে শুনিতে হইবে, তাহা শুনিবার জন্য দাস-দাসী কান পাতিয়া আছে। তাহারা যথাস্থানে সেই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিতে বিলম্ব করিবে না, ফলে সেই আত্মীয়ের আগমন উপলক্ষে এক সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। স্বয়ং গঙ্গা আসিয়াও নিবাইতে পারিবেন না। এক পরিবারে ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতার বাহু তাঁহার ৩৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র এমনই জোরে কামড়াইয়া দিয়াছিল যে, পিতা তজ্জন্য পুলিসকোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন এবং পুত্রবর ক্ষমা-প্রার্থনাপত্র কোর্টে সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিয়া অব্যাহতি পায়। দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্চ পরিহাস ও হাস্যের কারণ পিতা-পুত্র সেই উত্তেজনার সময় বুঝিতে পারেন নাই।

আমরা যৌথ-পরিবারের পক্ষপাতী হইলেও যেখানে নৈতিকব্যাধি এরূপ প্রবল এবং যেখানে দিবারাত্র এরূপ অভিনয় হয়, সেখানে একত্র থাকা কখনই অনুমোদন করি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে, যেখানে ক্ষমা ও ত্যাগ সংসারকে শোভন করিয়াছে, সেইখানেই যৌথ-পরিবারে শুভফল দৃষ্ট হয়। যাঁহারা নিজের সুখ অপেক্ষা পরের সুখ কিসে বেশী হয়, তাহাই চিন্তা করিতে পারেন, যাঁহারা ক্ষমা ও দয়ার দ্বারা পরকে আপন করিয়া লইতে পারেন, তাঁহারাই এক ছত্রের

একত্র থাকা কোথায় সম্ভব কোথায় অসম্ভব

তলে বাস করিবার যোগ্য। প্রাচীনকালে ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রভাবে সমাজের লোকেরা সেই যোগ্যতা লাভ করিতেন। রামায়ণ তখন সমাজের আদর্শ-গ্রন্থ ছিল। পিতার একটা মুখের কথার জন্য পুত্র সকল সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতেন, ভ্রাতাকে সেবা করিয়াই কনিষ্ঠ মনে করিতেন, তাঁহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে; প্রভুকে সন্তুষ্ট করার তুল্য বড় কার্য্য ভৃত্যের কিছু ছিল না। এই কথা আসরে খোলের বাদ্যের সঙ্গে বাজিয়া উঠিত; কথক মহাশয় নানা ছন্দে ইহা হৃদয়গ্রাহী করিয়া শুনাইতেন; পল্লীর যাত্রার দল এই তত্ত্বের অভিনয় করিয়া শ্রোতার হৃদয় গলাইয়া দিতেন। সুতরাং যেরূপ তরুকুঞ্জের মধ্যে গৃহটি ছায়া-শীতল হইয়া থাকে,—গৃহ-ধর্ম্ম এই সকল প্রভাবের দ্বারা সেইরূপ স্নিগ্ধ হইয়া থাকিত। এখন সে সকল প্রভাব নাই; যে সূত্রের বন্ধনে আত্মীয়দের সঙ্গে একযোগ হইয়া থাকিতে পারা যাইত, উদার ধর্ম্মবুদ্ধি ভিন্ন সে সূত্র পরিচালনা করিবে কে?

কিন্তু এই আদর্শটি যাহাতে রক্ষা পায়,—তজ্জন্য আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। অলসতার প্রশ্রয় না দিয়াও যৌথ-পরিবার বহু স্বগণের সমবেত চেষ্টায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। প্রাচীন ধর্ম্ম-ভাবের সঙ্গে এখনকার কর্ম্মের আদর্শের যদি যোগ করা যায়—তবে ত্যাগের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া যৌথ-পরিবার পুনরায় নব-জীবন লাভ করিতে পারে।

এখনও নিম্ন-সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ-পরিবারের উৎকৃষ্ট ভাবগুলি মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয় কোন এক পরিবারের চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া দেখেন, প্রায় একশত লোক একত্র আছে, তাঁহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। সকলেই একরূপ খান, একরূপ পরেন। তাঁহাদের প্রীতি দেখিয়া কবিরাজ

আদর্শ যৌথ-পরিবার

মহাশয় বড়ই আনন্দ লাভ করেন; বাড়ীর কর্ত্তা ভোলা মহেশ্বর; কে তাঁহাকে কর্ত্তা বলিয়া বুঝিবে? কে খাইল, কে না খাইল—কাহার চিকিৎসার দরকার, কাহার কি টাকার দরকার, ইহাই তিনি দেখিতেছেন; সকলের তহবিল এক; তাহা কর্ত্তার হাতে,—অথচ কর্ত্তা নিজের সুখ একবারটিও ভাবেন না। কবিরাজ মহাশয় গৃহ-কর্ত্তার জামাতার চিকিৎসার জন্ম আহুত হইয়াছিলেন,—পার্শ্বে অল্পবয়স্কা স্ত্রী বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয় কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কি আপনি দোজ-বরে দিয়াছেন? জামাতার বয়স একটু বেশী দেখিতেছি।" কর্ত্তা বলিলেন, "দোজ-বরই বটে" এবং মৃদুস্বরে বলিলেন, "সে কথা আপনাকে গোপনে বলিব।" তার পর কবিরাজ মহাশয়কে নির্জ্জনে বলিলেন, "আমার মেয়েটি মারা গিয়াছে, কিন্তু জামাই চিরকাল আমাদের সংসারে আছেন, তাঁহার মায়া আমরা ছাড়িতে পারি নাই এবং তিনিও আমাদিগকে ছাড়িতে সম্মত নন, এজন্ম কি করি, তাঁহাকে আর এক বিয়ে দিয়ে সেই স্ত্রীকে এখানে রাখিয়াছি। স্ত্রীটি লক্ষ্মী, সে আমার মেয়ে বই কি?" এই বিপুল সংসার চালাইবার পক্ষে কর্ত্তার ইঙ্গিতই মূল-মন্ত্র। যেরূপ কোন বৃহৎ পাদপকে আশ্রয় করিয়া ছোট ছোট তরু-গুল্ম ও লতা বিকাশ পায়, তাঁহারই স্নেহগুণে শতাধিক লোক সেইরূপ আবদ্ধ, বহু আত্মীয় একত্র থাকায় যে ত্যাগ স্বীকার ও প্রীতির দরকার, তাহার চিত্র আমরা এদেশ ভিন্ন কোথায় দেখিব? স্বামী-স্ত্রী একত্র থাকিয়াও অনেক স্থলে ঝগড়া করে। পিতা-পুত্রে মুখ দেখা-দেখি নাই,—অথচ এক বাড়ীতে আছেন। এমন দৃশ্যও যেমন বিরল নহে, তেমনি যৌথ-পরিবারে পূর্ণত্যাগ ও ধর্ম্মভাবও আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই। আমাদের কোন্‌টি অনুকরণীয়? আমরা কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি ধরিব? আমরা সর্ব্বদা স্বার্থের মধ্যে ডুবিয়া থাকিব, না, নিঃস্বার্থ হইব? আমরা কেবল নিজের

খাদ্যের জন্য লালায়িত হইব না পরকে খাওয়াইব? আমরা নিজেকে শুধু স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে বিলাইয়া দিব, না বৃহৎ সংসারের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমাদের যিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁহারই সেবার যোগ্য হইব?

কর্ত্তব্য কি?

যদি সামাজিক দুর্গতি এরূপ হইয়া থাকে যে, যাঁহারা মাতার এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, সংসারে তাঁহারা আর কোনরূপেই এক স্থানে বসিয়া খাইতে পারেন না, একের দুঃখে অপর আর দুঃখিত হন না,—বরং হাঁসপাতালে যাইবেন, বরং ঋণ করিয়া ভৃত্যের সংখ্যা বাড়াইবেন, তথাপি ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইবেন, কিছুতেই একত্র থাকায় স্বীকৃত হইবেন না; তাহা হইলে যাহা মন্দের ভাল, তাহারই ব্যবস্থা হউক,—এ সম্বন্ধে আমরা আর কি বলিতে পারি!

মহিলাগণের নিকট আমার এই নিবেদন, অনেকে আপনাদের উপর এ সম্বন্ধে সকল দোষ চাপাইয়া থাকে। যদি উপার্জ্জন-শীল স্বামীর অকর্ম্মা দুইটা ভাই থাকে, তাহারা কি গৃহিণীর স্নেহের কোন দাবীই রাখে না? যাহারা নিজে অযোগ্য, তাহাদিগকে একটু স্নেহ দেখাইলে তাহারা কত অনুগত হয়! সংসারের নিজের সুখের দিকে যিনি অতিরিক্ত লক্ষ্য করিবেন, দুঃখ তাঁহার পাছে পাছে যাইবে। নিজের শিশুরা যাহা খায় ও পরে, ভ্রাতার শিশুরাও যদি তাহাই খায় পরে—অথচ যদি সকলে সত্যবাদী, পরদুঃখ-কাতর চরিত্রবান্ হইবার শিক্ষা পায়,—তবে তাহারা সমাজের ভূষণ হইবে। একটা সন্দেশ নিজের ছেলে বেশী খাইতে পারিবে, বা বিলাতী ধুতি না পরিয়া মূল্যবান্ দেশী একখানা ধুতি পরিবে—ইহাই কি প্রকৃত লাভের বিষয়? এই লাভের আশায় ঈশ্বর যাহাকে ভাই করিয়া পাঠাইয়াছেন,—তাহাকে গৃহত্যাগ করাইতে হইবে,—যাহাকে জননীরূপিণী ভগবতী একত্র বসাইয়া তাঁহার স্নেহময় হস্তদ্বারা এক থালা

স্বার্থপরতা

হইতে খাওয়াইয়াছিলেন,—সে পথে পড়িয়া উপবাস করিবে, আর আমি নিজে নানা সুখাদ্য দ্বারা উদর-তৃপ্তি করিব; এরূপ জঘন্য স্বার্থ কি ভাল?

এখনকার দিনে বহুলোককে একত্র খাওয়াইবার সংস্থান অনেকের নাই; কিন্তু নিজের বহু ছেলে হইলে তাহাদিগের কোন একটি ত্যাগ করিবার ইচ্ছা কেহ করেন না,—সেইরূপ যাহাদের কোন গতি নাই, দেবতা যাহাদের সঙ্গে এক সংসারে জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহারাও কি পরিত্যাগের সামগ্রী? আমরা পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিয়া থাকি এবং ভাবি যে, সংসার আমরা নিজেরা চালাইতেছি; কিন্তু সংসার যাঁহার কৃপা ছাড়া অচল হয়, এবং যে ব্যক্তি নিজে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরের জন্য কাঁদে, তাহার কান্নায় ভগবানের আসন টলে, তিনি সেই সংসারের ভার নিজের হস্তে লন।

একান্নভুক্ত পরিবারের আত্মীয়গণের জন্য যে দুঃখ ও ত্যাগ সহিতে হয়, তাহা কখনই গৃহিণী—স্বামীর কানে তুলিবেন না। সকল ছেলেকে সমান চক্ষে দেখিতে চেষ্টা করিবেন। শিশুগণ সংসারের কিছুই জানে না,

একত্র থাকার অনুকূল কতকগুলি নিয়ম

—তাহাদের সম্পর্কে ভেদ-বুদ্ধি দেখান উচিত নহে। নিজের ছেলের উপর অবশ্য স্নেহ সমধিক হয়,—সেই গভীর ভালবাসা প্রকাশ্যে দেখাইবার প্রয়োজন নাই, বাহিরে না দেখাইলে মাতৃস্নেহ কমিবে না,—সমুদ্রের কোন ভাটা নাই। অথচ প্রকাশ্যে সমস্ত শিশুদের প্রতি সমান ব্যবহারে তাহাদের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন বেশী দৃঢ় হইবে, এবং একজনকে অপরে ঘৃণা করিতে শিখিবে না,—বা একজন আদরের ভাগ বেশী পাওয়াতে অপর সকলের মুখ ছোট হইয়া যাইবে না।

একান্নভুক্ত পরিবারের পরস্পরের মধ্যে কাহারও কোন দোষ ঘটিলে

তাহার অবর্ত্তমানে সেই দোষের আলোচনা করা সঙ্গত নহে। স্বভাবতঃ রাগের সময় যে কথা হয়, তাহার ঝাঁজ থাকে ; তার পর সেই কথা যদি তৃতীয় ব্যক্তির মুখে অতিরঞ্জিত হইয়া আলোচ্য ব্যক্তির কানে পৌঁছায়, তাহা হইলে তিল বড় হইয়া তাল হইয়া পড়িবে। এই জন্য যাহার সম্পর্কে যে কথা বলিতে হইবে, তাহাকে বলাই ভাল। অপরাধী ব্যক্তিকে স্নেহের সহিত তাহার দোষ দেখাইয়া দিলে সে লজ্জিত হইবে। কিন্তু সে যদি এরূপ বোঝে যে, তাহার কথা লইয়া বাড়ীতে একটা জটলা হইতেছে, তবে সে নিজের অপরাধ ভুলিয়া রাগিয়া যাইবে। এই জন্য যৌথ-পরিবাররূপ জাহাজ সংসার-সমুদ্রের উপর ভাসাইতে হইলে কর্ণধারগণ অসাক্ষাতে আলোচনারূপ ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে উহাকে রক্ষা করিবেন। এই আলোচনা হইতেই গৃহ-বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। ঝি, চাকর কি নিজের ছেলেদের মধ্যে প্রথমতঃ এইরূপ সমালোচনা আরম্ভ হয়, তার পর গৃহস্থ গৃহিণীর মুখে সেই আলোচনার সার সংগ্রহ করেন। যাহাদের বিষয় লইয়া আলোচনা-হয়, হাজার গোপনে হইলেও তাহারা তাহা টের পায়, এইভাবে মনান্তর ঘটে। তখন একের দোষ অন্যে বাড়াইয়া বলিতে থাকে, এই অসাক্ষাতের আলোচনায় ক্রোধ ক্রমশঃ জমিয়া উঠে। তার পর সামান্য কোন কথা লইয়া বড় বড় ঝগড়া বাধিয়া যায়। যেমন ভিতরে নালি লাগিলে ঘায়ের উপর শুকাইলে কি হইবে? সেইরূপ ভিতরে যদি বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়, তবে অপরের চেষ্টায় সাময়িক সদ্ভাবের ভাণ রাখিলে কি লাভ হইবে? কোন সময় দুই শিশুর সামান্য মারামারি উপলক্ষে কোন অভিভাবক অভি-ভাবিকার ক্ষুদ্র মন্তব্য এরূপ প্রবলাকার ধারণ করে যে, শেষে উকীল ডাকিয়া সেই পৈশাচিক ব্যাপার সম্বন্ধে মন্ত্রণা লওয়া হয়—এক ভাই অপরকে কিরূপে জব্দ করিবে, তাহারই প্রাণান্ত চেষ্টা হয়। এটা সকলেরই জানা আছে যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের মত একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড এই-

ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল,—সুতরাং আদালতে যে প্রত্যহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্র এই ভাবে নিত্য নিত্য সংঘটিত হইবে—তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

শকুনি মহাশয়দের চেষ্টায় এই সকল ব্যাপার ক্রমশঃ ফাঁপিয়া উঠে, তখন শকুনি মহাশয়েরা এক এক পক্ষের প্রাণাপেক্ষা অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন।

শকুনির চেষ্টা

পরের দোষ আলোচনার ফলে এইরূপ যে আত্মীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইতে জঘন্য কিছু কল্পনা করা যায় না। শকুনি পুরুষজাতীয়ই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, তাঁহাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। যৌথ-পরিবারের যে যাহার দোষ দেখিবে, তাহাকে সম্মুখে ডাকিয়া শাসন করিবে। স্নেহের শাসন সকলেই মাথায় করিয়া লইতে প্রস্তুত। গুরুজনের দোষ দেখিলে যতটা সহিতে পারা যায়, তাহা সহিবে। "যে সহে সে রহে" ইহাই প্রবাদ কথা। যে নীরবে সহ্য করে, ভগবানের স্নিগ্ধ চক্ষু গোপনে তাহার হৃদয়ের দিকে ন্যস্ত থাকে। যখন অসহ্য হইবে, তখন তাঁহার পায়ে পড়িয়া দুঃখ জানাইবে। তখন তাঁহার দয়া হইবে। যৌথ-পরিবারের সুখ-শান্তি স্বর্গীয় জিনিষ; উহা সকলের হৃদয়ের নির্ম্মলতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের উপর দাঁড়াইয়া থাকে। ইহা যখন পূর্ণ শোভায় বিকাশ পায়, তখন ইহাকে একান্ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই ফুলের বাগান একটা ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে পারে। বিদ্বেষের কীট ঢুকিলে দুদিনে ফুলগুলির গোড়া কাটিয়া ফেলিবে।

যৌথ-পরিবার রক্ষার আর একটা প্রধান উপায় চিত্ত-সংযম। হঠাৎ রাগিয়া মানুষ এমন কাজ করিয়া বসে যে, প্রীতির বন্ধন সমস্ত একচোটে

চিত্ত-সংযম

ফর্‌সকিয়া যায়। আমার এক বন্ধু বলিয়াছেন, যখন তাঁহার রাগ হইত, তখন তিনি এক হইতে একশত পর্য্যন্ত গণিতেন; রাগের সময় অপরের দোষগুলি বৃহৎ হইয়া চোখের

সামনে ঠেকে, এবং ন্যায় অন্যায়ের একটা বিকৃতি যুক্তি মাথার মধ্যে প্রবেশ করে; সেই যুক্তির মধ্যে নিজের দোষের চিন্তা আদৌ থাকে না; কেবল পরের কার্য্য-সমালোচনার চেষ্টা থাকে। নিজের কর্ত্তব্য কি? এই প্রকৃত কথাটির খেই হারাইয়া যখন কোন লোক কেবল পরের দোষের চিন্তা করে, তখন সে তাহার কর্ত্তব্য-নিরূপণের একেবারে অযোগ্য হইয়া পড়ে। আগে তাঁহার মন স্থির করা আবশ্যক। রাগের সময় এক হইতে একশত পর্য্যন্ত গণিলে এই সময়ের মধ্যে ঝড় অনেকটা শান্ত হইয়া যায়, হৃদয়ের বিকার অনেকটা ঘোচে, তখন কথা বলিবার যোগ্যতা কতকটা লাভ হইতে পারে। ঠিক রাগের মুহূর্ত্তে কথা বলিলে জিহ্বা অসংযত হইবে, এবং এমন সকল বাক্য উচ্চারণ করিবে, যাহার জন্ম পরিণামে অনুশোচনা করিতে হইবে। আমার বন্ধু অপেক্ষা আমি একটু বেশী দূরে যাইতে চাই। রাগ হইলে অন্ততঃ দুই তিন ঘণ্টা পরে সেই কথা মাথায় আনা উচিত। আমি পরকে গালি দেব, ইহা অপেক্ষা দুর্নীতি আর কি হইতে পারে? শিশুর মৃত্যু হইলে মা ভালবাসিয়া তাহাকে যে সকল গালাগালি দিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও তাঁহার কত কষ্ট হয়। যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে গালাগালি দেওয়ার আমাদের কি অধিকার থাকিতে পারে! যে গালাগালি দেয়, যদি প্রকৃতই কেহ তাহার উপর অন্যায় করিয়া থাকে, তথাপি সে লোকের সহানুভূতি পায় না। পরকে জিহ্বা দ্বারা পীড়ন করা আমাদের অন্যায়। যিনি জিহ্বা দিয়াছেন ও কথা শিখাইয়াছেন, তিনি কালই আমার কথা বলিবার শক্তি হরণ করিতে পারেন। যাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছি, বা যাহারা নীরবে আমার অত্যাচার সহ্য করিতেছে, আমাদের দশা কাল তাহাদের অপেক্ষাও শতগুণে হীন হইয়া যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে আমরা কখনও রাগিতে দেখি নাই; আমি একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলাম, "আপনি কখনও রাগেন না, এরূপ সংযম কিসে পাইলেন?" তিনি বলিলেন, "আমি কখনও কাহারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না; এইজন্য যে যাহা করুক, আমার কিছুতেই রাগ হয় না।" আপনারা অনেকেই সক্রেতিসের কথা শুনিয়াছেন, তাঁহাকে কেহ কখনও রাগিতে দেখেন নাই। কয়েকজন বন্ধু চেষ্টা করিলেন, তাঁহাকে রাগাইতে পারেন কি না। তাঁহারা সন্ধান করিয়া জানিলেন, সক্রেতিস ভাল বিছানা না হইলে শুইতে পারেন না। চাকরকে ঘুস দিয়া তাঁহারা একদিন বিছানাটা অপরিষ্কার করাইয়া রাখিয়া দিলেন; সক্রেতিস্ পরদিন চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিছানাটা অপরিষ্কার ছিল, ভাল করিয়া রাখ নাই কেন?" চাকর বলিল, "কাজের তাড়ায় সে উহা করিয়া উঠিতে পারে নাই।" দ্বিতীয় দিনও বিছানার প্রতি কোন যত্ন লওয়া হয় নাই, সক্রেতিস্ আবার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, চাকর যা হো'ক একটা কৈফিয়ৎ দিল। কিন্তু তৃতীয় দিন চাকরের অনুতাপ হইল, সে সক্রেতিসের পায় ধরিয়া ক্ষমা চাহিল এবং বলিল, তাঁহাকে রাগাইবার জন্য চেষ্টিত বন্ধুদের প্ররোচনায় সে ঐরূপ করিয়াছে, কিন্তু রাগাইতে পারে নাই। সক্রেতিস্ বলিলেন, "তুমি আমার উপকার করিয়াছ, খারাপ বিছানায় শুইতে আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।" কোন কোন স্ত্রীলোক হয়ত কাহারও উপর রাগিয়া, সে রাগ বাহিরে সামলাইয়া লইলেন, কিন্তু তখনই স্বীয় নিরপরাধ শিশুটির পৃষ্ঠে বিষম কিল চড় মারিয়া মনের ঝাল মিটাইলেন। যাহার উপর রাগিয়াছেন, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকিলে মনে করিবেন যে ঐ কিল প্রকৃতপক্ষে শিশুর উপর পড়ে নাই, তাঁহারই উপর পড়িয়াছে। এই সকল অভিনয় হইতে একান্নভুক্ত পরিবারের লোকেরা সতর্ক থাকিবেন। কারণ, এইরূপ শিশুর প্রহারে একান্নভুক্ত পরিবারের ভিত্তি অনেক সময় নাড়া পড়িয়া থাকে।

গৃহিণী পরিবেশনের সময়ে লক্ষ্য রাখিবেন,—সকলে সমান ভাবে পাইতেছেন কি না ? কলিকাতার কোন রাজা তাঁহার কর্ম্মচারী ও আত্মীয়গণের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতেন, তাঁহারা যাহা খাইতেন, তিনি নিজেও তাহাই খাইতেন। সম্প্রতি তিনি মারা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই উদারতায় স্বজন ও কর্ম্মচারিগণ তাঁহার প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট ছিলেন, তাহা বলিবার নহে। নিজের ছেলে ও অপরের ছেলের মধ্যে মিষ্টান্নাদি বিতরণের সময় অনেক গৃহিণীই একটু পার্থক্য দেখাইয়া থাকেন। একান্নভুক্ত পরিবারের পক্ষে এই আচরণ ভাল নহে। তাঁহার এই পক্ষপাত সেই সকল শিশু লক্ষ্য করিয়া থাকে, তাহাদের জনক-জননীরাও উহা ব্যথার সঙ্গে অনুভব করেন। নিজের ছেলের মাছ কিংবা মিষ্টান্নের ভাগ বেশী হইল, দেবরপুত্র বা ভাগিনেয়রা কম পাইল, এই বিসদৃশ ব্যবহার শিশুরা কিছুতেই ভোলে না। তাহারা ইহাতে মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করে, যদিও এ সম্বন্ধে সাধারণতঃ তাহারা কোন কথা বলে না। আমার যখন আট বৎসর বয়স, তখন আমি আমার খুব নিকট আত্মীয় কোন ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সে বাড়ীর গৃহিণী অতি উদার-চেতা, নিজের ছেলে পরের ছেলে তাঁহার নিকট সমান ছিল ; অন্ততঃ আহার করিতে বসিয়া আমরা তাঁহার ছেলেদের সঙ্গে কোন পার্থক্যই অনুভব করিতাম না। একদিন তিনি আমাকে ও তাঁহার ছেলেকে খাইতে ডাকিয়া দুইখানি থালা আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গেলেন, তখনও খাদ্য পরিবেশন করেন নাই। আমাকে যে থালাখানা দিয়া গেলেন, তাহা ভাল, নিজের ছেলেকে একটা ভাঙ্গা থালা দিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য, ইহা ইচ্ছাকৃত নহে। হাতের সাম্‌নে যাহা পাইয়াছিলেন, যে নিকট, তাহাকে তাহাই দিয়াছিলেন। পরিবেশনের সময় তাঁহার কার্য্যান্তরে ডাক পড়িল, তিনি স্বীয় দেবর-পত্নীকে

সমদৃষ্টি

পরিবেশন করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। দেবর-পত্নী আসিয়াই আমার থালাটি ভাল ও বাড়ীর ছেলের থালাটি ভাঙ্গা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,— "ওগো, এই ভাঙ্গা থালাটা ইহাকে কে দিয়াছে?" এই বলিয়া সেই ভাঙ্গা থালাটা ঘুরাইয়া আমাকে দিলেন, ও ভাল থালাখানা তাহার সম্মুখে রাখিলেন। যদি প্রথমে ভাঙ্গা থালা পাইতাম, তবে কিছুই মনে হইত না; কিন্তু এইরূপ বিসদৃশ আচরণে আমি এরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম যে, আজ এই দীর্ঘকাল পরেও আমার সেই কথাটি মনে আছে।

একান্নভুক্ত পরিবারে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইলে এই ভাবে প্রত্যেক বিষয়ে নিজের ইচ্ছাকে দমন করিতে হয়। ইহাতে কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা সুগৃহিণী, তাঁহারা কোন কষ্টই অনুভব করেন না; স্বাভাবিক উদারতার গুণে তাঁহারা সকলকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন, বাড়ীর সকলের প্রতি ভালবাসা হইতেই আপনা-আপনি চিত্ত-সংযম অভ্যাস হইয়া যায়। স্বগণ এবং ভৃত্যেরাও তাঁহার কর্ম্মঠতা, ত্যাগ ও সকলের প্রতি সমান দৃষ্টির দরুণ মুগ্ধ হইয়া সেই সংসারে বাঁধা পড়িয়া থাকে।

আগেকার দিনে ঘরে ঘরে সেইরূপ লক্ষ্মীরা ছিলেন। তাঁহারা উলে টুপি বুনিতে জানিতেন না, বা ফার্ষ্ট বুক হইতে দু-ছত্র ইংরাজী পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা বাড়ীর সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন এবং সকলকে ভালবাসিতেন; তাঁহারা ক্ষুধার সময় অন্ন দিতেন, গালাগালি দিয়া বিদায় করিতেন না; বাড়ীর কাহারও কোন কষ্ট হইলে তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন এবং আদর ও উপদেশে সেই ব্যথা ঘুচাইতে চেষ্টা করিতেন; খাইবার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন কাহার কি অসুখ করিয়াছে, এবং কে কোন্ জিনিস খাইতে ভালবাসে, তাহা হয় ত সেই ব্যক্তি নিজে যতটা না জানে, গৃহিণী তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী

আগেকার দিনের মহিলাগণ

জানিতেন। শ্রান্ত ব্যক্তিকে তাঁহারা খাটাইতেন না; যে দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে তাড়া দিতেন না; যে একটু শান্তির জন্ম গৃহে ফিরিত, তাহাকে দ্বিগুণ অশান্তির মধ্যে ফেলিতেন না। তাঁহারা সরল কথায় দোষ দেখাইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না; যে অন্যায় করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত শাসন করিতেন, কিন্তু অন্যায়রূপ শাসন করিতেন না; যে শাসনে বিগড়াইয়া যায়, সে শাসন করিতেন না; এবং যে আদরে ছেলেদের ভবিষ্যৎ মাটী হয়, সেরূপ আদর দেখাইতেন না। ভাঁড়ার-ঘরের তাঁহারা লক্ষ্মী ছিলেন, রান্নাঘরের তাঁহারা অন্নপূর্ণা ছিলেন, এবং পরিবেশনকালে তাঁহারা দয়াময়ী ছিলেন। তাঁহারা নিজের সুখ খুঁজিতেন না; নিজের দুঃখকে যতটা সরাইয়া রাখা সাধ্য, তাহা রাখিতেন, এবং পরের দুঃখকে নিজের দুঃখের মত মনে মনে করার দরুণ সকলকে আপন করিতে পারিতেন। আমি কি খাইব, কি পরিব, ও সেক্‌রার বাড়ীর গহনার ফর্দ্দ কিরূপ হইবে, বাজারে নূতন ধরণের কোন্ বহুমূল্য সাড়ী আসিয়াছে, স্বামীর কাছে দিনরাত্র তাহারই বায়না ধরিয়া থাকিতেন না। বাড়ীর সকলে সুখী হইলেই তাঁহারা সুখী হইতেন। সকলের সেবায় প্রাণপণে নিজেকে নিবেদন করিয়া দিয়া—সেই সেবায় সকলে সন্তুষ্ট হইলে তাঁহারা তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পুরস্কার মনে করিতেন। স্বামীর প্রতি ভালবাসা লইয়া তাঁহারা আড়ম্বর করিতেন না, সেই প্রেম একান্তভাবে গুপ্ত থাকিত; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রেম ধরা পড়িয়া যাইত, নিজের ছেলেদের নিদারুণ শোক উপেক্ষা করিয়া বিবাহের সময় যেরূপ নববস্ত্র পরিয়া সিন্দুর মাথায় দিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইরূপ নূতন বস্ত্র পরিয়া সিন্দুর-মাথায় স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে অগ্নি-শয্যা আশ্রয় করিতেন। বৈধব্যেও তাঁহারা পাতিব্রত্য ও ধর্ম্মের কঠোরতা অবলম্বন করিয়া ভগবানের চরণে আত্ম-

সমর্পণ করিয়া যে উন্নত জীবন দেখাইতেন, তাহার তুলনায় এখনকার নভেল-পড়ায় উৎপন্ন মনের সাময়িক উত্তেজনাগুলি একান্ত খেলো মনে হয়। তাঁহারা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া রান্না ও পরিবেশনাদি করিয়া তৃতীয় প্রহর বেলার পর খাইতে বসিতেন, এমন সময় অতিথি আসিল— আর নিজের ভাতের থালাটি ধরিয়া তাহাকে দিয়া হাসিমুখে উপবাস করিয়া রহিলেন, হয় ত তাহা বাড়ীর কেহই জানিল না। কিন্তু যিনি লোকের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা, উহা নিশ্চয়ই তাঁহার দয়ার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, এ সকল স্ত্রী-জাতির উপর অত্যাচারের কথা, ইহাতে প্রশংসার কথা কি আছে? পুরুষেরা যে একান্ত স্বার্থপর, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু যেখানে বাধ্য-বাধকতা নাই, এবং প্রেমের জন্য কষ্ট স্বীকার করা হয়, সেখানে যে কষ্ট, তাহা তপস্যা। তাহাতে জীবন উন্নত হয়, সেই কষ্ট খুব বেশী হইলেও তাহা অসহনীয় হয় না, কারণ, তাহা স্নেহ-মমতার কষ্ট। স্নেহের জন্য মা কি না করিয়া থাকেন? তাহাতে কি তিনি কষ্ট বোধ করেন? বরং তাহা সুখের, সেই সেবাতে আমাদের জীবন সফল হয় এবং উহা আনন্দময়ের কাছে আমাদিগকে লইয়া যায়। যিনি বৃহৎ সংসারে মাতৃরূপিণী তিনি মাতার মতই স্নেহের সহিত বুক পাতিয়া সেই সংসারের দুঃখ-কষ্ট সহিয়া থাকেন।

সহর ও পল্লী

একান্নভুক্ত গৃহস্থালীর পক্ষে সহর হইতে পল্লী-জীবন উপযোগী। সহরে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কখনই খুব একটা ফাঁকা জায়গা পাইতে পারেন না। ক্ষুদ্র বাড়ীতে অনেককে লইয়া থাকার সুবিধা হয় না। সহরে মুড়ি-মুড়কির চা'ল নাই; সকলের জন্য ভাল জল-খাবারের ব্যবস্থা করা সহজ হয় না। তাহা ছাড়া পচা চর্ব্বি ঘি বলিয়া খাইতে হয়, তাহাও অগ্নিমূল্য। টাকায় ৴৪ সের দুধের অনেকটাই জল, কিংবা তদপেক্ষা স্বাস্থ্যের হানিকর দ্রব্যের মিশাল।

একটু কোথাও যাইতে হইলে ট্রামভাড়া, পোষাক-পরিচ্ছদও কতকটা সভ্যভব্য রকমের করিতে হয়, জুতা না হইলে একদণ্ডও চলে না। বহুলোক একত্র এক বাড়ীতে থাকিলে পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে অনেক সময় বড় অসুবিধা হয়। তাহার জন্য কোন পৃথক্ ব্যবস্থা হইতে পারে না, এবং দিন-রাত্র অজস্র ব্যয় করিয়া গৃহস্থ এরূপ কাহিল হইয়া পড়েন যে, বাড়ীর সকলের দিকে মোটেই নজর রাখার সময় এবং সুবিধা পান না। সুতরাং অনাদরে থাকিয়া ছেলেরা ফেরিওয়ালার নিকট হইতে মটরভাজা ও চিনা-বাদাম খাইয়া ক্ষুধা-নিবৃত্তি করে, এবং ভাত খাইল কি না খাইল, ইহার একটা খোঁজ-খবর রীতিমত না হওয়াতে তাহারা ভগবানের কৃপামাত্র আশ্রয় করিয়া বয়সের দরুণ বাড়িয়া উঠে; নানাবিধ পীড়া তাহাদের জন্য অকাল-মৃত্যুর কণ্টক-শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখে। তাহার পর অভিভাবকগণের মনোযোগের ত্রুটির ফলে তাহারা কুসঙ্গীর সঙ্গ লাভ করিয়া ভাবী জীবনে দস্যু, তস্কর ও হীনচরিত্র হইবার সুযোগ করিয়া লয়।

সুতরাং সহরে বহু-স্বগণ-পরিবৃত হইয়া থাকার সুবিধা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের পক্ষে ভালরূপ হয় না। পল্লী-জীবনই যৌথ-পরিবারের উপযোগী। তথায় অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীই অন্ততঃ দুই বিঘা লইয়া। গরু রাখিবার ব্যবস্থা সহজে হয়, তরীতরকারী ও গাছের ফল অনেক সময় বাড়ীতেই পাওয়া যায়, পুকুরের মাছও গৃহস্থ পাইতে পারেন। খোলা-জায়গায় স্বজনগণ লইয়া থাকার অসুবিধা নাই। এখনও অতি অল্পব্যয়ে পল্লীগ্রামে সংসার চালান যায়। তথায় জমির দাম এত সস্তা যে, খানিকটা জমি লইয়া ফল ও তরীতরকারী জন্মাইতে পারিলে তাহা লাভের হয়, কিছু ধেনো জমি সঙ্গে থাকিলে চা'লের জন্য ভাবিতে হয় না।

কিন্তু অধিকাংশ পল্লী লোকের উপেক্ষায় একরূপ বাসের অযোগ্য হইয়া আছে। বাঁশের ঝাড় ও ডোবাগুলি মশকের স্থায়ী রকমের বাসাবাটী

বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জঙ্গল পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা নাই। জ্ঞাতির সঙ্গে মামলা করিতে যাইয়া যাঁহারা ঘরবাড়ী বাঁধা দিয়া টাকা ধার করিতে পারেন, তাঁহারা বাড়ীর পার্শ্বে নরককুণ্ডের মত ডোবাটি পরিষ্কার করিবার কথা উঠিলে, পয়সার অভাব জানাইয়া থাকেন। অনেক গৃহস্থের বিস্তর জমি পড়িয়া আছে, তাহা ঘোর অরণ্য হইয়া আছে; কিন্তু অনেক সময় গৃহস্থ তাহা বিক্রয়ও করিবেন না, পরিষ্কারও রাখিবেন না বা তাহাতে রায়ৎও বসাইবেন না। ইহাঁদিগকে কর্ত্তব্য শিখাইবার জন্য আইন প্রস্তুত করা আবশ্যক। ইহাঁরাই ম্যালেরিয়ার চির-সহায় ও আশ্রয়দাতা। পূর্ব্বে প্রত্যেক গৃহস্থই পুকুর কাটাইতেন, পানীয়-জলের ব্যবস্থার জন্য রাজা প্রজা সকলের সমবেত চেষ্টা ছিল। এখন যে পুকুরগুলি আছে, তাহার জল পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা কেহ করিবেন না; এ অবস্থায় অনেক পল্লী যে দুরবস্থার চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছে, ইহা আর একটা বিচিত্র কথা কি?

কিন্তু আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, পল্লী-জীবনই অবলম্বন করিতে হইবে। সহরের বৈদ্যুতিক আলো আমাদিগের পথ উজ্জ্বল রাখিবে না, সহরের ট্রামে আমাদের গন্তব্য স্থির হইবে না; রঙ্গমঞ্চের অভিনয় ও বায়স্কোপে আমাদের জীবনে প্রকৃত স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া পাইব না। আমাদের মেয়েরা যদি এ কথা বুঝেন, তবে আমাদের ইহা বুঝিতে দেরী হইবে না। তাঁহারা সহরে থাকিতে চাহেন বলিয়া আমরা সহরে আসিয়াছি। তাঁহারা যদি এই সকল আমোদ ও আপাততঃ সুবিধাগুলির মোহে অন্ধ না হইয়া পল্লীর গৃহস্থালীকে বরণ করিয়া লন, তবে পল্লীতে ভদ্রলোকগণ ফিরিয়া যাইবেন এবং পল্লীগুলির অবস্থা ভাল হইবে। তাহা হইলে আমরা খাইয়া বাঁচিব এবং আমাদের ছেলেরা দীর্ঘায়ুঃ হইবে। ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে গ্রামগুলিকে কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি

স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় দেখিয়াছেন। তিনি একক যাহা করিয়াছেন, পল্লীবাসিগণ একত্র হইয়া তাহা করিতে পারেন। আমরা যদি এ বিষয়ে যত্নপর না হই, তবে কখনই বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। সহরে বাস করিয়া মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা নানারূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছেন, অথচ বিলাসের মোহে দুর্গতিকে দুর্গতি বলিয়া মনে করিতেছেন না। পল্লীবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা উপার্জ্জন করিবেন ও লেখা-পড়া শিখিবেন, তাঁহাদের সহরে থাকিতে হইবে, কিন্তু পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রভূমি পল্লী থাকিবে, এই ব্যবস্থা করা ভাল।

মেয়েদের চলাফেরা

পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের চলাফেরার কোন অসুবিধা ছিল না, এখনও নাই। পল্লীবাসিনীরা কলসী কাঁখে লইয়া নদীর ঘাটে অনেকটা হাঁটিয়া যান, এ পাড়া হইতে ও-পাড়ায় তাঁহাদের সর্ব্বদা গতিবিধি; তাঁহাদের লজ্জার খুব একটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি নাই। পথে অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে তাঁহারা একটু ঘোম্‌টা টানিয়া সরিয়া দাঁড়ান, এই পর্য্যন্ত। ইহা ছাড়া উৎসবও কোন ক্রিয়া-উপলক্ষে মেয়েরা হাঁটিয়া এ বাড়ী ও বাড়ী যাতায়াত করেন ও গৃহকর্ম্মের অনুরোধে বাড়ী-সংলগ্ন ক্ষেত্রাদির পরিদর্শনও নিজেরা করিয়া থাকেন। দুঃস্থ ভদ্রঘরের মেয়েরা পাড়াগাঁয়ে গরুর রাখালি করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না।

কিন্তু সহরের অবস্থা তুলনা করুন। মেয়েরা তথায় পিঞ্জরের পাখী, এ উপমায় কিছুমাত্র অলঙ্কার দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদের সমস্ত গতিবিধি দুই একখানি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ। বাহিরে স্ত্রীস্বাধীনতার বড় বড় বক্তৃতা চলিতেছে, কিন্তু সহরের স্ত্রীলোকদের মত পরাধীন জীব কল্পনা করা যায় না। উপর হইতে কখনও কখনও সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে নামা এবং দিবারাত্রি প্রায় সমস্ত সময়ই এক ঘরে পড়িয়া থাকা, ইহাতে তাঁহাদের শরীর সকল প্রকার গতিবিধির সুবিধা খোয়াইয়া কিরূপ ব্যাধি ও

আলস্যের জীবন্ত মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন।

যাঁহারা শিশুকালের পর জীবনে হাঁটিলেন না, তাঁহারা কিরূপ অস্বাভাবিক হইয়া পড়িলেন, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এই সকল স্ত্রীলোকের সন্তানেরা যে জন্মাবধি বাতরোগে কষ্ট পাইবেন ও পঙ্গু হইয়া পড়িবেন—তাহা সহজ-সিদ্ধ কথা। আমাদের পারিবারিক জীবন এইভাবে চলিলে, প্রতি গৃহ বাত-রোগের হাঁসপাতাল হইয়া দাঁড়াইবে; স্বভাবের এইরূপ প্রতিকূলতা কখনই জীবনের লক্ষণ নহে। অথচ সহরের চারিদিকে অজ্ঞাত লোকের বস-বাস থাকায় স্ত্রীলোকের গতিবিধি বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের নিয়মানুসারে অধিক স্বাধীন করা যায় না।

এই সকল কারণে মেয়েরা যদি পল্লী-জীবনের পক্ষপাতী হন, তবে আমাদের সমাজের মঙ্গল। পল্লীগ্রামের অসুবিধাগুলি কি ভাবে দূর করিয়া উহাদিগকে বাসযোগ্য করা যায়, তাহা এখন স্ত্রীপুরুষের একত্র হইয়া ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। বড় লোকদের সম্বন্ধে আমার কথাগুলির বেশী সার্থকতা না থাকিতে পারে। তাঁহারা সহরের উপরই চার পাঁচ বিঘা লইয়া বাড়ী ও তাহার আঙ্গিনার পত্তন দিয়াছেন; এবং মেয়েদেরও গৃহপিঞ্জরের রেলিং বা দাঁড় ধরিয়া দিনরাত থাকিতে হয় না। তবে পল্লী-জীবন হইতে দূরে থাকিয়া তাঁহারা দেশের লোক সম্বন্ধে এবং দেশীয় সমাজ হইতে এরূপ ভাবে বিছিন্ন হইয়া পড়েন যে, অনেক সময়েই তাঁহারা দেশের কোন কাজেই লাগেন না। তাঁহারা পল্লীগ্রামে থাকিলে তাঁহাদের প্রকৃত পদ-গৌরব তাঁহারা বেশী বুঝিতে পারেন,—কারণ, তাঁহাদের সেই স্থানেই রাজত্ব, সহরে তাঁহারা নামে মাত্র রাজা বা বড় লোক। পল্লীগ্রামে যদি বড় লোকেরা থাকিতেন, তবে পল্লীর অবস্থা আজকাল আর এরূপ খারাপ হইত না।

পূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ে সকলের বাড়ী সংলগ্ন একটা ফুলের বাগান থাকিত। যাঁহাদের মালী রাখিবার শক্তি না থাকিত, তাঁহাদের ছেলেরা সকালে উঠিয়া ফুলগাছের গোড়ায় জল সেঁচিত। সকল ছেলেই বিশেষতঃ ছোট ছোট মেয়েরা ফুল কুড়াইয়া আমোদ পাইত। পুষ্প-সমৃদ্ধির মধ্যে থাকিলে মানুষের মন সরস হয় কি না, এবং ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয় কি না, তাহা আপনারা বুঝিবেন। ফুলের মত সুন্দর দ্রব্য পৃথিবীতে কিছুই নাই; একটি ফুল দেখিলে ভগবানের কারুকার্য্য ও দয়ার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক,—ইহারা নীরবে সেই রস-স্বরূপের আনন্দের কথা কহিয়া যায়। উহাদিগকে লইয়া যাহারা খেলা করে, তাহাদের কাছে হঠাৎ তাহারা হয় ত সেই আনন্দের সংবাদ কহিতে পারে। শিশুর পক্ষে উহারা প্রকৃতির মনোরম শাস্ত্র। শিশু নির্ম্মল, ফুলও নির্ম্মল। শিশু ফুলের যোগ্য ও ফুল শিশুর যোগ্য,—এবং উভয়েই স্বর্গের যোগ্য। ইহাদের একটা সম্বন্ধ থাকিলে তাহা লাভের ও সুখেরই সম্বন্ধ।

ফুলের বাগান

কিন্তু সহরের ছেলেরা হাঁ করিয়া ফেরিওয়ালার নিকট হইতে শোলার ফুল কিনিয়া থাকে। কোন কোন বালক বা যুবককে টব আনিয়া ফুলের চারা লাগাইতে দেখিয়াছি। স্বাভাবিকভাবে যে সকল চারা মাটী হইতে রস পাইয়া স্বর্গের বাতাস ও আলোকের দ্বারা পুষ্ট হয়, তাহাদের সঙ্গে টবের ফুলের গাছের অনেক তফাৎ। মায়ের কোলে ছেলেটিকে যেমন সুন্দর দেখায়, ধাত্রীর কোলে কি সেরূপ কখনও দেখাইতে পারে?

বড় মানুষদের জীবন কতটা কৃত্রিম হইয়া যায়, এই উপলক্ষে তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। আমাদের দেশের কেহ যদি এমন একটা বিদেশে যায়, যেখানে তুলসী কি নিমগাছ জন্মায় না,—তাহা হইলে হয় ত টবে করিয়া উহা তথায় লইয়া গিয়া—উহার প্রতি সে ব্যক্তি আদর দেখাইবে। উহা তাহার জন্মভূমির স্মারক-লিপির মত। উহার বাহিরের কোন সৌন্দর্য্য

থাকুক বা না থাকুক, এ দেশের লোকের ধর্ম্মভাবের ও শৈশব-স্মৃতির সঙ্গে ঐ গাছের এমন একটা যোগ আছে যে, বিদেশে তুলসীর একটি চারা পাইলে সে তাহার দশগুণ বেশী মূল্য দিয়া কিনিবে এবং সেটিকে প্রাণের বস্তু করিয়া তুলিবে। সাহেবেরা শীতপ্রধান দেশে থাকেন, তাঁহাদের দেশের অনেক কচুপাতা বা বেতের বন বা ফুলহীন পাতার গাছ, ঐ রকম কোন কারণে তাঁহাদের প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশের শত শত সুগন্ধি ও ঘর-আলোকরা ফুল থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা চিরাগত সংস্কারের ফলে ঐ সকল শোভা-সুগন্ধি-শূন্য গাছের চারা বেশী পছন্দ করেন। সেগুলি ঘোর বিদেশে তাঁহাদিগকে স্বদেশের কথা মনে করাইয়া দেয়। হিমালয়ের তুষার-শৃঙ্গের কোন স্থানে তাঁহারা সেই চারা পাইলে একটা অসম্ভব বেশী মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন, উহা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

কিন্তু আমরা কি বোকা! আমরা আমাদের গন্ধের খনি, শুভ্রতার নির্ম্মাল্য—বেল জুঁই তুলিয়া ফেলিয়া মোহগ্রস্তের ন্যায় অসম্ভব দাম দিয়া কতকগুলি কচু ও বেত কিনিয়া আনিতেছি, এবং তাহাদের ল্যাটিন নাম শুনাইয়া দর্শককে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি! দর্শকের চক্ষু একান্ত বিকৃত না হইলে, তাহাতে কিছুতেই ভুলিবে না। হে দেশী গোলাপ,—রজনীগন্ধা, জুঁই, বেল ও মালতী—তোমরা শোভার আকর, তোমাদের শোভা ও সুগন্ধি বুঝিবার শক্তিও আমরা হারাইয়াছি। লাল বর্ণের ছিট-যুক্ত বড় বড় কচুর পাতা তোমাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছে; তাহারা কোন্ কুহকে বড় মানুষদের মন ভুলাইল, ও তোমাদিগকে দেশত্যাগী করিতে চলিল, তোমরা ভাবিয়া পাইতেছ না। আমি একদা মফঃস্বলের কোন রাজ-বাড়ীতে যাইয়া দেখিয়াছিলাম—একটা বৃহৎ জায়গা জুড়িয়া ঐ প্রকার কচু, বেত এবং সাবু গাছের মত বড় বড় গাছ রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের এক একটি বড় ল্যাটিন নাম আছে ও তাহাদের আনিবার ব্যয়

ও কষ্ট সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা গৃহ-কর্ত্তারা আমাকে শুনাইলেন। একজন সামান্য প্রজা বলিল, "মহাশয়, এই জায়গায় যেরূপ নেংড়া, ফজলী আমের গাছ ছিল, তাহার তুলনা বাঙ্গালা দেশে নাই, এবং এই টবগুলি যেখানে আছে, সেখানে আগে প্রাতঃকালে বড় বড় গোলাপ ফুটিত ও সন্ধ্যাকালে চাঁপা, রজনীগন্ধা, নাগেশ্বর ও সন্ধ্যা-মালতী ফুটিয়া স্থানটিতে যেন দ্বিতীয় নন্দনবনের সৃষ্টি করিত।" সে প্রজাটি গোপনে যে দুঃখের সহিত এই কথাগুলি বলিল, তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করিল।

মেয়েরা, এই সমস্ত বিষয়ে পুরুষের রুচি বিগড়াইয়া না যায়, তাহা দেখিবেন। ফুলের বাগান আমাদের জীবন-যাত্রার পক্ষে দরকার, উহা নিতান্ত বাজে সামগ্রী নহে। তাহা হইলে ভগবান্ প্রতি-গৃহের কোণে, রাস্তার ধারে এবং পুকুরপাড়ে যথা তথা উহাদিগের জন্য আসন রচনা করিয়া রাখিবেন কেন? উহারা ক্লান্তির অপনোদন করে, মনকে প্রফুল্ল করে, উহাদের গন্ধ ও শোভা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী; গৃহস্থ উহা বাদ দিয়া বাড়ী করিলে তাহা সিন্দুর-শূন্য ললাটের মত অশোভন হইবে। পূর্ব্বে পল্লীতে এমন বাড়ী ছিল না, যাহাতে ফুলের বাগান দেখা না যাইত! এখন সহরের অধিকাংশ বাড়ীতে বিলাতি মাটীর রক বা চাতালগুলি ধরণীর বক্ষে পাথর চাপা দিয়া রাখিয়াছে, ফুলের গাছ তাহা ভেদ করিয়া উঠিবে কিরূপে?

সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য

সুগৃহিণী কি কি করিবেন, তাহার একটা তালিকা করা শক্ত। প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহে ঝাঁট দেওয়া, শিশুদিগের মুখ ধোয়াইয়া দেওয়া, তাহাদিগকে লইয়া ভগবানের নাম করা,—বিছানাপত্র তোলা ইত্যাদি তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে অনেক কাজই তাঁহারা এখনও করিয়া থাকেন। যদি চাকর কি দাসীদের উপর কাজের ভার থাকে, তথাপি গৃহিণী প্রত্যূষে উঠিয়া তাহাদিগকে খাটাইবেন। চাকর কি দাসীর সংখ্যা বেশী থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত থাকিলে ভাল।

আরাধনা

ভগবান্-আরাধনার কথা বলিয়াছি, অল্প কথায় তাঁহাকে গৃহের শুভাশুভ নিবেদন করিবেন;—"এ সংসারে তোমারই ইচ্ছানুসারে খাটিতে আসিয়াছি; হে মালিক, হে প্রভু, আমার কিছুই নাই। গৃহের সকলেই তোমার; আমি সকলই তোমায় নিবেদন করিয়া দিতেছি। আজ যেন সকলে সাধু-পথে চলে, কেহ যেন নিজের সুখ খুঁজিয়া পরকে কষ্ট না দেয়, এই পরিবারের,—সমস্ত সংসারের মঙ্গল হউক, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা পালন করিতে যেন আমার কষ্ট না হয়; তুমি যাহা দিবে, তাহাই তোমার প্রসাদ বলিয়া মাথায় করিয়া লইব, আমি নিজের সুখ খুঁজিব না।" ঠাকুরের নিকটে এইরূপ আরাধনা করিবে, গলবস্ত্র হইয়া যোড়-হাতে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিবে। যদি গৃহে বিগ্রহ থাকেন, সেই গৃহের ধূলি কপালে মাখিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে; যদি বিগ্রহ না থাকেন, তবে জগৎপতি সর্ব্বত্র আছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া

উক্ত ভাবের আরাধনা করিবে। ছেলেরা বলিবেন, "আমাদের আজ সুমতি হউক, আমরা আজ ভাল হইব। ভাল হইবার শক্তি আমাদিগকে দিয়াছ, আমরা কেন মন্দ পথে চলিব? আমরা নিজেরা চলিতে জানি না। হে জগৎপিতা! তুমি আমাদিগকে হাত ধরিয়া সুপথে লইয়া যাও।"

গৃহিনীর প্রধান কর্ত্তব্য ভাঁড়ার রক্ষা; ভাঁড়ারে যদি মাসের সমস্ত জিনিষ থাকে তবে তাহা গুছাইয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক সামগ্রীর উপরই

ভাঁড়ার

যেন ঢাকা থাকে। ঢাকা না থাকিলে ইন্দুর ও আরশোলায় উহা নষ্ট করে এবং বিশ্রী করিয়া ফেলে। অনেক ধুইলেও সেই সকল চাল ডালের দুর্গন্ধ যায় না। ইন্দুরের অত্যাচার বেশী হইলে অনেকে কল পাতিয়া থাকেন, এই ভাবে ইন্দুর মারিতে স্বভাবতঃই কষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সংসারে আমাদের অনেক জীব-জন্তুকেই কষ্ট দিতে হয়। উহা আমাদের অদৃষ্টের ফল, তাহাদেরও অদৃষ্টের ফল, আমাদের না করিয়া উপায় নাই। আরশোলা, ইন্দুর ও মশা লইয়া, কেহই ঘর করিতে পারেন না। তবে যদি কল না পাতিয়া বিড়াল পোষা যায়, তবে কতকটা ভাল; কারণ বিড়ালের উপর ইন্দুরকুলের বিনাশের ভার বিধাতা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু কলের মত তাহারা সমস্ত ইন্দুর মারিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকে না; দুই একটা ইন্দুর মারা পড়িলেই ইন্দুর-পাড়ায় বেশ একটু ভয়ের সঞ্চার হয়। বিড়ালের আবির্ভাবে ইন্দুরগুলি ঘর ছাড়িয়া যায়। আমরা মারিতে চাই না, তাড়াইয়া দিতে চাই।

যে সকল স্থান কতকটা আঁধার, সেই জায়গায় আরশোলারা পরিবার

আরশোলা

লইয়া বাস করিয়া থাকে। তাহারা যদিও দেখিতে বৃহদাকার, তথাপি যোগীরা যেরূপ অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তির দ্বারা দেহ কখনও বা সঙ্কুচিত, কখনও বা প্রসারিত করিতে পারেন, ইহারাও সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র ফাঁক পাইলে নিজের দেহ আশ্চর্য্যরূপ সঙ্কুচিত

করিয়া তাহার মধ্যে ঢোকে এবং আবার শেষে বেশ বড় হইয়া বাহির হয়। ইহাদিগকে তাড়ান বড় শক্ত। এই তাড়ান গেল, আবার দু-ঘণ্টা পরেই কোথা হইতে আসিয়া ইহারা আসর জমাইয়া বসে। ইহাদের বড় বড় গোঁপ ও গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাদিগের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাবও সময় সময় আসা স্বাভাবিক। যাহা হউক, ভাঁড়ার-ঘরে কোনরূপেই ইহাদিগকে স্থান দেওয়া উচিত নহে। অনেক দিন যে সকল জায়গায় ঝাঁট পড়ে না এবং যে সকল গৃহকোণ অনেক সময় গৃহিণীর দৃষ্টি এড়াইয়া থাকে—সেই সকল স্থানে ইহারা বাস করার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লয়। অগ্নির উত্তাপ ইহারা সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং অন্য উপায়ে দূর করিতে না পারিলে, —সেই জ্বলন্ত উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা না করিয়া আর কি করা যাইতে পারে? যদি সেই আগুনে ইহারা সম্পাতীর মত পাখা হারায়, বা মহাবীর হনুমানের মত ইহাদের মুখ দগ্ধ হইয়া যায়, তবে গৃহিণী কি করিবেন! যতটা দয়ার সঙ্গে ইহাদিগকে ঘর ছাড়াইতে পারা যায়, ততটা দয়া দেখান দরকার। যদি দয়ায় না হয়, তবে নির্দ্দয়তা না করিলে উপায় কি? ইহারা ঘর না ছাড়িলে আমরা বুদ্ধদেবের মত জীবের প্রতি দয়া দেখাইবার জন্য ঘর ছাড়িতে পারিব না। আরশোলার বাসস্থানে যদি প্রচুর আলোক প্রবেশের পথ করিবার সুবিধা হয়, তবে উহারা আপনিই পলাইবে—তাহা হইলে উহাদের উপর নির্দ্দয় হওয়ার কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

ভাঁড়ারের জিনিসপত্র যথাসম্ভব রোজই একবার রৌদ্রের সাম্‌নে আনা উচিত। অনেক ঘরে দেখা যায়, ঠাণ্ডা লাগিয়া চা'ল-ডাল খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে খুব ক্ষতি হয়; এবং সেই ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যদি সেই সকল খাদ্যের রান্নার ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাহাতে পীড়া জন্মে।

জিনিস রৌদ্রে আনা

অনেক গৃহস্থ একমাসের উপযোগী সমস্ত সামগ্রী ঘরে আনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, সেগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় অনেক জিনিস নষ্ট হইয়া থাকে। যেখানে এক পোয়া তৈলেই বেশ কাজ চলিতে পারে, সেইখানে আধমণ তৈলের ভাঁড় হাতের কাছে পাইয়া, যিনি তৈল লইয়া যাইবেন, তিনি দেড় পোয়া লইয়া যান, এবং স্বচ্ছন্দ-মনে কতক নষ্ট করিয়া কতক ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রায়ই দেখা যায়, গায়ে তৈল মাথার জন্য যে তৈলের বাটী দেওয়া হয়, তাহাতে কতকটা পড়িয়া থাকে এবং তাহা নষ্ট হইয়া যায়,—সে বাটী যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিল, কাকে ঠোক্‌রাইয়া বাটীটা উন্টাইয়া ফেলিয়া কা কা শব্দে চীৎকার করিয়া চলিয়া গেল। সুবন্দোবস্ত থাকিলে যেরূপ এক মাসের জিনিস-পত্র একত্র কিনিলে দামে সস্তা ও কাজের সুবিধা হয়, ব্যবস্থার অভাব হইলে, জিনিস-পত্রের কেবলই লোক্‌সান হয়, এবং এক মাসের যোগ্য সমস্ত জিনিস তিন সপ্তাহে বা তাহা হইতেও অল্প সময়ে খরচ হইয়া যায়। চিনি ও মিশ্রি সে অবস্থায় দ্বিগুণ লাগে। যেহেতু, শিশুরা আরশোলার মত দরজার ফাঁক পাইলে ভাঁড়ারে প্রবেশ করে ও উক্ত দুই সামগ্রীর ভাঁড় আক্রমণ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় গৃহিণীকে সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত ভাঁড়ারে জিনিসপত্র মাপিয়া দিতে হইবে। চাকরদের যদি ইহা করিতে হয়, তথাপি তিনি উপস্থিত থাকিয়া, কি জিনিস কি পরিমাণে গেল, তাহা স্বয়ং দেখিবেন। ভাঁড়ার-ঘরটা বাড়ীর দুর্গের মত থাকিবে, যখন তখন যে সে সেই দুর্গ আক্রমণ না করে, তাহা দেখা উচিত। সাধারণতঃ দিনে দুইবার উহা খুলিলেই ভাল হয়। যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, যখনই দরকার হইবে, অমনি মাঠাকৃরুণের নিকট চাবী লইয়া ভাঁড়ার খুলিতে পারিব, তবে যে সকল দ্রব্যের আয়ু একমাস নির্দ্ধারণ করিয়া আনা হইয়াছিল, তাহা ১৫ দিনে

মাসিক বন্দোবস্তের দোষ গুণ

নিঃশেষ হইয়া যাইবে; ভাঁড়গুলি শূন্য হইয়া হা হা করিতে থাকিবে। এরূপ বাড়ীতে শীঘ্র অর্থাভাবে হাহাকার শব্দ উঠাও আশ্চর্য্য নহে। কারণ, লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর নৈবেদ্যের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়; তাঁহার পূজা সপ্তাহে একেবারে শেষ হয় না; তিনি নিত্য পূজা চান, ঘরের প্রতিদিনের হিসাব দেখিতে চান; তাহা না হইলে তিনি সে ঘরে তিষ্ঠিবেন না, কারণ, তিনি চঞ্চলা।

রাঁধুনীরা তৈল ও চা'ল-ডাল সর্ব্বদা চুরি করিয়া থাকে। তৈলের দিকেই তাহাদের বেশী লক্ষ্য। এই তৈল লইয়া গেল, তৈল ফুরাইয়াছে বলিয়া আবার আসিয়া বায়না ধরিয়া কতকটা লইয়া গেল, অথচ তৈলের অভাবে যাহা হইবে, তাহা পোড়াইয়া পাতে পরিবেশন করিয়া দিয়া গেল। ইহাদের অনেকের গুপ্ত চুঙ্গী আছে, একটু ফাঁক পাইলেই তাহা ভর্ত্তি করিয়া লইয়া যায়। সুতরাং হাজার অবস্থা ভাল হইলেও গৃহিণী রান্নাঘরের চার্জ্জ্ রাঁধুনীকে বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। অনেক রাঁধুনী, কয়লা অনেকটা জ্বলিয়া গেলে শেষে উপস্থিত হইয়া উনানের ধারে স্বীয় আসনে চাপিয়া বসেন। যে কয়লা তাঁহার বিলম্বে আসার দরুণ নষ্ট হইল, তাহার দাম মাহিনা হইতে দুই একবার কাটিলেই দুরস্ত হইয়া যায়। পরের ক্ষতি যে ক্ষতি, ইহা বুঝাইতে কতকটা নির্ম্মমতা অবলম্বন না করিলে সংসারে অনেকে তাহা বোঝেন না;—ইহার উপায় কি? ভাঁড়ার-ঘরে মাপ করিবার ওজনগুলি থাকা চাই, এবং গৃহিণীর দ্রব্যাদির ওজন-সম্বন্ধে একটা বিশুদ্ধ জ্ঞান থাকিলে ভাল। ভাঁড়ারের জিনিসপত্র একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলা কখনই উচিত নহে। কতকগুলি দ্রব্য সময়ে অসময়ে দরকার হয়। যথা—মিশ্রি, বার্লী, চিনি ইত্যাদি; এগুলি হঠাৎ রাত-দুপুরে দরকার হইতে পারে, এজন্য ভাঁড়ারে ইহার একটা স্থায়ি-

তৈল চুরি

কয়লার দরুণ বেতন কাটা

ওজন

রূপ সঞ্চয় থাকা দরকার, অর্থাৎ এগুলি ফুরাইবার পূর্ব্বেই আবার কিছু কিনিয়া আনা উচিত। হয়ত বেশী রাত্রে কোন অতিথি অভ্যাগত আসিলেন, তাঁহাদের খাওয়ার আয়োজন করিতে হইবে ; এজন্য রোগীর জন্য যেরূপ বার্লী, মিশ্রি ও কাগজি লেবু গৃহস্থের সর্ব্বদা রাখা উচিত, তেমনিই কিছু আলু, ঘি ও ময়দা সর্ব্বদা ভাঁড়ারে প্রস্তুত থাকিলে, অসময়ে আত্মীয়স্বজন আসিলে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতে হয় না। যেখানে গৃহিণীপণা ভাল, সে সকল বাড়ীতে এই সকল জিনিস-পত্র সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। কিছু আমসত্ত্ব ও চাট্‌নি প্রভৃতিও ভাঁড়ারে সর্ব্বদা সঞ্চিত রাখা উচিত। যেখানে গৃহস্থালীর অভাব, সেই সকল ঘরে সর্ব্বদা ঐ জিনিসগুলি আনিয়াও কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারা যায় না। যে পর্য্যন্ত নিঃশেষ না হয়, শিশুরা কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। গৃহিণীর শাসন করার শক্তির অভাবে অথবা মনোযোগের ত্রুটিতে যাহা অসময়ের জন্য তুলিয়া রাখা উচিত, তাহা এইভাবে খরচ হইয়া যায়, প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না। পাণের ভাল মস্‌লাও একসেট্ পোষাকীভাবে তুলিয়া রাখা উচিত। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাড়ীতে আসিলে সেগুলি দরকার হয়, যিনি আসিয়া আধ ঘণ্টা থাকিবেন, তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য বাজারে লোক পাঠাইবার অবকাশ থাকে না। সুতরাং গৃহস্থের নানারূপ প্রয়োজনের জন্য কিছু কিছু জিনিস ছেলেদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া তুলিয়া রাখা বিধেয়। কখনও কখনও কোন আত্মীয় বালক-বালিকা ঘরে আসিলে তাহাদিগকে মিষ্ট দিয়া আদর করিতে হয়। যে গৃহে এজন্য বাজারে ছুটিতে হয়, তদপেক্ষা যে গৃহে এই সকল দ্রব্য কিছু কিছু সঞ্চিত থাকে, তাহা ভাল। দরিদ্র গৃহস্থও কিছু নাড়ু, বড়ি বা মিশ্রি, কিস্‌মিস্ ও বাদাম রাখিতে পারেন। যে সকল গৃহের বন্দোবস্ত ভাল নাই, সে সকল গৃহের শিশুরা ঐরূপ জিনিসের সন্ধান পাওয়া মাত্র তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলে।

সঞ্চয়

অনেক বাড়ীতে কয়টা বাটী, ঘটী ও কয়খানা থালা, রেকাব নিত্য ব্যবহারের জন্ত বাহিরে আছে, তাহার ঠিক খবর কেহ রাখেন না; হয় ত এক সপ্তাহ পরে খোঁজ পড়িল, খোকার দুধ খাবার বড়-বাটীটা কোথায়? চাকরেরা সেগুলি চুরী করার বেশ সুবিধা পায়। কোন কোন বাড়ীতে দেখা যায়, একটা বাটীতে কি রেকাবে কাহাকেও কিছু জল-খাবার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সেই ভুক্তাবশিষ্ট খাগু লইয়া একমাস যাবৎ তক্তাপোষের নীচে কি চৌকির উপর কি যথাতথা পড়িয়া আছে, তাহাদের কোন খোঁজই নাই। কি আছে কি নাই, কি হারাইয়াছে তাহাদের সন্ধান কে রাখে? গৃহিণী শিশুদিগের লইয়া অথবা রান্নার কার্য্যে এরূপ ব্যস্ত যে, তাঁহাকে সে কথা লইয়া কিছু বলিলে তিনি বিরক্ত হন। এই সকল গৃহে যদিও বা লক্ষ্মী আসিয়া থাকেন, তবে প্রায়ই যে তিনি বিরক্তিসহকারে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্থানত্যাগের সঙ্কল্প করেন, তাহা যাঁহাদিগের দেবতাদিগের গতিবিধি দেখিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারাই মাত্র বুঝিতে পারেন।

ঘটী-বাটীর খোঁজ রাখা

যে সকল থালা ঘটী বাটী বাহিরে আছে, তাহাদের একটা ঠিক হিসাব রাখা দরকার এবং রাত্রে আহারান্তে সেগুলি গণিয়া ঠিক আছে কি না দেখিতে হইবে। যদি কোন আগন্তুক ব্যক্তির খাবারের জন্য বা অন্য কোন প্রয়োজনে ঘটী-বাটী বাহির করিতে হয়, তবে প্রয়োজন শেষ হইলে সেই জিনিষ যে যথাস্থানে আবার রাখা হয়। ভৃত্য হয় ত গায়ে মাখাইবার তৈল দিয়া গেল। তৈল মাখা হইলে সেই তৈলের বাটীটি আবার সে যথাস্থানে আনিয়া রাখিবে—তাহাকেই এজন্ত দায়ী করা হইবে এবং এই দায়িত্ব যেন সে বুঝিয়া রাখে। যদি সে ইহার মধ্যে কার্য্যান্তরে যায়, তবে সে অপর কাহার উপর যেন সেই ভার দিয়া যায় এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, সেই কাজ হইয়াছে কি না! ছোট বালক-বালিকারা যদি ঐরূপ

কোন বাটী বা ঘটী প্রয়োজনানুসারে অন্যত্র লইয়া যায়, তবে সেই কাজ হইয়া গেলে জিনিস আবার যথাস্থানে আনিয়া রাখিবে। এই সকল শিক্ষা ছোট কাল হইতে হইলে ভাল। মোট কথা সংসারটিকে তাচ্ছিল্যের হাত হইতে সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করিতে হইবে।

বাড়ীর কাপড় প্রভৃতির সম্বন্ধেও সেইরূপ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। কোন কোন বাড়ীতে দেখা যায়, পূর্ব্বদিন স্নানান্তে কেহ কাপড় ছাড়িয়া গিয়াছেন, আজও তাহা কলতলায় পড়িয়া আছে। কোন শিশুর শিল্কের জামা বায়ুবেগে উড়িয়া উঠানে একটা ড্রেইন কি অপরিষ্কার জায়গায় পড়িয়া পর্য্যায়ক্রমে বৃষ্টি ও রৌদ্র সহ্য করিতেছে, তাহার ফলে সূতাগুলির হাড় পচিয়া জামাটা অকালে ধ্বংস পাইতেছে, কিংবা তাহার শেষ দশাপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই হয়ত কোন পরিচারিকা তাহা সামান্য নেকড়ায় পরিণত করিয়া কর্দ্দম-জলে অভিসিঞ্চনপূর্ব্বক তাহার দ্বারা ঘর মুছিতেছে। কাপড়গুলির প্রতিও একটা দৃষ্টি রাখার দরকার। কোন্ কাপড়গুলি শুকাইতে হইবে, কোন্‌গুলি তুলিয়া রাখিতে হইবে, তাহা যেন ঠিক থাকে। অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে দেখা যায় যে, কাপড় শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে, তাহারা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল, তবু তোলা হইল না; হঠাৎ বৃষ্টি হইয়া গেল, সেগুলি পুনরায় ভিজিল; কিংবা একবার শুকাইবার পরে শীতরাত্রের হিমে ভিজিয়া তাহারা ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত রোগীর ন্যায় একবার শরীরে জ্বালা ও পরক্ষণে শীত বোধ করিতে লাগিল।

বস্ত্রাদি

ধোপা-বাড়ীর কাপড় আসিল, হয় ত সেগুলি স্তূপাকৃতি হইয়া একস্থানে পড়িয়া রহিল। ছেলেরা কর্দ্দমাক্ত হাতে সেগুলি ধরিয়া টানাটানি করিয়া তাহাদের কোন কোনটির উপর আঙ্গুলের ছাপ বসাইয়া দিল; কোনখানা বা তক্তাপোষের নীচে খানিকটা জলের উপর পড়িয়া আর্দ্র হইয়া রহিল। ধোপা-বাড়ীর কাপড় আসিলে তখনই যার যার কাপড় ভাগ

করিয়া তুলিয়া রাখা উচিত। শিশুদের যদি প্রত্যেকের একটি ছোট তোরঙ্গ থাকে, এবং তাহারা যদি নিজ কাপড় যত্নপূর্ব্বক গুছাইয়া রাখার সৎশিক্ষা পায়, তবে ভাল। এ সকল ব্যাপার যে খুব শ্রমসাধ্য, তাহা নহে। প্রথম হইতে শিশুরা যদি নিজ নিজ পুস্তক গুছাইয়া রাখিতে শিখে, নিজেদের কাপড় তুলিয়া রাখিতে পারে,—এমন কি স্নানান্তে নিজের কাপড়খানি শুকাইতে দেয়,—তবে তাহাতে কোন অপমান বা হীনতা নাই। এইরূপে শিশুকাল হইতে চরিত্রের একটা স্বাবলম্বন ও গৃহস্থালীর যোগ্যতা তাহারা লাভ করিতে পারে।

মোট কথা, সংসারকে তাচ্ছিল্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য যাহা কিছু দরকার, গৃহিণী সর্ব্বদা তাহা চিন্তা করিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি গৃহের দাসী নহেন,—গৃহের কর্ত্রী; তিনি শুধু খাটিতে আসেন নাই, তিনি খাটাইবেন ও শিক্ষা দিবেন। গৃহের সমগ্র চিন্তাটি তাঁহার মাথায় খেলিবে, তবেই সেই গৃহের মঙ্গল।

শীতান্তে লেপ তোষক উঠাইয়া রাখিবার ভাল ব্যবস্থা করা উচিত। পাকাঘরে বিমের উপর হুক্ লাগাইয়া অনেকেই তাহা টাঙ্গাইয়া রাখেন, এ ব্যবস্থা ভাল। ইন্দুরের হাত হইতে সেগুলি রক্ষা পায়। কিন্তু অধিক যত্নে ও কার্পণ্যে অনেক সময় গরম জিনিস নষ্ট হয়। অনেকে শাল বনাত, সার্জের চাদর ও বিলাতী কম্বল যত্ন করিয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখেন এবং খুব বিশেষ দরকার হইলে তাহা বাহির করেন, ফলে সেগুলি অনেক সময় পোকায় কাটে।

এই সকল জিনিস সাবধানতার সহিত সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে ভাল থাকে। বিলাতী কম্বল প্রভৃতি অনেক সময় বিছানায় পাতিয়া রাখিলে বেশ থাকে। পোষাকী করিয়া রাখিলে তাহারা সহজে কীটের মুখে পড়ে। শীতের কাপড় যাহা বাক্সে-সিন্দুকে তুলিয়া রাখা হয়, তাহা মাসে মাসে

খুলিয়া রৌদ্রে দেওয়া দরকার এবং পোকা নিবারণের জন্য সেগুলির মধ্যে ন্যাপথালিন্ দিয়া রাখা উচিত।

পিতল-কাঁসার জিনিস যাহা সর্ব্বদা ব্যবহারে না লাগিবে, তাহাও মাসে অন্ততঃ একবার বাহির করিয়া মাজিয়া রাখা দরকার; নতুবা তাহাদের মধ্যে এরূপ সব ময়লা কালো কালো দাগ পড়িবে যে, তাহা ভীমের মত বলবান্ ভৃত্যেরাও জোরের সহিত ঘষিয়া উঠাইতে পারে না। পূজার বাসন-পত্র, ডেগ ও থালাগুলি লইয়া শারদীয় উৎসবের সময় চাকরেরা একরূপ মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে, অথচ এত চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলি খুব ভালরূপ পরিষ্কার হয় না। মাসে একবার মাজা পড়িলে সেগুলিতে ময়লা পড়িতে পারে না, এবং প্রয়োজনের সময় সামান্য চেষ্টাতেই তাহা ঝক্‌ঝকে হয়।

অনেক বাড়ীতে গ্লাস ও ঘটী-বাটী চাকরেরা এরূপ খারাপ-ভাবে মাজিয়া থাকে যে, তাহাতে জল কি খাদ্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আবার এরূপ বাড়ীর অভাব নাই, যেখানে কাঁসার বাটী গ্লাস রূপার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে; যেখানে দাস-দাসী বিশ্রী করিয়া ঐ সকল জিনিস মাজে, সেখানে গৃহিণী নিজেই একটি বাটী গ্লাস মাজিয়া দেখাইবেন, সেগুলি কি ভাবে মাজিতে হইবে।

বাড়ীর উঠানটি যাহাতে পরিষ্কার থাকে, সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক বাড়ীতে ড্রেনের মুখে ভাত-ডাল জমিয়া যায় এবং উহা বন্ধ করিয়া ফেলে।

ড্রেন

চাকরাণী যে জায়গায় বাসন-পত্র মাজে, উদ্‌বৃত্ত ভাত-ডাল ও তরকারী সেইখানেই ফেলে, আলস্যবশতঃ বাহিরে লইয়া যায় না; তাহার ফলে ড্রেনের মুখ বন্ধ হইয়া জল দাঁড়াইয়া যায় এবং গৃহে নানারূপ পীড়ার উৎপত্তি করে। উঠানে কোনরূপ আবর্জ্জনা জমিতে দেওয়া হইবে না। যদি চাকরগণ বলে যে, অন্য সময়ে ফেলিয়া দিবে, তাহা বিশ্বাস না করিয়া তখনই উহা ফেলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা

উচিত। কারণ, ঐরূপ আবর্জ্জনা জমাইবার অভ্যাস হইয়া গেলে, শেষে গৃহটি আবর্জ্জনা হইতে রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

রান্নাঘর যাহাতে খুব পরিষ্কার থাকে, তাহা গৃহিণী দেখিবেন। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা রান্নাকার্য্যে খুব নিপুণা, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই পরিষ্কার থাকার অভ্যাস নাই। পীঁড়ির উপর বসিলেই হয়, তথাপি তাঁহারা ভূঞে বসিবেন; অনেকে আবার স্ত্রীলোকের পীঁড়ার উপর বসাটা অনুচিত মনে করিয়া সেই কুসংস্কারের জন্য বস্ত্রাদি শীঘ্রই ময়লা করিয়া ফেলেন। অনেক স্ত্রীলোক হলুদ বা সরিষা বাটিয়া ও তৈল ঘাঁটিয়া হাত আঁচলে মোছেন। ইহার ফলে পরিধেয় বস্ত্র নানারূপ খাদ্যদ্রব্যের কিছু কিছু নমুনা বুক পাতিয়া লইয়া চিত্র-বিচিত্র হইয়া পড়ে। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহাদের ছেলেদের পরিচ্ছন্নতার ভার কিছুতেই জন্মিতে পারে না। গ্লাসে মাটি আছে, কিংবা তন্মধ্যে জলে পোকা ভাসিতেছে, এগুলিও কেহ কেহ লক্ষ্য করেন না। রাঁধেন বাড়েন, অথচ গায়ে কালীর একটু দাগ নাই, পরিধেয় বস্ত্র ধব্‌ধব্ করিতেছে, এরূপ মেয়েও অনেক আছেন; কলিকাতা-অঞ্চলে তাঁহাদের সংখ্যা বেশী। রাঁধিবার সময় সেমিজ না পরা নিরাপদ; অনেকে আমার এ কথা স্বীকার নাও করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে দুই একটি স্ত্রীলোক রান্না করার সময় সাড়ীতে আগুন লাগিয়া অল্পবয়সে মারা পড়িয়াছেন; সেমিজ পরা না থাকিলে হয় ত তাঁহারা রক্ষা পাইতেন, এই ধারণা আমাদের হইয়াছে।

রান্নাঘর

রান্নায় তাড়াতাড়ি করিলে অনেক সময় রান্না মাটি হয়। আগেকার দিনে স্ত্রীলোকেরা রাঁধিয়া শিশুদিগের কাহাকেও দিয়া তাহা চাখাইয়া লইতেন। এখন সে পাঠ উঠিয়া গিয়াছে। যাহা খাইতে দিতে হইবে, তাহা কিরূপ হইল, এটা আগে পরখ করা মন্দ নয়। হয় ত কোন

তরকারীতে নুন বেশী পড়িয়াছে, বা কোনটীতে তদ্বিপরীত হইয়াছে ; ঝাল বেশী হওয়ায় কোন সামগ্রী অখাদ্য বা স্বাস্থ্যের হানিকর হইয়াছে,—ইহা খাইতে বসিয়া আবিষ্কার করা হইলে গৃহিণী অনেক সময় অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন। এজন্য চাখিয়া দেখার রীতিটা বেশ ছিল। মৃদু জ্বালে ধীরে ধীরে ভাত রাঁধা ভাল হয়, কিন্তু ব্যঞ্জনাদি কড়া জ্বালে সুস্বাদু হয়। (১) তরকারী বেশী সিদ্ধ হইলে খাইতে ভাল হয়। যাঁহারা কলিকাতায় উড়িয়া-বামুনের হাতের রান্না খাইয়াছেন, তাঁহারা ভোজন-দুর্গতির নানারূপ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

উড়ে-বামুনের লবণ-প্রিয়তা

উড়ে-বামুনেরা নুনটা সর্ব্বদাই বেশী দিয়া থাকে। বোধ হয় উড়িষ্যাদেশটা লবণ-সমুদ্রের তীরে অবস্থিত থাকার দরুণ নুনের সঙ্গে ইহাদের আত্মীয়তা বেশী হইয়াছে। আমাদের বাড়ীতে এক উড়ে-বামুন এরূপ লবণ-বিভীষিকা দেখাইয়াছিল যে, এখনও তাহা স্মরণ করিলে তরকারী খাইতে ভয় হয়। নুন মাখাইবার সময় মেয়েরা উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু যাই তাঁহারা একটু অন্যত্র গিয়াছেন, অমনই সে আর কিছু লবণ মাখাইয়া বসিয়া আছে। কতরূপ-ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা এবং জরিমানা সহিয়াও সে লবণসম্বন্ধে কার্পণ্য করিতে স্বীকার পায় নাই। এইজন্য শেষে আইন করা হইল যে, রান্নাঘরে একটুও লবণ থাকিবে না—ব্যঞ্জনাদিতে আমরা খাইবার সময় লবণ মাখাইয়া খাইব। মেক্সিকোর সন্নিহিত কোন রাজ্যের লোকেরা যুদ্ধবিগ্রহের দরুণ অসুবিধা হওয়াতে ৬০ বৎসর লবণ খান নাই, প্রেস্কটের ইতিহাসে পড়া গিয়াছে। আমরা এতদূর সহিষ্ণু হইতে পারি নাই। চাকর-বাকরেরা লবণশূন্য তরকারী খাইয়া এরূপ

---

(১) "যত জ্বালে ভাত নষ্ট।
তত জ্বালে ব্যঞ্জন মিষ্ট।

বিদ্রোহী হইল যে, পাছে তাহারা নিমকহারাম হইয়া পড়ে, আমাদের আশঙ্কা হইল। সে বামুন অনেক অত্যাচার সহিয়াছিল, আর টিকিয়া থাকিতে পারিল না। এই রোগটি কম বেশী উড়ে-বামুনমাত্রেরই আছে।

অনেক সময় অল্প ত্রুটির জন্য প্রচুর আয়োজন-পত্র মাটী হইয়া যায়। গ্রীষ্মকাল, হয় ত মাংসাদি রান্না হইয়াছে একটুকু টক হয় নাই,—সুতরাং ভাল খাইয়াও লোকেরা তৃপ্তি পাইলেন না। গৃহিনী যে কালে যা দরকার—তাহা বুঝিয়া রান্না চড়াইবেন।

রান্নার বিবেচনা

বেশী বৃষ্টি হইতেছে, খিচুড়ী ও ভাজা দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়; বড় খরা, তখনই দই ও টকের ব্যবস্থা চাই; সকল বিষয়ে না বলিয়া দিলেও গৃহিনী বাড়ীর লোকের মেজাজ ও স্বাস্থ্য বুঝিয়া উপযুক্ত আয়োজন করিবেন। পরিবেশনকালে হাতা ও চাম্‌চা ব্যবহার করিবেন। চা'ল-ডাল খুব ভাল ধুইয়া তবে উনানের উপর বসাইবেন। অনেক সময় খুব ভাল চা'ল ধোয়ার দোষে মলিন দেখায়, একটু যত্ন করিয়া ধুইলে তাহা ধব্‌ধবে যুঁইফুলের মত হয়। সামান্য যত্নের অভাবে ভাত মাটী হয়।

পরিবেশনকালে কে কতটা খাইতে পারেন, তাহা বুঝিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ রসুয়ে-বামুন এ বিষয়ে নিতান্ত অসাবধান। মনিবের জিনিষ নষ্ট হইলে তাহার কি? বারে বারে ভাত-ডাল দেওয়ার কষ্ট যদি স্বীকার না করিলে চলে, তবে কেন সে তাহা করিতে যাইবে? স্তূপাকৃতি একরাশ ভাত হয়ত

পরিবেশন

একটা বালকের পাতে ফেলিয়া গেল। বালক তাহার সিকি পরিমাণ খাইয়া, আর এক সিকি পরিমাণ ভূঞে ছিটাইয়া ফেলিয়া, বাকী অর্দ্ধেক ভাত পাতে ফেলিয়া গেল। ঝি অবিলম্বে আসিয়া সে জায়গা পরিষ্কার করিয়া পরিত্যক্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিল। যদি দৈবাৎ কোন বাড়ীর লোক জিজ্ঞাসা করেন, 'ঠাকুর, এই একটা ছেলেকে এতগুলি ভাত

একেবারে দিয়া সেগুলি নষ্ট করিলে কেন? ঠাকুর হয়ত উত্তরে বলিল, 'অল্প ভাত দিলে খোকাবাবু রাগ করিয়া খাইতে বসেন না।' বলা বাহুল্য, এই সকল ওজুহাৎ এবং এইভাবে জিনিস নষ্ট করা লক্ষ্মীঠাকুরাণীকে গলাধাক্কা মারিয়া তাড়াইয়া দিতে যাওয়া মাত্র। গৃহস্থের পক্ষে এইভাবে জিনিষ নষ্ট হওয়ার মত সর্ব্বনেশে ব্যাপার আর নাই। গৃহিণী ঠিক ওজনমত সকলের পাতে জিনিস পড়িতেছে কি না,—বারে বারে দেওয়ার পরিশ্রম এড়াইবার জন্য একেবারে অতিরিক্ত জিনিসের পরিবেশন হইতেছে কি না,—সে দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। দ্রব্যসামগ্রী নষ্ট না হয়,—ইহাই গৃহিণীপণার প্রথম ও প্রধান সূত্র।

গৃহস্থের গৃহে দরিদ্রের জন্য একটা দরজা খোলা রাখা উচিত; অতিরিক্ত ন্যায়-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া সে দরজাটা একেবারে বন্ধ করা উচিত নহে। একটা লোক হরিনাম গাইয়া গেল,—"তোর বাড়ী কোথায়—শরীর বেশ পুষ্ট, বাপু, খাটিয়া খাও না কেন?" ইত্যাদি প্রশ্ন দ্বারা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। এ দেশের

ভিখারী

লোকেরা হরিনামকীর্ত্তনটা অনর্থক কুড়ে লোকের কাজ মনে করেন না। প্রাতে উঠিয়া ভঁয়রো রাগে আগেকার দিনে বৈষ্ণবেরা যে টহল দিয়া যাইত, তাহাতে ঘুম ভাঙ্গিবার পরেই লোকের মনে কি সরস ধর্ম্ম-ভাবের উদয় হইত! রাজারা বন্দী রাখিয়া যে আনন্দ পাইতেন, ধনী ব্যক্তিরা প্রাতঃকালে ও প্রদোষে নহবতের ব্যবস্থা করিয়া যে আনন্দলাভ করেন, সমাজের দরিদ্র ব্যক্তিরাও এক মুঠো চা'ল দিয়া বৈষ্ণব ভিখারীর গানে তদপেক্ষা উচ্চাঙ্গের সুখ ও শিক্ষা পাইতে পারেন। সংসারে ত লোকেরা দিনরাত্র লাটীমের মত ঘুরিতেছে,—সারাদিন যন্ত্রের মত খাটাই আমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু শুধু এই কি আমাদের কর্ত্তব্য? আর কি কিছুই নাই? আমরা যাহা ভুলিয়া গিয়াছি, যিনি

প্রাণের প্রাণ ও রাজার রাজা—যাঁহাকে ভুলিয়া দিন-রাত কষ্ট পাইতেছি, তাঁহার কথা প্রভাতে বা দিনান্তে যদি কেহ স্মরণ করাইয়া দেয়, তবে কি সে আমাদের উপকারী নয়? এই বৈষ্ণবের দল সমস্ত সমাজে একটা সরস ভক্তির ভাব জাগাইয়া রাখে, ইহারা কি দরকারী নহে? সমাজ এককালে এই কীর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। যাহাকে যে ভালবাসে, তাহার সম্বন্ধে সে কথা কহিতে ও কথা শুনিতে ভালবাসে। পূর্ব্বে সমাজ ভগবান্‌কে ভালবাসিতেন, সুতরাং এই সকল ভিখারী ভিক্ষা করিয়া লোককে তাঁহারই নাম ও গুণগান শুনাইয়া যাইত। ইহাদিগকে এক-মুঠো ভিক্ষা দিতে যাইয়া ইহাদের শারীরিক বল পরীক্ষা ও কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে বড় বড় উপদেশ দেওয়া পণ্ড-শ্রম মাত্র।

শারদীয় উৎসবে ভিখারীর দল আগমনী গান করিয়া থাকে—তাহা এত করুণরসপূর্ণ ও তাহা পারিবারিক স্নেহ ও ত্যাগজনিত দুঃখ ও আনন্দ এমন সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেয় এবং ধর্ম্ম-ভাবগুলি এমন উজ্জ্বল করে যে, আমরা শৈশবে আত্মহারা হইয়া উহা শুনিয়াছি এবং শুনিতে শুনিতে কত কাঁদিয়াছি। যাহা বাড়ীর খুব নিকটে পাওয়া যায়—তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, এবং তাহা বুঝিতে ব্যাকরণ মুখস্থ করিতে হয় না বলিয়া সেগুলি ছোট বা অনাদরের জিনিস নহে। দৈব সহায় থাকিলে যদিও বণিক্ পৃথিবী-ব্যাপক কারবারে লাভ পাইল না, সে হয়ত গৃহের কোণে কাচ-খণ্ডের মত যাহা পড়িয়াছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, সে একখানি হীরক। আমাদের এই ভাবে অনেক হীরক আবিষ্কার করিবার সম্ভাবনা আছে।

অন্ধ-আতুরের প্রতি দয়া রাখা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। যাহারা ভগবানের বিধি পালন করে নাই বলিয়া দণ্ডিত হইয়াছে,—তাহাদিগের প্রতি আমাদের বিরূপ হওয়া উচিত নহে। কারণ, আমরাও ত পলে পলে সেই বিধি

অমান্য করিয়া আসিতেছি। কোন্ মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রহার আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে, কে জানে? সুতরাং দুঃখী ব্যক্তিরা আমাদের সমবেদনার পাত্র। তাহাদের

অন্ধ-আতুরের প্রতি দয়া

অনেক দোষ আছে,—কিন্তু যখন তাহারা দুঃখে পড়িয়াছে, তখন এমন একটা জায়গায় আসিয়াছে, যাহাতে তাহাদের পূর্ব্ব অপরাধের আলোচনা অনাবশ্যক। আমাদের হৃদয়ে ভগবান্ দয়া বলিয়া যে সামগ্রী দিয়াছেন, তাহা লোকের চক্ষের জল দেখিলে আপনি জাগিয়া উঠে, তাহা বিচার করিতে চায় না। ভগবানের অসীম দয়া হইতে কি কেহ বঞ্চিত? ছোট বড় বলিয়া কি তিনি তাহা দিতে বিচার করেন? তাঁহার সূর্য্যালোক, তাঁহার চন্দ্রকিরণ, তাঁহার সুশীতল জল, তাঁহার মুক্ত বায়ু,—দীন-দরিদ্র ও রাজা-মহারাজা, পাপী ও ধার্ম্মিক এক ভাবেই পাইতেছে। একটা কীটের সম্মুখেও তিনি বিশাল সৌর-জগতের সমস্ত আলো ধরিয়া রাখিয়াছেন, সমস্ত আকাশের মুক্ত বায়ুর মধ্যে তাহার জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি যাহাকে কষ্ট দিতেছেন, তাহাকে আমরা সাহায্য করি কি না, তিনি চক্ষের এক কোণে তাহার সন্ধান রাখিতেছেন। মাতা শিশুকে প্রহার করেন, কিন্তু আড়-চক্ষে চাহিয়া দেখেন, কোন্ আত্মীয় আসিয়া তাহাকে কোলে করিতেছেন ও আদর করিয়া তাহার ব্যথার স্থলে হাত বুলাইতেছেন। ভগবান্‌ও কষ্ট দিয়া আড়-চক্ষে চাহিয়া দেখেন, কে তাঁহা কর্ত্তৃক দণ্ডিত তাঁহার সন্তানকে মাটী ঝাড়িয়া কোলে লইল ও আদর করিল। কারণ, তাঁহার শাস্তি ভালবাসার শাস্তি, উহা নির্ম্মমের আঘাত নহে। তাহা না হইলে শিশু যেরূপ মায়ের হাতে মা'র খাইয়া 'মা' 'মা' বলিয়াই প্রহার-কর্ত্রীকেই জড়াইয়া ধরে, আমরা কি তাঁহার হাতে দুঃখ পাইয়া কাঁদিয়া তাঁহারই শরণ লই না? কাহারও এরূপ অভ্যাস আছে যে, কেহ বিপদে বা দুঃখে পড়িলে তাহা আলোচনা করিয়া বলেন, "উহার

ওরূপ না হইলে আর কাহার হইবে? ও লোকটা এই পাপ করিয়াছে।” ব্যথিত ব্যক্তির পূর্ব্বদোষ আবৃত্তি করিয়া তাহাকে আরও ব্যথা দেওয়া উচিত নহে। দুঃখী ব্যক্তির প্রতি যদি নির্ম্মম হইলাম, তবে দয়া দেখাইব কাহাকে? ছিদ্রান্বেষী হওয়া উচিত নহে, কারণ, আমাদেরও যে শত ছিদ্র আছে।

কোন কোন গৃহিণী চাবী কোথায় রাখেন, কাপড়খানি কি জামাটা, বাটিটা বা ঘটিটা কোথায় রাখিয়াছেন, তাহা খুঁজিয়া খুঁজিয়া একবারে হয়রান্ হন। এক জন বড় লোকের জীবন-চরিতে পাঠ করিয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছিলেন,—তাঁহার জীবনের অন্ততঃ একষষ্ঠাংশ হারাণ-জিনিস খুঁজিতে গিয়াছে। এমন দিন যায় নাই, যে দিন তিনি চাবীটা কি নোটবুকখানি খুঁজিতে ২।৩ ঘণ্টা ব্যয় করেন নাই। এইরূপ পণ্ডশ্রম ও দুশ্চিন্তা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই ভোগ করিয়াছেন। শৃঙ্খলার সহিত কাজ না করিলেই এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সাধারণতঃ চাবী খোঁজা ব্যাপারটা লইয়াই অনেকে কষ্ট পাইয়া থাকেন। অনেক গৃহিণী অঞ্চলে চাবী বাঁধিয়া রাখেন, এই রীতি মন্দ নহে। কিন্তু যদি প্রত্যেক জিনিস রাখিবার ঠিক্ ঠিক্ একটা জায়গা থাকে,—যথা এই স্থানে জামা-কাপড় রাখিব, এখানে ঘটী-বাটী রাখিব, এইখানে কাগজপত্র রাখিব, এইখানে চাবী রাখিব, তাহা হইলে আর খোজাখুঁজি করিতে হয় না। অনেকের বাক্স সিন্দুকের মধ্যেও এরূপ বন্দোবস্তের অভাব যে, একখানি কাপড় কি এক জোড়া মোজা খুঁজিতে অতল সমুদ্রের মত বড় বাক্স বা সিন্দুকের সমস্তটা আলোড়ন করিতে হয়। কাজ করিবার শৃঙ্খলা থাকিলে অনেক কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও বৃথা পণ্ড-শ্রমের হাত হইতে বাঁচা যায়।

হারাণ জিনিস খোঁজা

গৃহিণী আয়-ব্যয়ের যে হিসাব রাখিবেন, তাহা মাসের পর মাসে

মিলাইয়া ও চিন্তা করিয়া দেখিবেন ; হিসাব লিখিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না। কোন্ মাসে মোট কত খরচ হইয়াছে, এবং বাজার-খরচ উপরি খরচ, চাকরদের বেতন বাবদ খরচ, ডাক্তারের খরচ, দুধের খরচ, ধোপার খরচ, ট্রামভাড়ার খরচ, ছেলেদের স্কুলের মাহিয়ানা, গৃহ-শিক্ষকের বেতন এবং পুস্তক ও খাতা পেন্সিল প্রভৃতি কিনিবার খরচ, কাপড় কিনিবার খরচ, এই সকল প্রত্যেক বিষয়ে মাসে মাসে মোট কত খরচ হইয়াছে, অবসর থাকিলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেকটির মোট হিসাব তিনি লিখিয়া রাখিবেন, এবং এই ভাবের মাসিক মোট খরচগুলি সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করিয়া দেখিবেন—তাহাদের কোন কোনটিতে কিছু অতিরিক্ত খরচ হইয়াছে কি না, এবং কোন কোন বিষয়ে খরচ কমান যায় কি না। যাঁহাদের সুগৃহিণী বলিয়া নাম আছে, তাঁহাদের খরচপত্র কিরূপ হয়, তৎসম্বন্ধে তিনি সন্ধান লইবেন, এবং নিজে গৃহস্থালীর কোন উন্নতি করা যায় কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

খরচের হিসাব

আমি এক ভদ্রপরিবারের বিষয় জানি, তাঁহাদের ঘরে অনেকগুলি শিশুসন্তান। তাঁহাদের জন্য সহরে দুধ কিনিতে অনেক টাকা লাগে, তাহা সেই পরিবার বহন করিতে পারেন না ; সুতরাং শুধু ভাল-ডাল খাইয়া তাঁহাদের থাকিতে হইত। গৃহিণী বুদ্ধিমতী, তিনি একসের দুধের বন্দোবস্ত করিলেন। একসের দুধে ১০।১৫টি লোকের কি করিয়া হইতে পারে ? কিন্তু তিনি সেই দুধের সঙ্গে প্রচুর বার্লি মিশাইয়া ও কিছু চিনি দিয়া এক এক বাটী ক্ষীর প্রস্তুত করিলেন ও তাহাই এক একটি ছেলেকে খাইতে দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফল মন্দ হয় নাই। গৃহস্থ এ কথাও বলিতেন, কলিকাতার গোয়ালার দুধ ভাল নহে, খানিকটা বার্লি মিশাইয়া জ্বাল দিলে দুধের দোষ

দুধবার্লি

কাটিয়া যায়। তাঁহার বাড়ীর ছেলেদের ব্যারাম-স্যারাম আমরা বড় একটা দেখি নাই। তাহারা বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট।

অনেক মধ্যবিত্ত বাড়ীতে সাধারণ অবস্থার লোকের একটি ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইলে ৫-১০ টাকার মধ্যে খরচ পড়ে। পূর্ব্ববঙ্গের ভদ্র-গৃহস্থেরা ইহার কমে কিছুতেই কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। কারণ, সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যাহা খান বাড়ীর সকলেই কম-বেশী তাহার ভাগ পান। কিন্তু কলিকাতা-বাসীরা সেই দশ টাকার স্থলে অনেক সময় এক টাকাতেই নিমন্ত্রণ-ব্যাপারটা নির্ব্বাহ করেন। শুধু সেই ভদ্রলোকটি যাহা খাইবেন,—তাহাই রান্না হয়, বাড়ীর ছেলেরা হিন্দুদেবতার মত দৃষ্টিভোগ করিয়াই নিরস্ত হন। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা আমি ঠিক্ বলিতে পারি না। যেখানে আয় বেশী নহে, অথচ আত্মীয়তা-বান্ধবতা রক্ষা করিতে হয়, সেইখানে এই ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট। সকল বিষয়ে যে, বাড়ীতে একটা উৎসবের সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা নহে। যেখানে অবস্থা ভাল, সেখানে ঐরূপ খরচ কর আনন্দের বিষয় বটে; গরীব মধ্যবিত্ত লোকদের সংযত হইয়া চলা উচিত। বাড়ীর ছেলেদের পক্ষেও ইহাতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। তাহারা সংসারের অবস্থা বুঝিয়া, যাহাতে সংযম শিক্ষা করে,—তাহাই দেখা উচিত।

নিমন্ত্রণে বেশী খরচ

দাস-দাসীর প্রতি ব্যবহার

দাস-দাসীরা গৃহস্থালী-রথের চক্র-স্বরূপ, এই চাকা যাহাতে ঠিক্‌মত চলে, গৃহিণীর তাহা দেখিতে হইবে।

পূর্ব্বকালে অনেক গৃহিণী চাকর-বাকরকে নিজের ছেলের মত দেখিতেন,—তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার সর্ব্বদা তত্ত্ব করিতেন, বাড়ী-ঘরে কে কেমন আছে, তাহার খোঁজ লইতেন; চাকরদের অনেক আবদার বরদাস্ত করিতেন,—তাহার ফলে কোন চাকর কি চাকরাণী যে বাড়ীতে একবার ঢুকিত, সেই বাড়ীতেই আজীবন থাকিয়া যাইত। এ কাজ আমরা করিব না, এই ভাবের বিতর্ক বা জটলা তাহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যাইত না। তাহারা যে সকলেই সত্যযুগের সোনার মানুষ ছিল, তাহা নহে। তাহাদের মধ্যেও ভূতের মত একগুঁয়ে,—কুমীরের মত আলসে লোকের অভাব ছিল না। হাজার গালি দিলেও কথা নাই,—তবু ইচ্ছা না হইলে কাজ করিবে না, মধ্যে মধ্যে রাগিয়া উঠিয়া এরূপ চীৎকার আরম্ভ করিত যে, বাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হইত,—এই রকম আমরা অনেক দাস-দাসী দেখিয়াছি। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও মনিবের বাটীতে তাহারা স্নেহের বন্ধনে বাঁধা ছিল, সে বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে পারিত না। এই স্নেহের জন্য সহস্র দোষ সত্ত্বেও সে যখন খাটিত বা কোন কাজে লাগিত, তখন প্রাণপণে খাটিত। মনিবের জিনিসপত্র নষ্ট হইলে তাহাদের বুকে লাগিত, ছেলেদিগকে তাহারা অনেক সময় জনক-জননীর স্নেহে লালন-পালন করিত। বাড়ীর ছেলেরাও তাহাদিগকে নাম ধরিয়া

আগেকার দিনের দাস-দাসী

ডাকিত না; নামের সঙ্গে 'দাদা' 'কাকা' প্রভৃতি আত্মীয়তা-সূচক উপাধি জুড়িয়া দিত। মোট কথা, তখন তাহারা গৃহস্থের বাড়ীর অঙ্গীয় ছিল, তাহারা কখনও মনে করিত না যে, তাহারা পর। কর্ত্তা বা কর্ত্রী বাড়ীতে না থাকিলে তাহারা বাড়ীর কার্য্য-কলাপ-সম্বন্ধে এমনই দায়িত্বপূর্ণ এক একটা কাজ করিয়া বসিত যে, এখনকার নিকট-আত্মীয়েরাও জিজ্ঞাসা না করিয়া সেইরূপ করিতে সাহসী হন না। তাহার জন্য যদি মাঝে মাঝে তাহাদের গালিও শুনিতে হইত, তবে "বৃক্ষ যথা বৃষ্টিধারা মাথা পাতি লয়"—এই ভাবে তাহারা সকল অত্যাচার-অবিচার সহিয়া লইত।

কিন্তু এখনকার দাস-দাসীরা আমাদের বেতন খাইতেছে ও আমরা যাহা বলিব, তাহাই করিতে আইনমত তাহারা বাধ্য, এ ভাবটি কিছুতেই আমরা ভুলিতে পারি না। আমাদের সঙ্গে তাহাদের আর কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা মনিব, তাহারা ভৃত্য। সহরের অনেক বড় লোকের বাড়ীতে তাহাদের নামের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূচক শব্দ যোগ দেওয়া দূরের কথা, তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিলে যে ঘনিষ্ঠতা হইবার সম্ভব, সেটুকু সহ্য না করিয়া, তাঁহারা চাকরকে ডাকেন, "বেয়ারা।" এই ব্যাপারে যে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা আছে, তাহা সেই সকল বাড়ীর চাকরেরা কেবল অপর্য্যাপ্ত চুরির লোভেই সহ্য করিয়া থাকে। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা দাস-দাসীকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন, তাহা হইলে তাহাদের দেহে দশগুণ বল বৃদ্ধি পাইবে ও তাহারা কাজ করিতে আনন্দ বোধ করিবে। তাঁহারা যখন 'বেয়ারা' ডাক আবৃত্তি করেন,—তখন তাহারা সর্ব্বপ্রকারে সংসারের বাহিরে আছে, ইহা মনে করিয়া কেবল শীকারান্বেষী বিড়ালের মত ছোঁ মারিয়া থাকে—কি ভাবে মালিকের সমস্ত দ্রব্য হইতেই কিছু ভাগ চুরি করিবে।

এখনকার দাস-দাসী

এদিকে অন্যান্য কারণেও দাস-দাসীদের সেরূপ আনুগত্য করার পক্ষে

ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এখন ছোট লোকদের মধ্যে আত্ম-সম্মানের জ্ঞান হইয়াছে, ভদ্র-গৃহস্থের রোজগারের পথ যতই বন্ধ হইতেছে, মিল ও বড় বড় দোকানপাট ও সহরগুলির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে তাহারা বেশী আয়ের পথ পাইতেছে। তাহার পর জাতিভেদ নূতন ভাবে আবার জমিয়া উঠিতেছে, শূদ্র ক্ষত্রিয় হইতেছেন,—কৈবর্ত্ত বৈশ্য হইতেছেন, নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণ হইতেছে, সুতরাং সমাজে আর কেহ শূদ্র থাকিতে প্রস্তুত নহে।

যে সকল শক্তি-প্রভাবে সমাজের উপর এই সকল পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার উপর আমাদের আর হাত কি ? তবে সুগৃহিণীগণের বাড়ীর চাকর-বাকরের উপর একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহাই দেখাইয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

সহরে আজকাল চাকরদের প্রধান কাজ বাজার করা। এই কাজে তাহাদের বেশ দুপয়সা হইয়া থাকে, সুতরাং একবারের স্থানে দশবার বাজারে ঘুরিতেও তাহারা আপত্তি করে না। বাজারে জিনিসপত্রের মোটামোটি একটা দর বাড়ীতে জানা থাকা উচিত।

বাজার

যদি বাড়ীর লোক কেহ চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাজারে যান, তবে ভাল ; যদি সেরূপ সুবিধা না থাকে, তবে বাজারে কোন্ জিনিসের কি দর, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কাহারও সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন যাইয়াও জানিয়া আসা উচিত। চাকরকে শুধু সন্দেহ করিয়া এ বিষয়ে গালি দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে সে রাগিয়া যাইবে ; হয় ত সন্দেহও ভুল হইতে পারে। এই জন্য যদি তাহার চক্ষের সম্মুখে দেখান যায়, সে যে দরে জিনিস আনিয়াছে, তাহা হইতে অল্প দরে তাহা পাওয়া যায়—তবে আর তাহার কথা কহিবার উপায় থাকে না। বাড়ীতে মাছ প্রভৃতি যদি মাঝে মাঝে ওজন করিয়া লওয়া হয়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঠিক আনিয়াছে কি না। রোজই দাঁড়িপাল্লা হাতে লইয়া বাজারের জিনিসপত্র

মাপিয়া লওয়ার দরকার নাই। কিন্তু দুই এক সপ্তাহ পর একদিন সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইলে, মাপিয়া লইলে চাকর সাবধান হইয়া যাইবে। শুধু সন্দেহের দরুণ 'তুই চুরি করিয়াছিস্' বলিয়া তর্জ্জন না করিয়া ওজন কিংবা দামের একটা চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করিয়া কোন গালাগালি না করিলেও তাহার সংশোধন হইবে। গৃহিণী বাজার-সম্বন্ধে সর্ব্বদা নিজেকে অভিজ্ঞ রাখিবেন। আমি এমন দেখিয়াছি, পাশের বাড়ীতে চুড়ীওয়ালী যে দরে চুড়ী বিক্রয় করিয়া গেল, তাহার ঠিক দ্বিগুণ দরে অপর বাড়ীর মেয়েরা তাহা ক্রয় করিলেন। মেয়েরা যদি এ বিষয়ে ইচ্ছা করেন, তবে নানা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জিনিসের দর জানিতে পারেন। কোন্ কোন্ বাজারে কোন্ জিনিস সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়, তাহাও গৃহিণীর এই ভাবে জানা উচিত। বাজারে উৎকৃষ্ট ঘি বলিয়া যে চর্ব্বি অগ্নি-মূল্যে খরিদ করা হয়,—তাহা হইতে মাখন-মারা ঘিএর দামের বেশী তফাৎ নাই,—হগ্ সাহেবের বাজার হইতে ভাল মাখন আনিয়া ঘি করিলে তাহা বাজারের ঘি হইতে ঢের উপাদেয় হয়, এবং দরের বেশী তফাৎ হয় না, ইহা আমরা নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

চাকরেরা অনেক সময় সস্তায় কিনিবার লোভে বাজারের হাত-বাছা তরকারী লইয়া আসে, এই জন্য বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষের কাহারও মধ্যে মধ্যে বাজারে যাইয়া কি ভাবের জিনিস বাজারে পাওয়া যায়, তাহার নমুনা বাড়ীতে আনিয়া দেখান উচিত। নতুবা উৎকৃষ্ট জিনিষ যে দরে পাওয়া যায়, সেই দর দিয়া বাজারের অধম জিনিষ খাইতে হইবে। এ বিষয়ে কর্ত্তারা উদাসীন থাকিলেও মেয়েরা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে জানাইলে, তাঁহারা একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবেন না।

চাকর-চাকরাণীদিগকে শুধু সন্দেহ করিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করা উচিত নহে, তাহাতে তাহাদের মন ভাঙ্গিয়া যায়,—কারণ, কোন কোন সময়ে

হয় ত সন্দেহ অমূলক হয়; ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বরং মুখে গালাগালি দেওয়া ভাল, কারণ, তাহারা তাহাদের নিজেদের পক্ষের দু-একটা উত্তর দিতে পারে। কিন্তু বিরক্ত বা ক্ষতির কারণ হইলেও তাহাদের অসাক্ষাতে এ বিষয়ে জটলা করা একেবারেই উচিত নহে। অনেক পরিবারে প্রকাশ্যভাবে কোন গালাগালি দেওয়া হয় না,—কিন্তু দাস-দাসীর কাজ লইয়া ঘরের মধ্যে সর্ব্বদা আলোচনা করা হয়। অনেক বাড়ীতে বালক-বালিকারা এইভাবে এরূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় পায় যে, সর্ব্বদাই "মা, ঐ চাকরটা এই করিতেছে" "ঐ তুমি আদা আনিতে পয়সা দিয়াছ, সে ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছে," "মা, কলসীটা খালি পড়িয়া আছে, আমি কল হইতে জল আনিতে বলিলাম, সে কিছুতেই আনিল না", "মা, ঐ দেখ খোকাকে রাখিতে দিয়াছ, সে এমন জোরে হাত ধরিয়া টানিতেছে যে, তাহার হাতে ব্যথা লাগিয়াছে," এইভাবে বালক-বালিকারা মায়ের কানে চাকর-বাকরের সম্বন্ধে নানা কথা লাগাইতেছে; শুনিয়া রাগে তাঁহার কপোলদেশ ক্রমশঃই আরক্ত হইয়া উঠিতেছে; চাকরকে কিছু না বলিয়া তিনি কর্ত্তৃপক্ষের কাহাকেও কিছু বলিলেন, ফলে সেই ব্যক্তি বিচার না করিয়া চাকরকে হঠাৎ এক ঘুষি লাগাইয়া দিলেন। বালক-বালিকারা যখন দেখিল, তাহাদের কথায় এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, তখন তাহারা যেন রণজয় করিয়াছে, এরূপ উল্লাস বোধ করিতে লাগিল; এবং লাগানি-পোড়ানির কার্য্যে আরও ভাল করিয়া দীক্ষিত হইল। এই কুশিক্ষায় ছেলেরা এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, শেষে বড় হইয়া তাহারা গৃহস্থের ঘর ভাঙ্গায়। এই কুশিক্ষা হইতে জননী শিশুদিগকে রক্ষা করিবেন; চাকর-বাকর সম্বন্ধে কোন আলোচনা তাহারা যেন না করে,—শিশুকাল হইতে তাহাদিগকে এ বিষয়ে সতর্ক রাখিবেন। চাকরদিগকে যাহা বলিতে হয়, তাহা নিজেরা বলিবেন। যদি সত্য-সত্যই

অসাক্ষাতে জটলা

তাহারা অসঙ্গত কাজ করে, তবে গালি খাইয়া তাহারা বিরক্ত হইবে না। তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলার কোন দরকার নাই; কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে যদি সর্ব্বদা তাহাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হইতে থাকে, তবে গালি না খাইলেও তাহারা আর সে সংসারে তিষ্ঠিতে পারে না। কারণ, সমবেদনা বা প্রীতির চিহ্ন যেখানে নাই, সে স্থান মরুভূমির ন্যায় অসহ্য।

উহারা সামান্য মানুষ

কেহ কেহ মনে করেন যে, দাসগণ ঠিক ঘড়ীর কাঁটার মত নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধ্য,—তাহারা বাজারে যুধিষ্ঠির এবং সর্ব্ববিষয়ে দ্রোণাচার্য্য বা সব্যসাচীর মত দক্ষ হইবে। পাণ হইতে চূণ খসিলেই তাঁহাদের আদর্শ ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাঁহাদের রাগের সীমা থাকে না। ভৃত্যেরা যদি এত গুণধর এবং চাকরাণীরা যদি এত গুণধারিণী হইবে, তবে তিন-চার টাকা মাহিনার জন্য তাহারা পরের দাসত্ব করিবে কেন? বরং জানিতে হইবে, ইহাদের অনেক দোষ আছে; ইহাদের রাগ ও বিরক্তি-বোধ আমাদেরই মত; কিংবা আমাদের অপেক্ষা বেশী; কারণ, তাহারা শিক্ষিত নহে। যখন পরিশ্রম করিতে আসিয়াছে ও ক্ষুধায় কাতর, তখন উহাদের যথার্থ দোষের উল্লেখ করিয়া গালি দিলেও উহারা চটিয়া যাইতে পারে, এবং ক্ষুধার সময় যদি খাওয়ার দ্রব্যাদি কম পড়ে, তবে তাহাদেরও পেটে ক্ষুধা থাকিয়া যায় ও তজ্জন্য মেজাজ তিরিক্‌খী হইতে পারে। তাহারা হয় ত বাজারে যাইয়া কোন চেনা-লোকের সঙ্গে আলাপ করার দরুণ বাড়ী ফিরিতে দশ মিনিট্ দেরি করিতে পারে, এবং ইচ্ছা না হইলে শরীর-অসুখের ছুতো ধরিয়া এক ঘণ্টা কাল ঘুমাইয়া লইতে পারে; ইহা ছাড়া যাত্রা শুনিতে যাইয়া, সারারাত জাগরণের ফলে হয় ত সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে কিছু দেরী হইতে পারে, এবং হঠাৎ শুকনো কাপড় তুলতে যাইয়া হেঁচ্‌কা টানে তাহার দু-একটা জায়গা ছিঁড়িয়াও ফেলিতে পারে; কিন্তু এই সকল কারণেই যে তাহারা

একেবারে পরিত্যাজ্য ও ভয়ানক গালির পাত্র, তাহা নহে। সংসারে থাকিতে হইলে অনেক ক্ষতি ও রাগের কারণ সহিয়া থাকিতে হইবে, তবেই এই ভব-সমুদ্রে টিকিয়া থাকা যায়। ভূত যে মন্ত্রে বশীভূত হয়, আমি তাহা জানি। সে মন্ত্র—স্নেহ-মন্ত্র, ইহার বলে অনেক গাধাকে মানুষ হইতে দেখিয়াছি।

চাকরদের ভাল খাবার একটু স্নেহের সঙ্গে দিলে, তাহাদিগকে দিয়া অনেক কাজ করান যাইতে পারে। এই মন্ত্রটি এখনকার কোন কোন গৃহিণী জানেন; পূর্ব্বে সকল গৃহিণীই জানিতেন। মাতা যে গুণে আপন করিয়া তোলেন, ইহা সেই গুণ। যেখানে গৃহিণীর হাতের রান্না ভাল ও তিনি দাস-দাসীকে যত্ন করিয়া খাওয়ান, সেখানে তাহারা অনেক অত্যাচার সহিয়াও পড়িয়া থাকে। অনেক বেশী মাহিয়ানার লোভ দেখাইলেও তাহারা তথা হইতে যাইতে চাহে না।

খাওয়াইবার যত্ন

যদি সময়ে অসময়ে সর্ব্বদা দোষ ধরিয়া দাস-দাসীকে তিরস্কার করা যায়, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা একান্তই বেশী কথা বলে না, তাহারা পর্য্যন্ত জবাব দিতে শিখে! চাকর-বাকরেরা যদি গৃহস্থের কথায় কথায় জবাব দেয় এবং বাঁকিয়া বসে, তবে তাহাদিগকে দিয়া কাজ চলে না, এইজন্য দায়ে পড়িয়া এই ভাবের চাকর রাখিতে হয়। চাকরকে কোন কথা বলিলে যদি সে রুখিয়া উঠে, এবং মনিবকে তাহার দুর্ব্বিনীত ব্যবহার নীরবে সহ্য করিতে হয়, ইহা হইতে দুর্গতির বিষয় আর কি অধিক হইতে পারে? কাহারও ক্রমাগত দোষ ধরিলে এবং তাহার পাছে লাগিয়া থাকিলে, শেষে সে মরিয়া হইয়া উঠে, মনিব-টনিব গ্রাহ্য করে না।

দোষ ধরা

এইজন্য তাহাদিগকে দিনের মধ্যে অষ্টপ্রহর তাড়া করা, শিশুদিগকে

দিয়া গাল খাওয়ান, অথবা তাহাদের পশ্চাতে জটলা করা উচিত নহে। নিতান্ত যাহাকে দিয়া চলিবে না, তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হউক, কিন্তু যাহাকে চালাইয়া লইতে পারা যায়, তাহাকে খানিকটা স্নেহ দেখাইয়া বশ করিয়া ঠাণ্ডা করিতে হয়। তাহার উপর বিরূপ থাকিব, অথচ তাহাকে দিয়া শুধু প্রয়োজন সাধিয়া লইব, এই চেষ্টা বিফল হইবে।

হঠাৎ ছাড়াইয়া দেওয়া

যদি নিতান্তই অচল হয়, তবে রাগের ঝোঁকে তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত নহে। অনেক গৃহিণী হঠাৎ কোন দাস-দাসীর ব্যবহারে এরূপ অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন যে কর্ত্তাকে বলিয়া তাকে তখনই জবাব না দিতে পারিলে—তিনি অন্ন-জল ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। রাগের ঝোঁকে কোন কাজই ভাল নহে। আর কিছু না দেখিলেও নিজের সুবিধা-অসুবিধা ত দেখিতেই হইবে। চাকর হয় ত সত্যই একটা ঘোর অন্যায় করিয়াছে। তাহাকে তখনই বিদায় দিলে যদি শীঘ্র লোক না পাওয়া যায়,—তবে বিপদ্। তাহারা ত বঙ্গীয় গ্রাজুয়েটের ন্যায় হাটে-পথে চাকুরীর জন্য বসিয়া নাই। রাগের ঝোঁকে গৃহিণী চাকর কি চাকরাণীকে বিদায় করিয়া তাঁহার দক্ষিণ-হস্তের সোনার বালাটা বাম-হাতে পরিয়া নিজেই বাসন মাজিতে বসিলেন। কর্ত্তা চাকুরী কিংবা বিষয়-কর্ম্মে এরূপ ব্যস্ত যে, তাঁহার তিলমাত্র অবসর নাই, অথচ সংসার অচল দেখিয়া তাঁহার জরুরী কাগজ-পত্রের তাড়া ফেলিয়া তিনি বাজারে ছুটিলেন। বালকগুলি বৃষ্টিতে ভিজিয়া এ জিনিস ও জিনিস আনিতে দোকানে ছুটিল, ফলে তাহাদের সর্দ্দি, কাসি ও জ্বর হইল। গৃহিণীর উপর সমস্ত সংসারের দুশ্চিন্তা ও কাজের ভার পড়িল, এ অবস্থায় হয় ত তিনি অসুখ করিয়া বসিলেন। কর্ত্তাকে রাঁধিতে হইল, বার্লি প্রস্তুত ও ডাক্তারের বাড়ীতে ছুটাছুটি করিতে হইল, উপরন্তু অফিসের কাজের ক্রটি পাইয়া কিংবা ঠিক্ সময় মত যাইতে

না পারার দরুণ সাহেব বিরক্ত হইয়া গালি পাড়িতে লাগিলেন। গরীব গৃহস্থের পক্ষে ইহা হইতে বিপদ্ আর কি হইতে পারে? "ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং" এ শ্লোকটি সকলেই জানেন।

এই জন্য যদি দাস-দাসীকে ছাড়াইয়া দেওয়াই স্থির হয়, তবে দু'চার দিন মনের ভাবটা চাপিয়া রাখিয়া অপর একটি নিযুক্ত করিয়া—তার পর তাহার মাহিয়ানা চুকাইয়া জবাব দিলে দোষ কি? সংসারটা যিনি বজায় রাখিবেন, তিনিই গৃহিণী। সংসার চলার পক্ষে যিনি পদে পদে বাধা দিবেন, তিনি গৃহিণী-পদের যোগ্যা নহেন।

কিন্তু চাকরদের যদি এমন কোনও অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, যাহাতে একদিনও তাহাকে বাড়ীতে রাখিলে বিপদাপন্ন হইতে হয়---তেমন অবস্থায় তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত। এক ভদ্রলোকের বাড়ীর চাকর তাঁহার তিন বৎসরের মেয়েটিকে বেচিবার ষড়্যন্ত্র করিতেছিল, এরূপ শুনিয়াছি। এই রকম ব্যাপারে তিলার্দ্ধও তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে, কিন্তু এরূপ ঘটনা সংসারে অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে।

অনেক বাড়ীতে চাকর-চাকরাণীকে বারংবার জবাব দেওয়ার ফলে, তাহারা এরূপ নিন্দা প্রচার করে যে, গৃহস্থ কিছুতেই চাকর-চাকরাণী খুঁজিয়া পান না। "আচ্ছা মহাশয়, এই আসিতেছি" বলিয়া বাবুটিকে নিশ্চিন্ত করিয়া চাকর আর আসিল না, কিংবা নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় ঠেকিয়া একবেলা কাজ করিয়াই সে পিট্টান দিল। এইভাবে গৃহস্থ অনেক সময় বড়ই বিপদাপন্ন হইয়া পড়েন। অতিরিক্ত মাহিয়ানার লোভে এবং ভবিষ্যতে নানারূপ উন্নতির আশা-ভরসা দিয়াও কিছুতেই নূতন চাকরকে গৃহে ভিড়াইতে পারেন না। যে গৃহে চাকরেরা একটু স্নেহ-যত্ন পায়, এবং গৃহিণী খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করেন,—তাঁহার বাড়ীতে চাকর-চাকরাণী আপনা হইতে আসিতে লালায়িত থাকে—গৃহস্থ এ কথাটি

মনে রাখিবেন। যে চাকরকে জবাব দেওয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্গে নূতন চাকর যাহাতে জটলা করিতে না পায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ, তাহা না হইলে, পুরাতনটি নূতনটিকেও নিশ্চয় ভাঙ্গাইবে। চাকরের মাহিয়ানা হাতে রাখিয়া অনেকে তাহার দ্বারা বেশী কাজ আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। এটা নিতান্ত অস্বাভাবিক রীতি নহে। যেখানে চাকর স্বভাবতঃই কাজ-কর্ম্মে শিথিল, এবং দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকে, সেখানে মাহিয়ানা আট্‌কাইলে তাহার চরিত্র অনেক পরিমাণে শোধরাইতে দেখিয়াছি।

বেতন আট্‌কাইয়া রাখা

কারণ, টাকা যাহার কাছে পাওনা থাকে, তাহার নিকট লোকেরা কতকটা অপরাধীর মত থাকে, এবং তাহার মন যোগাইয়া উহা আদায়ের চেষ্টা দেখে। কিন্তু সাংসারিক ব্যবহারে আমি কিছুতেই নিষ্ঠুরতার পক্ষপাতী হইতে পারি না। নিষ্ঠুরতার দ্বারা কাজ আদায় করিতে পারা যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের হৃদয় পাওয়া যায় না। যাহা অধর্ম্ম ও অন্যায় —তাহার প্রশ্রয় দিলে নিজের চরিত্র বিকৃত হইয়া উঠে। ইহা অপেক্ষা ভাল লোকের বেশী ক্ষতি কি হইতে পারে? চরিত্রের সাধুতা রক্ষা করিতে পারিলেই আমরা ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য হইয়া থাকি।

কোন কোন বাড়ীর চাকর এতদূর অভদ্র যে, বাহিরের কোন ভদ্র-লোক আসিলে তাহার ব্যবহারে তিনি একান্ত ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হন। সে যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ—শত প্রশ্ন করিলেও উত্তর দিতেছে না, কেবল হুঁকাই টানিতেছে, কিংবা এরূপ উত্তর দিতেছে যে, আগন্তুক ভদ্রলোক আপাদমস্তকে জ্বালা বোধ করিতেছেন। গৃহস্থ-বাড়ীর চাকর এরূপ দুর্ব্বিনীত হইলে, লোক কিন্তু তাহার দোষ দেয় না। সাধারণের বিশ্বাস, মনিবের ছাপ চাকরের গায়ে পড়ে। গৃহস্থের মনের ভিতরে যদি অভদ্রতা থাকে, তবে চাকর

দুর্ব্বিনীত ভৃত্য

তাহার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, এটা যদি চাকরের মনে দৃঢ়-বিশ্বাস থাকে যে, অভদ্র আচরণ করিলে গৃহস্থ কিংবা গৃহিণী প্রকৃতই বিরক্ত হইবেন, তাহা হইলে সে তাহার উগ্র স্বভাব সহজেই সংবরণ ও সংশোধন করিয়া লয়। গৃহস্থ যতই মৌখিক মিষ্টতার বৃষ্টি করুন না কেন, তাঁহার ভিতরটা কিরূপ, তাহা অনেক সময় তাঁহার দাস-দাসীরা আয়নার মত প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখায়। এই ভাবে যখন লোকে চাকরের ব্যবহারটা গৃহস্থের প্রকৃত মনের ভাবের বাহ্য-বিকাশ বলিয়া ধরিয়া লয়, তখন গৃহিণী ও কর্ত্তার এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত, এবং বাহিরের লোকের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া রাখা উচিত। অনেক বনেদি বড় মানুষের ঘরে দাস-দাসীদের ব্যবহার এরূপ সুন্দর যে, তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হয়।

শিশু রক্ষার ভার

অনেক গৃহস্থ, চাকরের হস্তে শিশু-রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন,—কিন্তু ইহাতে অনেক দুশ্চিন্তার কথা আছে। এমনও দেখা যায় যে, চাকর মটর-ভাজা কিনিয়া খাইতেছে ও মনিবের পেটরোগা ছেলেটাকে তাহা হইতে দু-দশটা খাইতে দিতেছে, অথচ সে ছেলে বাড়ীতে বার্লি খায়। জ্বর ও পেটের অসুখে কাতর আমার একটি ছোট ছেলেকে এক মমতাময়ী ঝী কতকগুলি কচি পেয়ারা খাওয়াইয়া এরূপ বিপদ্ ঘটাইয়াছিল যে, তাহাকে যমে-মানুষে টানাটানি করিয়া রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কোনও সময় চাকর রকে বসিয়া তামাকু টানিতেছে ও বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছে, ছেলেটা নীচে বসিয়া তামাকের গুল খাইতেছে, নর্দ্দমার জলকাদা মুখে মাখিতেছে, অথবা ঘুঁটের ডেলা মুখে পুরিতেছে। কলিকাতায় নিশ্চিন্ত গৃহস্থের স্নেহের দুলালদিগের এই দুরবস্থা পথে ঘাটে অনেক সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জন্য চাকর-চাকরাণীর সাবধানতার পরীক্ষা না পাইয়া ছেলেদের ভার তাহাদের উপর দেওয়া উচিত নহে। ছেলেকে কোলে করিয়া বাহিরে পাঠাইবার পূর্ব্বে কয়েকদিন চাকরকে বাড়ীতেই রাখিবার ভার দিয়া পরখ করিয়া লওয়া উচিত। যদি দেখা যায়, সে সতর্ক ও বিশ্বাস-যোগ্য, তাহা হইলে একটু বাহিরে ছেলে লইয়া বেড়াইয়া আসিলে তাহার স্ফূর্ত্তি হইবে—কিন্তু অসতর্ক ও অমনোযোগী ব্যক্তির হস্তে গৃহিণী তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিশুকে কখনই ছাড়িয়া দিবেন না। শিশুর দেহ অতি কোমল, একটু সামান্য অসুখ হইলে ফুলের মতন তাহাদের মাথা নোওয়াইয়া পড়ে।

গুরুজনের প্রতি ব্যবহার ও অন্যান্য কথা

গুরুজনের প্রতি গৃহ-ললনারা কিরূপ ব্যবহার করিবেন, বাল্যকাল হইতেই তাহা শিক্ষার দরকার। যাঁহারা নিজেরা জননী হইবেন, তাঁহারা কিছুদিনের মধ্যে বুঝিতে পারিবেন, সন্তানের জন্য জনক-জননী কতদূর করিয়া থাকেন। কত অনিদ্রা, কত দুশ্চিন্তা ও অনাহারে প্রতিদিন এই সন্তানপালন-ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। এত কষ্টের ধন যদি বিগড়াইয়া যায়, সে যদি মা-বাপকে মান্য না করে, যদি তাহার নিকট হইতে কিছুমাত্র স্নেহের প্রতিদান না পাওয়া যায়, তবে পিতামাতার প্রাণে কিরূপ দুঃসহ বেদনা হয়! মাতা শিশুর জন্য প্রাণ দিয়া দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রতিদানে কি চান? শিশুর একটু হাসি বা একটিবার 'মা' ডাকে তিনি

পিতা-মাতার কষ্ট

হাতে স্বর্গ পান ; তিনি আর কিছু চান না। সন্তান বড় হইলে যদি তাঁহার খোঁজ না লয়, তবে "আহা, ভাল থা'ক, একবার মুখখানি দেখিলে চক্ষু জুড়াইত!"—ইহা ছাড়া তাঁহার আর কোন কামনা থাকে না। এই ত্যাগজনিত স্নেহের তুলনা কোথায়? সেই শিশু বড় হইয়া দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া আঘাত করিবে এবং দেখিবে, আর কেহ তাহাকে সেই মাতৃস্নেহের শতাংশের একাংশ দিতেও প্রস্তুত হইবে না। জন্মমাত্র নিঃসহায় জীবকে ভগবানের করুণা স্বয়ং মা হইয়া কোলে লইয়া বসিয়াছিল, পিতা হইয়া তাহার রক্ষার জন্য চিন্তা করিয়াছিল। এই গৃহের দেবদ্বারে যাঁহারা প্রথম দেখা দিয়াছিলেন, যাঁহারা খাইতে দিয়াছিলেন ও বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন, কত বৃষ্টিতে ভিজিয়া, কত দুশ্চিন্তা করিয়া, মন্দিরে মন্দিরে কত ধন্না দিয়া, ডাক্তারের বাড়ী ঘুরিয়া নিজের খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া, যাঁহারা আমাদের রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা বড় দেবতা কে জানি না,—কোন্ দেব কি দেবীকে, আমরা 'মা' 'বাবা' অপেক্ষা উচ্চ নামে ডাকিতে পারিয়াছি? তাঁহারা যখন ছাড়িয়া যান, তখনও নানা যন্ত্রণায় পড়িয়া তাঁহাদের স্মরণ করিলেই আমরা শান্তি পাইয়া থাকি। যখন আমরা আর্ত্ত ও নিরাশ্রয় হই, তখন "মা" "বাবা" শব্দ আপনা-আপনি মুখে আসে। রোগে, শোকে, দুঃখে পড়িয়া তাঁহাদেরই চরণ মনে পড়ে। তাঁহাদের প্রতি স্নেহাপরাধ করিলে শেষে তপ্ত অশ্রুজলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সর্ব্বদা তোমার জন্য চিন্তা করিতেছেন ও কষ্ট সহিতেছেন—অনায়াস-লব্ধ অসীম স্নেহ পাইয়াছ বলিয়া তাহার মূল্য দিতে ভুলিও না, জগতে সেরূপ আর পাইবে না। কত মূর্ত্তি দেখিবে, কত চিত্রকর কতরূপ আঁকিয়া দেখাইবে, কিন্তু মায়ের মুখের কমনীয়তা কোথায় পাইবে,—পিতার স্নেহদৃষ্টি কোথায় দেখিবে?

তাঁহাদের স্নেহ

পিতামাতাকে ছাড়িয়া অনেক যুবক স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, তাহাদের পিতামাতা ভাল কি মন্দ, তাহা আমি জানি না। কিন্তু শিশুর পক্ষে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া বড় করিয়াছেন। সংসারে কোন সাধু, কোন শক্তিমান্ পুরুষ বা কোন মহৎ ব্যক্তি যাহা করেন নাই,—যাহা করিতে পারিতেন না, শিশুর জন্য পিতামাতা তাহাই করিয়া থাকেন। শিশুর পক্ষে তাঁহাদের অপেক্ষা ভাল কে হইতে পারে? যদি বৃদ্ধ বয়সের দোষ আবিষ্কার করিয়া পুত্র তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যায়, তবে তাঁহাদের মনে কি ভাব হয়, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? পিতামাতা তাহার নিকট কোন প্রত্যুপকার চান না; যে পুত্র পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি দিতে ভুল না করে, সেইখান হইতে ভগবান্ স্বয়ং তাহার পূজা গ্রহণ করেন। কিন্তু যিনি পিতামাতাকে কষ্ট দিয়াছেন, তাহার পশ্চাৎ তাঁহাদের দীর্ঘনিশ্বাস ঘুরিয়াছে,—তাহারা সংসারের উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া হৃদয়ের জ্বালার হাত কিছুতেই এড়াইতে পারে নাই। এরূপ নিঃস্বার্থ প্রেমের অপমানে বিধাতা প্রসন্ন হন না। আমি নিজে এ বিষয়ে অপরাধী, এবং সেই অপরাধের বহু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এ কথা লিখিতেছি।

তাঁহাদিগকে ত্যাগ করা

স্নেহময়ী রমণীরা এ কথা ভাল বুঝিতে পারিবেন। যদি অর্জ্জনশীল পুত্র পিতাকে ত্যাগ করেন, তবে এই অপরাধের জন্য লোকে সাধারণতঃ পুত্রবধূকে দায়ী করে। অনেক সময় সত্য সত্যই মূল অপরাধ বধূরই বটে। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, তিনি তাঁহার স্বামীকে যদি এই মহা অধর্ম্মের পথে টানিয়া ল'ন, কে আর তাঁহাকে উন্নত করিবে? যদি বৃদ্ধ বয়সে নিরাশ পিতামাতা তাঁহাদের ছোট ছোট শিশু-সন্তান লইয়া দিনরাত্র দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় সময় কাটাইতে থাকেন, অথচ যে পুত্রকে তিনি বহুকষ্টে মানুষ করিয়াছিলেন,

সে পৃথক হইয়া তাহার ভ্রাতাদের বা পিতামাতার খোঁজ না লয়, তবে সে দুঃখ পিতামাতা বলিবেন কাহাকে?—তাঁহারা অবশ্য প্রতিদানে কিছু চান না,—কিন্তু পুত্রের নির্ম্মমতায় তাঁহাদের প্রাণে যে শেল বিদ্ধ হয়, তাহা অনেক সময় তাঁহাদের মৃত্যুবাণ হইয়া পড়ে। ছোট ছোট শিশুগুলিকে নিঃসহায় দেখিয়া তাঁহাদের কান্না পায়। নিজেদের দুঃসহ জীবনের বোঝা নামাইতে পারিলেই ত্রাণ পান, অথচ শিশুদিগের মুখের দিকে চাহিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন; তাঁহাদের দৈনন্দিন সেই রাশি রাশি দুঃখ যে সন্তানের প্রাণে না লাগে, সে কি নির্ম্মম! যে সাময়িক সুখের প্রত্যাশায় স্বাভাবিক এই মহাস্নেহের বন্ধনকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, সে আত্মতৃপ্তির স্বর্গের দ্বার নিজ হাতে রুদ্ধ করিয়াছে।

বধূ যদি সুবুদ্ধি হন, তবে কখনই তাঁহার স্বামীর সঙ্গে পিতামাতার ঐশ্বরিক স্নেহবন্ধন কাটিয়া ফেলিবার জন্য স্বার্থের ছুরিখানি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিবেন না। যাহা স্বার্থের বিপর্য্যয়, তাহা কখনও সুখ বা উন্নতির কারণ হইতে পারে না। দোষ-গুণে সংসার। কাহারও কোন একটা দোষ কল্পনায় নিতান্ত বড় করিয়া তোলার দরকার নাই। ডাকের বচনে আছে,—পিতার সঙ্গে যখন পুত্রের ঝগড়া হইয়াছে, তাহার বিচার করিতে যে রাজা যান, তিনি অবোধ। কারণ, বাহিরের লোক এ ঝগড়ার মূলসূত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিবেন না। একবিন্দু চক্ষের জলে উহা কোথায় উড়াইয়া লইয়া যাইবে, তাহার ঠিকানা নাই।

সংসারে যেখানে নিজেকে ভাল ও উন্নত করিতে হয়—সেইখানেই আত্মসংযম ও তপস্যার দরকার। দাম্পত্যপ্রেম প্রথমাবস্থায় বড় মধুর, তাহা ভোগের সামগ্রীর মত সহজেই মনকে প্রলুব্ধ করে! কিন্তু যে পথে উন্নতি, তাহা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়, তাহা গৃহের পুষ্পশয্যা ও ভোগবিলাসের পার্শ্বে পড়িয়া নাই। সংসারীর তপস্যা করিতে হইলে,

কর্ত্তব্যের দুর্গম পথে যাইতে হইবে। এই জন্য ভগবানের লীলা যে জায়গায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা গিয়াছিল, সেই পিতামাতার মন্দিরে সংযম-বুদ্ধি দ্বারা মনকে পবিত্র ও উন্নত করিয়া যাইতে হইবে। নিজের স্বার্থ, সুখ ও ভোগের ইচ্ছা ছাড়িয়া দিতে হইবে, তবেই তাহাদের পাদ-পদ্ম-দর্শনের অধিকার জন্মিবে। একবার সেই পাদপদ্ম যাঁহার নয়নগোচর হইয়াছে, তিনি দেখিবেন, তথায় পুষ্পাঞ্জলি দিলে যত ঠাকুর-দেবতার পদে সেই অঞ্জলি পড়িবে। নতুবা বনের ফুল কুড়াইয়া মন্দিরের কাছে আনাগোনা করিলে কোন লাভ নাই! এমন যে চৈতন্যদেব, তিনিও মধ্যে মধ্যে 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া অনুতাপ করিয়াছেন। শচীমাকে ছাড়িয়া যে ধর্ম্ম করিতেছেন, তাহা সকলই ভুল বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন। (১)

সংযম ও চিত্তশুদ্ধি

বধূ শ্বশুরবাড়ীর গুরুজন এবং দেবর প্রভৃতির কোন দোষের কথা যেন স্বামীর কানে না তোলেন। এ সম্বন্ধে নিতান্তই যদি কিছু বলিবার থাকে, তবে তিনি সংযত হইয়া শাশুড়ীকে বলিতে পারেন; এবং যেখানে তিনি স্বামীকে স্নেহের অপরাধী হইতে দেখিবেন, সেখানে তাঁহাকে ভাল উপদেশ দিয়া শোধরাইতে চেষ্টা করিবেন। নতুবা গৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া স্বামিসহ উড়িয়া গেলে, সে গৃহটি ত কাণা করিয়া যাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও কোন্ স্বার্থকূপে পড়িয়া লুটাপুটি হইবেন, তাহার স্থিরতা নাই।

বধূর কর্ত্তব্য

শুধু স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সুগৃহিণী-পদবাচ্য হন না। যাহার সঙ্গে যে ভাব, গৃহের যে আত্মীয় তাঁহার

---

(১) তোমার সেবা ছাড়ি করিনু সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি ধর্ম্ম কৈলাম নাশ॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

স্নেহ বা সেবার যতটা ন্যায়সঙ্গত দাবী রাখেন, তাহা পূরণ করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম আচরণ করিলেই এ দেশে সেই রমণী আদর্শ-গৃহিণী-পদবাচ্য হইতে পারেন। নতুবা ভাসুরপত্নীকে দুকথা শুনাইয়া, শ্বশুরের তিরস্কার-জনিত রাগের ফলে নিজের শিশুর পৃষ্ঠদেশ পিটাইয়া কিংবা রাগের ঝোঁকে থালা বাসন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ও তাহাদের কাংস্য-প্রাণের আর্ত্তনাদের সঙ্গে নিজের সুর জুড়িয়া দিয়া কান্না আরম্ভ করিলে, সে মূর্ত্তি স্বামীর চক্ষে যতই করুণার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন,—সংসারের অপর সকলে সেই উগ্র ও তাণ্ডব ভাব সহ্য করিতে পারিবেন না।

বধূ ও কন্যারা প্রাতে উঠিয়া ভগবান্‌কে ডাকার পর জনক-জননী বা শ্বশুর-শাশুড়ীর পদবন্দনা করিবেন; সেই প্রণামের ফলে সে দিন শুভ হইবে। যদি কোন অন্যায় আচরণের ফলে গুরুজনের মনে কোন দুঃখ বা বিরক্তি জন্মিয়া থাকে, ঐ প্রণাম সেই দুঃখ ও বিরক্তি দূর করিবে এবং তাঁহাদের মনে অপত্যস্নেহ নির্ম্মল করিয়া তুলিবে। বধূ বা কন্যা যদি গুরুজনের ব্যবহারে মনে কষ্ট পাইয়া থাকেন, ভক্তির সহিত প্রাতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেখিবেন, তাঁহার নিজের মনের ভাবও অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। সেই বিরক্তি ও দুঃখের স্থলে তাঁহার হৃদয়ে কেবল আশীর্ব্বাদলাভের ইচ্ছা ও স্নেহের ভাব জাগ্রত হইয়াছে। গুরুজনকে ভুলাইবার একমাত্র উপায় তাঁকে স্নেহ ও ভক্তি দেখান। তাঁহার রাগ যতই উগ্র হইয়া উঠুক না কেন, অপত্য-স্থানীয় ব্যক্তির চক্ষে উহা যত বড়ই হউক না কেন, যদি সন্তান বা সন্তান-স্থানীয়গণ তাঁহার ভর্ৎসনা কিছুকাল নীরবে সহিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, সে রাগ বানের জলের তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে; স্নেহের বান ডাকিয়া উঠিবে, অন্তরের সমস্ত মলা ঘুচিয়া যাইবে।

গুরুজনের প্রণাম

প্রতিবেশীও অপর বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের সহিত ব্যবহারে সর্ব্বদা

সতর্কতার দরকার। যদি অপর বাড়ীর একটা শিশু গাছ হইতে একটা আমড়া পাড়িয়া লইয়া যাইয়া থাকে, কিংবা ছাদের উপর হইতে অপর বাড়ীর একটা শিশু আপনার পুত্র-কন্যাকে মুখ ভেঙ্গচায় বা লাথি দেখায় ও তাহার পিতা-মাতা যদি তাহাকে শাসন না করিয়া হাসিমুখে তাহার সহিত কথা বলেন, তবে তাহাই লইয়া এ বাড়ীর গৃহিণী একটা বড় ব্যাপার গড়িয়া তুলিবেন না। এ সকল সামান্য কথা স্বামীর কানে তুলিবেন না। ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, ছোট ছোট কথা হইতে বড় বড় কথার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাড়ীর গৃহস্বামী আপনাদের সম্বন্ধে গোপনে তাঁহার স্ত্রীকে কি বলিয়াছেন ও সেই বাড়ীতে পর্দ্দার আড়ালে আপনাদের সম্বন্ধে কি আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে কান দিতে নাই। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে যতই উপেক্ষার ভাব দেখাইবেন, ততই সদ্ভাব থাকিবে। একবার কলহের আরম্ভ হইলে যাঁহারা অতি নিকট, তাঁহারা অতি বিকট হইয়া পড়িবেন, এবং অনেক অস্বাভাবিক ঘটনার সংঘটন হইবে।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব

বিনয় ও লজ্জা নারীজাতির ভূষণ। নারীজাতি যতই লজ্জাশীলা হইবেন, ততই তাঁহারা সুন্দরী দেখাইবেন, কারণ, লজ্জা ও নম্রতাই তাঁহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য। এই লজ্জার একটা বাজে অর্থ আছে, আমরা সে অর্থে ইহা ব্যবহার করি নাই। লজ্জার অর্থে পাঁচপোয়া ঘোম্‌টা নহে। কোন বঙ্গীয় রমণী তাঁহার আত্মজীবনচরিতে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামীর ঘোড়াটা হঠাৎ ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিলে তাহাকে দেখিয়া তিনি লজ্জায় ঘোম্‌টা । কোন কোন স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি, তাঁহারা রেল-ষ্টীমার হইতে নামিবার সময় এরূপ বড় ঘোম্‌টা দিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়েন যে, চক্ষু আবৃত থাকায় তাঁহারা হঠাৎ পথিকের গায়ের উপর আসিয়া পড়িতে

লজ্জা

পারেন। ইহা লজ্জা নহে, লজ্জার অভিনয় মাত্র। প্রকৃত লজ্জা জিহ্বাদি-সংযম। সংযত দৃষ্টি, সংযত কথা ও সংযত ব্যবহারেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত লজ্জা প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমরা সকলেই সেইরূপ লজ্জাশীলা দেবী দেখিয়াছি; তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে কোমল-কুসুমের উপমাস্থল। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের চরিত্রে নারীহৃদয়ের বলের অভাব নাই। সে শক্তি সহিষ্ণুতায়, সাধুতায় এবং পরসেবায় ও আত্ম-সমর্পণে সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আজকালকার দিনে রেলগাড়ী ও ষ্টীমারে অনেক স্ত্রীলোককে যাতায়াত করিতে হয়। লজ্জাবতী লতা হইয়া থাকিলে এইরূপ যাতায়াতে অনেক সময় বিপদ ঘটিয়া থাকে। কখনও কখনও প্রকৃত লজ্জা বাঁচাইবার জন্যই বাহ্য লজ্জাকে কতক পরিমাণে বিদায় করিতে হয়।

রাস্তা-ঘাট

আমি আমার একটি আত্মীয়া রমণীকে জানি, তিনি পরমা-সুন্দরী ও "ঘরে কুঁড়িফুল,"—কেহ তাঁহার উচ্চ কথাটি শুনিতে পান না। একদা তাঁহাকে লইয়া আমরা কোন দেবালয়ে গিয়াছিলাম,—আমাদের সঙ্গে দুগ্ধপোষ্য এবং দুই তিন বর্ষ-বয়স্ক কয়েকটি শিশু ছিল। কোন আকস্মিক ঘটনায় পড়িয়া মন্দির যাইতে আমাদের বিলম্ব হয় ও সমস্ত বন্দোবস্ত মাটি হইয়া যায়। সেই মন্দিরে অতিথি-অভ্যাগতদের খাওয়ার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু মন্দিরের ভার যাহার উপর, সে লোকটা খারাপ ছিল। মন্দির-স্বামিনী তীর্থযাত্রীদের পাছে কোনরূপ অসুবিধা হয়, তজ্জন্য মাতার মত সকল দিক্ ভাবিয়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু অধ্যক্ষটির ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলাম। বেলা তখন তিনটা; তিনি খাওয়া-দাওয়ার পর নিদ্রা যাইতেছিলেন। আমাদের ছেলেরা বলিতে গেলে একরূপ অনাহারেই ছিল,—তাহাদের চীৎকারে অধ্যক্ষ মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহাকে আমরা আমাদের অবস্থা জানাইলাম, তিনি

"এ সময়ে কি হইতে পারে?" অতি সংক্ষেপে এক কথায় আমাদের নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া শুইয়া পড়িলেন। আমরা ভয়ানক বিপদে পড়িলাম। কি করি? সেখান হইতে বাজার তিন মাইল দূরে। আমরা এরূপ পরিশ্রান্ত যে আমাদের হাঁটিয়া ততটা যাওয়া সুকঠিন, এবং স্ত্রীলোকদিগকে একা ফেলিয়া কিরূপেই বা যাওয়া যাইতে পারে! কিন্তু আমার সেই আত্মীয়া রমণী অল্পবয়স্কা হইলেও, মন্দিরের দাসদাসীরা যেখানে ছিল, সেখানে নিজে গেলেন, এবং এমনই করুণভাবে নিজেদের অবস্থা জানাইলেন যে—দুই তিন জন চাকর অমনি আসিয়া হাজির হইল, এবং হাত জোড় করিয়া বলিল, "মা, আপনার কোন চিন্তা নাই, আমরা সকলই আনিয়া দিতেছি।" আমরা দুধ, চাল, ডাল, সন্দেশ, ঘি, তরকারী সকলই পাইলাম।

এই স্ত্রীলোকটি আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি রেলের টিকিট্ পর্য্যন্ত করিয়া যাতায়াত করিয়াছেন। হিন্দুঘরের অল্প-বয়স্ক মেয়ের পক্ষে ইহা অসীম সাহসিকতা বলিতে হইবে। অনেক দুষ্ট লোক রাস্তায় জোটে। সুন্দরী মহিলা দেখিলে তাহারা অশিষ্টতার পরিচয় দিয়া থাকে। এরূপ কোন দুর্নীত ব্যক্তিকে তিনি সংযত কথায় এমনই চাবুক দিয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি লজ্জায় কোন্ দিকে পলাইবে, তাহার পথ পায় নাই। এই রমণীর ব্যবহারে প্রকৃত লজ্জাশীলতার কখনও বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় নাই, অথচ অবস্থানুসারে তিনি অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছেন। রাস্তা-ঘাটে বড় ঘোম্‌টা অতিশয় বিসদৃশ। ঐ ঘোম্‌টার ফলে কোন স্ত্রীলোক সঙ্গিচ্যুত হইয়া ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যান, পথ না দেখিয়া খানা কিংবা ড্রেইনে পড়েন, যাত্রীদের গায়ের উপর পড়িয়া লজ্জা পান। রাস্তায় দুটি চক্ষু খুলিয়া চলিতে হইবে,—সেখানে চক্ষুর আবরণ বড় বিপজ্জনক। রাস্তা-ঘাটে মেয়েদের সেমিজ পরিয়া যাওয়া উচিত। অনেক

হিন্দুরমণী প্রাচীন সংস্কারের ফলে সেমিজ পরিতে লজ্জা বোধ করেন; এরূপ করাতে তাঁহাদের যে প্রকৃত লজ্জাশীলতার অভাব হয়, তাহাতে আত্মীয়গণ লজ্জা পান।

রাস্তায় একটি জিনিস যথাসাধ্য ত্যাগ করা উচিত, তাহা নিদ্রা। রাত্রি জাগিয়া রেল-ষ্টীমারে যাইতে হয় ও ছোট ছোট শিশুরা গাড়ীর জানেলার দিকে বেশী না ঝোঁকে, তাহা সর্ব্বদা দেখা দরকার। অনেকে রেলে ষ্টীমারে কিছুই খান না। ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য একেবারে কাঠ হইয়া বাড়ীতে ফেরেন। এইরূপ উপবাসের ফলে হঠাৎ রাস্তাতেই কোন অসুখ হইতে পারে—তাহা হইলে বিপদের সীমা থাকে না। রেল-ষ্টীমারে আমাদের যাতায়াতের খুব সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচীন ভাবগুলি সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া উহাতে যাতায়াত করা ঘোর বিপদ্ ও অসুবিধা-জনক। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়।

রাস্তায় সতর্কতা

ঘোড়ার গাড়ীতে গহনা গায় পরিয়া স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যা কি রাত্রে চলাফেরা করিতে বিশেষ সাবধান হইবেন। এই ভাবে মাঝে মাঝে কেহ কেহ খুব বিপদে পড়েন। গাড়ী ও গাড়োয়ানের নম্বর টুকিয়া রাখিবেন। অনেক সময় গাড়ীর ছাদের উপর তোরঙ্গ বা বাক্স চাপাইয়া যাত্রী নিশ্চিন্ত-মনে চলিয়াছেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া হঠাৎ দেখা গেল, তোরঙ্গ ও বাক্সটি নাই। গাড়োয়ান এই অবস্থায় প্রায়ই বলিয়া থাকে, সে জিনিস আদবেই আনা হয় নাই, কিংবা কি ভাবে কে নিয়াছে, সে জানিতে পারে নাই; কারণ, সে ত ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিয়াছে, পাছের দিক্ ফিরিয়া দেখিবার তাহার সুবিধা হয় নাই। সহিস হয় ত বলিবে, সে এক পয়সার বিড়ি কিনিতে খানিকটা নামিয়াছিল, কে নিয়াছে; দেখিতে পায় নাই। মোট কথা, গাড়োয়ানদের সময় সময় নিজেদের দল থাকে; তাহাদের সঙ্গে জোট করিয়া এইভাবে চুরি করে। সুতরাং দামী জিনিস যে তোরঙ্গে বা বাক্সে

যাইবে, তাহা গাড়ীর ছাদের উপর রাখিতে হইলে তজ্জন্য একটু ব্যবস্থার দরকার। অনেক সময় আবার বাড়ীতে পৌঁছিলে ভ্রমণকারী ব্যক্তিরা তাড়াতাড়ি জিনিসগুলি গুছাইয়া তুলিবার সময় কোন কোন জিনিস গাড়ীতে ফেলিয়া যান। গাড়োয়ান ভাড়া চুকাইয়া লইয়া বিড়ি খাইতে খাইতে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া যায় এবং বাড়ীতে যাইয়া সেই জিনিস আপনার করিয়া লয়।

রাস্তায় বিপদ্ অনেক সময় ইহা হইতেও ঢের বেশী হয়। কলিকাতায় এরূপ শোনা গিয়াছে যে দুষ্ট গাড়োয়ানদের মাঝে মাঝে এমন আড্ডা আছে, যেখানে যাত্রীর প্রাণ নিয়া টানাটানি; হয় ত একটু বেশী রাত্রে গাড়ী চলিয়াছে, গাড়োয়ান অলি-গলি দিয়া যাত্রীর অতর্কিতভাবে সেই আড্ডায় নিয়া পৌঁছাইয়া দিল; তখন গুণ্ডা আসিয়া প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করিল, গাড়োয়ান সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে যোগ না দিয়া ঘোড়ার বল্গা ধরিয়া নিশ্চেষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। তখন যাত্রীর অদৃষ্টের লিখনানুসারে ঘটনা ঘটিতে লাগিল। মেয়েরা রাস্তা-ঘাটে যাইবার সময় একটু শক্ত হইবেন,—তাঁহারা একেবারে ফুলের কুঁড়ির মত হইয়া থাকিলে চলিবে না।

আজকাল পুত্র-কন্যার বিবাহের সময় বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অনেক সময় মাথা ঘুরিয়া যায়। একে ত বরের পণ এক বিষম সমস্যা! সূর্য্যাস্তের মধ্যে দেয় রাজস্ব লইয়া জমিদার যেরূপ বিব্রত হইয়া পড়েন, বরের পণে বিপদের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না; পাশকরা ছেলের পিতামাতার একদিনের জন্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ অনেকেই দেখিয়াছেন। অনেক সময় তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা থাকে না,— যাঁহাদিগের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইবেন, তাঁহাদের চোখের জল ও বিপদ্ তাঁহারা অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। গৃহস্থের ভদ্রাসন বিক্রয়

পুত্র-কন্যার বিবাহে

করা বা দেনাদারের নিকট নিঃসহায়ভাবে তাঁহার চুলগুলির প্রত্যেকটি বন্ধক দেওয়া,—প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁহারা বিচলিত হন না। পুত্রের পিতামাতার প্রাণ যখন অর্থলোভে এরূপ কঠোরতা ধারণ করে, তখন তাহাতে অপত্য-স্নেহের খেলা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

অনেক সময় বাড়ীর কর্ত্তাই এরূপ নির্ম্মমতার পরিচয় দেন, গিন্নী কেবল যৌতুকের জিনিসপত্রের খুঁৎ বাহির করিতে ব্যস্ত থাকেন, নগদের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য কম। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে গৃহিনীরা যৌতুকের লেপ, বালিস, তোষক, খাট এবং কাঁসার বাটি, ঘটী লইয়াই অনেক সময়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, এবং ঋণবদ্ধ বৈবাহিকের টিকি ধরিয়া যথাসাধ্য নাড়া দেন। যাঁহারা পুত্রলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিধাতা অনেক সময় কন্যা-রত্নেও বঞ্চিত করেন না,—কন্যাবিবাহকালে মাঝে মাঝে তাঁহাদের পূর্ব্ব-ব্যবহারের সুদ শুদ্ধ প্রতিদান প্রাপ্ত হন। রমণী-হৃদয়ের দয়ার কথা আমরা কখনও ভুলিতে পারি না, তাঁহাদের দয়ায় এই পৃথিবী টিকিয়া আছে। আমরা জন্মিয়া যে এত বড় হইতে পারিয়াছি, তাহা সকলই তাঁহাদের দয়ার ফলে। দয়াময়ীদের নির্দ্দয়তা দেখিলে বড় দুঃখ হয়, তাঁহারা বিবাহকালে কন্যার পিতামাতাকে বর ও অভয় দিন, অসি ও নরকপাল দেখাইবেন না। যদি তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত ভাবে পারিবারিক শাসন-দণ্ড পারিচালনা করেন, তবে দুর্ব্বৃত্ত গৃহস্থের মস্তক আপনা হইতেই হেঁট হইবে, বাড়ীর সকলের অমতে তিনি কখনই একটা নিদারুণ ও নির্ম্মম কর্ম্ম করিতে পারিবেন না।

বর-পণ সম্বন্ধে অনেক স্থলেই গৃহিণীর দোষ নাই, কিন্তু বিবাহে অতিরিক্ত ব্যয়-বিধান করায় তাঁহার বেশ হাত আছে। অনেক সময় গিন্নীর প্ররোচনায় দরিদ্র গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। হিন্দুর ঘরে বিবাহ নানা কারণে মঙ্গলের ব্যাপার না হইয়া মহা অশুভের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহ উপলক্ষে ঘরে যেন ডাকাত পড়িল, সর্ব্বস্ব হরণ না করিয়া

কিছুতেই ছাড়িবে না। পূর্ব্বকালে বণিকেরা বিবাহকালে খুব ঘটা করিতেন; তাঁহাদের আয়ও যথেষ্ট ছিল, এবং বাহ্য আড়ম্বর করিয়া, বাজী পোড়াইয়া, মিশিল বাহির করিয়া, চৌঘুড়ি চালাইয়া, সোনা রূপার খাট বাহির করিয়া, রাস্তার লোকদিগকে তাক লাগাইতে পারিলেই তাঁহারা সৌভাগ্যের চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছেন, এরূপ মনে করিতেন। বাড়ীর পার্শ্বে অমুক বণিক্ তাঁহার পুত্র-কন্যার বিবাহে এত খরচ করিয়াছেন, আর আমি তদপেক্ষা বেশী করিতে পারিব না? এইরূপ প্রতিযোগিতা করিয়া এক রাত্রের ভিতর তাঁহারা টাকা, মোহর কি ভাবে কত উড়াইয়া দিতে পারেন, —খোসামুদের সঙ্গে একত্র পরামর্শ করিয়া তাহারই তালিকা প্রস্তুত করিতেন। প্রাচীন বাঙ্গালা অনেক পুস্তকে—বণিক্‌গণের বিবাহের কথা আছে—তাহা সমারোহ-জনক ব্যাপার ছিল। ইহার মধ্যে ভাল কথা এইটুকু যে, বণিকগণ কিছুতেই হিসাবটি একেবারে ভুলিতে পারিতেন না, এবং ব্যয়কে কথনই আয়ের মাথা ডিঙাইয়া যাইতে দিতেন না।

ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের ঘরে বিবাহে নির্ম্মল আমোদ ও আত্মীয়তার অভাব ছিল না; কিন্তু তাহাতে কথনই বেশী খরচ হইত না। আজকাল মেয়েরা, বিবাহ উপলক্ষে, "এটা করিতে হইবে,—ওটা চাই—খোকার বিয়ে, যদি ইংরেজী বাজনা না আসে, যদি মিশিলটা ভাল না হয়, তবে আর কি হইল?" এই সকল বলিয়া পুরুষদিগের কাছে বায়না ধরেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া অনেক সময় দরিদ্র গৃহস্থের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। কিন্তু বাড়ীর প্রভাব বড় শক্ত। বিশেষ যখন স্নেহময়ী মা চক্ষের জল ফেলিয়া খোকার প্রতি স্নেহজনিত কর্ত্তব্যের উল্লেখ করেন, তখন পিতা আর কি করিবেন? অনেক সময় তাঁহার ভাবী বৈবাহিক, নিজ ভিটা বন্ধক দিয়া এত কষ্টে যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা বাজীর ধূমে উড়িয়া যায়; ইংরেজী বাজনার উচ্চ রোলে ও মিশিলের চিত্রবিচিত্র চালার মধ্যে

মহাসমারোহে সেই দিন দুঃখীর ধনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই সকল ঘটায় দরিদ্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক একবারে উৎসন্ন যাইতে চলিয়াছেন। গৃহিণীকে আমরা অনুরোধ করি, যখন বাড়ীর কর্ত্তাও এই ভাবে খরচ করিতে বসিবেন, তখন তিনি যেন হাত ধরিয়া তাঁহাকে বারণ করেন। শিশুরা এই দৃষ্টান্তে বিলাসের পথ চিনিয়া লয়; সে পথ একবার চিনিলে—তাহার আর রক্ষা নাই। এই মুহূর্ত্তে প্রত্যেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কত নিকট আত্মীয় নিজেরা না খাইয়া শিশুর খাদ্য-সংগ্রহের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছেন। কত অনাথা বিধবার একবারের এক মুষ্টিও জুটিতেছে না। হয়ত নিজের মামাত বা পিস্‌তুত বোন্ শতছিদ্র সাড়ীখানায় তালির উপর তালি দিয়া কোনক্রমে লজ্জা সংবরণ করিতেছেন, কিংবা প্লীহা-যকৃৎ লইয়া তাঁহার একমাত্র ছেলেটি ঔষধ ও পথ্যের অভাবে মৃত্যুর সন্নিহিত হইতেছে। একবার চক্ষু মিলিয়া বাঙ্গালার মাতাগণ—বাঙ্গালার সন্তানদিগকে দেখুন,—অন্ন-কষ্টে কত গৃহস্থ চাকুরীর বৃথা আশায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের বাড়ীর মেয়েরা কত কষ্ট, কত দুর্ভাবনা সহ্য করিয়া, নিজেরা উপবাসী থাকিয়া, বালক-বালিকাদের পাতে কিছু দিতে পারিতেছেন না।—এক ভদ্রলোক তিন দিন তাঁহার স্ত্রীর সহিত উপবাসী থাকিয়া চতুর্থ দিন শিশুর মুখে "বাবা, আজ কি খাইব?" শুনিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া একখানি ডিঙ্গা বাহিয়া জলেশ্বরীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া শান্তি পাইতে গিয়াছিলেন। আমাদের এক আত্মীয় তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। এই দৈন্য-দুঃখ,—দয়ার প্রশস্ত ক্ষেত্র। আপনারা যত বৃথা উৎসব করিতেছেন,—যত বাজে ব্যয় করিতেছেন,—তাহা দয়ার বক্ষে আঘাত করিতেছে। বঙ্গের দয়াময়ী অন্নলক্ষ্মীর অশ্রু অবিরত বহিতেছে। সুতরাং গৃহিণীরা বিবাহের উপলক্ষে যদি উদ্বৃত্ত টাকা ব্যয় করিতে পারেন, তবে তাহা দরিদ্র ও নিরন্ন আত্মীয়দের জন্য করুন,—বৃথা তত্ত্ব লইয়া

অসম্ভব খরচ করিবেন না। যাঁহারা আপনাদের প্রত্যাশী, তাঁহাদিগের আশা পূরণ করুন। দেখিবেন, যদিও বাহ্য উৎসবের শিখা তারার মত আকাশ-পথে উঠিল না,—তথাপি বহু হৃদয়ের কৃতজ্ঞতায়, উৎসব আপনাদের মন্দিরে নীরবে আত্ম-তৃপ্তির অমৃত বর্ষণ করিয়া গেল।

আমি ধনী ব্যক্তিদের কথা বলিতেছি না; ভগবান্ তাঁহাদের অনেকটা আব্দার সহ্য করেন। কিন্তু যতটা বৃথা খরচ তাঁহারা করিবেন, সেই পরিমাণে পূর্ব্ব-অর্জ্জিত পুণ্য তাঁহাদের ফুরাইয়া যাইবে। যখন থলিয়া ভর্ত্তি থাকে, তখন তাহা হয় ত অনেকে বোঝেন না,—কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা যাহা অর্জ্জিত হয়, কর্ম্ম দ্বারাই তাহা নষ্ট হইয়া থাকে। বিবাহ-সংক্রান্ত বাজে খরচগুলি যত কমান যায়,—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে ততই মঙ্গল।

স্ত্রীলোকদের গহনা পরার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এই ইচ্ছাকে রোগে পরিণত হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। কোন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রতি বৎসরই গহনা গড়া হইতেছে ও বৎসরান্তে তাহা ভাঙ্গা হইতেছে। যাহা আজ খুব সুন্দর বলিয়া গিন্নী গলায় বা হাতে পরিলেন, দুদিন না যেতে যেতে তাহা অরুচিকর হইয়া উঠিল, তখন সে জিনিষটা ছাড়িতে পারিলে বাঁচেন। এতদ্দ্বারা গৃহস্থ যেরূপ বিব্রত হইয়া পড়েন, তাহা আর কি বলিব! সোনা ভাঙ্গিলে সেই সোনার অর্দ্ধেক পাওয়া যায় না, পা'ন্ তো আছেই, মজুরীতেও অনেক লোক্সান্ হইয়া থাকে। অনেক দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েদের এই ক্রমাগত রুচিবিকারে অস্থির হইয়া পড়েন। সর্ব্বদা পরিবার মত টেক্সই কয়েকখানি গহনা গায়ে থাকিলেই যথেষ্ট। সেক্রার কেটালগ্ দেখিয়া বা নিমন্ত্রণ খাইতে যাইয়া উচ্চদরের রুচি পরীক্ষা বা নির্ব্বাচন করিবার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, নিজেদের কি অবস্থা; এবং নিজের

স্ত্রীলোকদের গহনা পরা

গহনা যেরূপ হইবে, দেবরপত্নী কিংবা ননদিনীকে হয় ত সেইরূপ দিতে হইবে, তাহা হইলেই গহনাতে সমস্ত ঘর আলো করিবে,—নতুবা গহনায় ঘরের এক কোণ আলো হইবে, আর এক কোণের আঁধার বাড়িবে,—তাহা ভাল নহে। রুচি-পরিবর্ত্তনের পথে গৃহিণীর চলা ভাল নহে। ভদ্র গৃহস্থ-ঘরে এই রুচি-বিকার প্রবেশ করিলে যে দুর্গতি উপস্থিত হয়, তাহা সকলেই জানেন। ভরতমিলন যাত্রায় শুনিয়াছি, চিত্রকুট পর্ব্বত হইতে রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরত সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "আমার হাতের কেয়ূর, কঙ্কণ লইয়া যাও,—শ্রীরামের পদসেবাই আমার হাতের আভরণ হইবে।"—মেয়েদের এই সেবা ধর্ম্মই প্রকৃত অলঙ্কার। সেই সেবায় তাঁহারা যেরূপ সুন্দরী হন, কোন গহনা তাঁহাদিগকে সেই সৌন্দর্য্য দিতে পারে না।

পুরাতন গহনা ভাঙ্গিতে আমার সর্ব্বদাই আপত্তি। আমার মায়ের হাতের কঙ্কণ-জোড়া মৃত্যুর সময় আমাকে দিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি এই কঙ্কণ দিয়া ঘড়ীর চেইন করিয়া লইও।" আমি কখনই তাহা করিতে পারি নাই। সেই কঙ্কণ দেখা মাত্র মায়ের কোমল দুখানি হস্ত মনে পড়িয়াছে। সেই গহনাখানি আমার নিকটে পূজার সামগ্রীর মত হইয়া আছে, আমি কোন্ প্রাণে তাহা ভাঙ্গিব? দীর্ঘকাল যে গহনা মেয়েদের গায়ে থাকে, তাহা শুধু সোনার মূল্যে বিকায় না, তাঁহার সন্তান ও স্বগণদিগের কল্পনায় তাহা হীরা হইয়া যায়; পুত্রকন্যারা তাহা পাইয়া ধন্য হয়। ইহা তাহাদের বহুমূল্য উত্তরাধিকার, ইহার মূল্য সোনার বাজার-দর নহে। এখনও বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের ছেঁড়া কাঁথাখানি দেখিবার জন্য পুরীতে যান,—সেইরূপ একটা ভাব লইয়া আমি মাঝে মাঝে আমার মায়ের কঙ্কণজোড়া বাক্স হইতে খুলিয়া দেখি। উহাতে মারধ'রের সঙ্গে কত উপাদেয় খাদ্য ও প্রসাদের কথা মনে পড়ে। এক পাগল আমাদিগের বাড়ীর

কাছে থাকিত। শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে শশী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতেই অনেক সময় তাহার আড্ডা ছিল। তাহার মাথা অনেক সময় বেশ ঠিক থাকিত। একদিন সেই অবস্থায় আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আপনি কেন পাগল হইলেন ?' সে বলিল, "সে বড় দুঃখের কথা, মহাশয়, আমার মা, বাপ, ভাই, ভগিনী, কেহ ছিল না, আমি শ্বশুর-বাড়ী থাকিতাম,—৪০৲ মাহিনায় পোষ্ট আফিসে চাকুরী করিতাম। বহুকষ্টে ১৫০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রীকে একজোড়া সোনার বালা গড়িয়া দিয়াছিলাম। আমি সারাদিন আফিসে খাটিতাম, কিন্তু আমার মন পড়িয়া থাকিত আমার স্ত্রীর সোনার বালা-পরা দুখানি হাতের উপর; কতক্ষণে যাইয়া তাহা দেখিব। আমি রোজ রোজই সেই আনন্দে বিভোর থাকিতাম। একদিন যাইয়া দেখিলাম, আমার শ্বশুর সেই বালা-জোড়া বন্ধক দিয়াছেন;—তখন বুদ্ধি-লোপ হইল, শ্বশুরকে কাটিতে গেলাম, তাঁহাকে বাঁচাইতে যাঁহারা আসিয়াছিল, তাহাদিগকেও কাটিতে গেলাম, তারপরে কি হইয়াছিল মনে নাই—তদবধি এই ভাবে আছি।" প্রিয়জনের ব্যবহৃত অলঙ্কার এতই আদরের। সে গুলি ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িলে—প্রীতি-চিহ্নগুলি সত্য সত্যই দুর্দ্দশা-প্রাপ্ত হয়।

এক পাগলের কথা

অনেক গৃহস্থের অবস্থা ভাল, কিন্তু বাড়ীর মেয়েদের কোন গহনা দেন না। অর্থ সঞ্চয় যেখানে রোগ হইয়া দাঁড়ায়, আমরা সেখানে উহার পক্ষপাতী নহি। যাঁহারা ঘরে সেবাব্রত ধারণ করিয়া সকলের জন্য দিনরাত খাটিতেছেন, ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাঁহাদের যতটা মনোরঞ্জন করিতে পারা যায়, তাহা করা উচিত,—তাহা হইলেই গৃহ-দেবতা সন্তুষ্ট থাকেন। বড় মানুষের বাড়ীতে যদি কোন স্ত্রীলোক সোনার গহনাকে থালাবাটি বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া

গহনা না দেওয়া

করিয়া কেবল হীরা-জহরতের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়া থাকেন, সাধারণ গৃহস্থের ঘরে সেরূপ নজির কখনই উপস্থিত করা উচিত নহে! তাই বলিয়া সুন্দর পদ্মকলির মত হাত দুইখানি খালি ও সুন্দর গলায় একটি ছোট হারও নাই, এ দৃশ্য দেখিলে সকলেরই কষ্ট হইয়া থাকে।

কোন কোন গৃহিণী শোকদুঃখ পাইয়া অবশিষ্ট দু-একটি পুত্রকন্যার প্রতি এত অধিক স্নেহাতুরা হন যে, পরিণামে সেই স্নেহই তাঁহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। একজনের কথা জানি, তিনি এই ভাবে ছোট ছেলেটির প্রতি এত অধিক মমতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, সে আদরে একবারে মাটী হইয়া গেল। সে গুরুতর অপরাধ করিলেও কখনও তিনি তাহাকে ভৎসনা করিতেন না,—যখন সে টাকা চাহিত, নিজের গহনা বন্ধক দিয়া তাহাকে তাহা দিতেন;—সে টাকা যে, সে নরককুণ্ডে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে, তাহা জানিয়াও তিনি টাকা দিতে বিরত হইতেন না।

শোকার্ত্ত মাতার স্নেহের বাড়াবাড়ি

একদিন আমার সম্মুখে সেই যুবক মাতার নিকট ২৬টি টাকা চাহিল—শার্ট কিনিতে। তাহার মাতা বলিলেন, 'বাপু, এত টাকার শার্ট কিনিবার দরকার কি, এই পাঁচটা টাকা নে।' যুবক তখন নিজের চাদর জড়াইয়া নিজের গলায় বাঁধিল এবং তাহা পাকাইতে পাকাইতে বলিল, 'এই দেখ, আত্মহত্যা করিতেছি।' মাতা তখনও বলিলেন, '১০৲ টাকা দিতেছি।' যুবক গলে চাদর আরও পাকাইয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিল, '২৬৲ টাকার এক পয়সা কম নহে।' বলা বাহুল্য ২৬৲ টাকা তখনই হাজির হইল,—পুত্র চাদরের মোড়া খসাইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

এইরূপ স্নেহ-গুণে যখন পুত্রের লিভার পাকিয়া সে মরণাপন্ন হয়, তখন স্নেহাতুরা কি করিয়া থাকেন? এই স্নেহের ফলে যখন পুত্র চুরি করিয়া

জেল খাটে, তখন মাতা কি করেন? এই স্নেহের গুণে যখন পড়াশুনা ছাড়িয়া পুত্র বোম্বেটে হইয়া অলিগলির নর্দ্দমায় পড়িয়া ছুঁচোর পদাঘাত খান, তখন জননী কি করেন? ছেলেকে অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে এই স্নেহ উপায় নহে, ইহাই তাহার অকাল-মৃত্যুর পথ।

(মূল কথা, ভগবান্‌কে যখন মানুষ একেবারে ভুলিয়া যায়—তখনই বিপদ্ সামলাইতে যাইয়া বিপদ্‌কে স্বয়ং মাথায় করিয়া আনে; তখন চিত্ত এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, সে তৃণ ধরিয়া সমুদ্র পার হইতে চাহে এবং একটা সূতা হাতে করিয়া মনে ভাবে, এইবার হাতীটা বাঁধিয়া ফেলিব। যে থাকে যে যা'ক্—তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া আমার যতটা সাধ্য, আমার যতটা উচিত, তাহাই করিব। মাথা খুঁড়িয়া সংসারটা নিজের ঠিক ইচ্ছার মত তাড়াতাড়ি যিনি গড়িতে চাহিবেন, সংসার তাঁহার নিকট ভীষণ হইয়া দাঁড়াইবে।

দরকার হইলে যেরূপ নিজের অঙ্গ কাটিয়া ফেলিয়া প্রাণ বাঁচাইতে হয়, সেইরূপ প্রয়োজন হইলে ভাই, এমন কি, নিজের ছেলেকেও বাদ দিয়া সংসার চালাইবার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। এমন দুই এক হতভাগ্য সংসারে দেখা যায়, যেখানে মদ্যপান ও চরিত্রহীনতার দরুণ সংসারটি প্লেগাক্রান্ত ঘরের ন্যায় হইয়া আছে। ভ্রাতাদের অধিকাংশ যদি মদ্যপায়ী হন, এবং প্রকাশ্যভাবে দুর্নীতি বা চরিত্র-হীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং যদি তাঁহাদের সংশোধনের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে, তবে সেইরূপ সংসর্গে আপনার অল্প-বয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে রাখা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

কুসংসর্গ ত্যাগ

প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা ভ্রাতাদের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে, নিজের ছোট ছেলেদের প্রতিও কর্ত্তব্য আছে। প্রাপ্তবয়স্ক অসচ্চরিত্র স্বগণের কুদৃষ্টান্তে ও কুব্যবহারের ফলে ছেলেদিগকে জঘন্য ভাষা ও জঘন্য ব্যবহার শিখিবার

সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। আগুন লাগিলে যেরূপ মানুষ বাস-গৃহখানি ছাড়িয়াও নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া থাকে, সেইরূপ নৈতিক অধোগতির চূড়ান্ত হইলে, একান্ত স্বগণ ব্যক্তি হইতেও দূরে থাকা উচিত। তাহাকে সংশোধনের চেষ্টা ও তাহাতে সাহায্য, এই সকলই একটু দূর হইতে করিতে হইবে। টীকা হয় নাই, এমন ব্যক্তিকে যেরূপ বসন্তের রোগীর সেবা হইতে দূরে রাখিতে হয়—অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগকেও তদ্রূপ বাড়ীতে সেইরূপ কুদৃষ্টান্ত হইতে দূরে রাখা সঙ্গত।)

দাম্পত্য-জীবন

বিবাহ জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা। কারণ, বিবাহে শুধু স্বামী ও স্ত্রী সুখী বা অসুখী হন, এমত নহে,—তাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহার সেই সুখ-দুঃখের ভাগ পাইয়া থাকেন। বিবাহের পর কোন গৃহ আনন্দের ছবির মত হইয়া দাঁড়ায়, কোথাও বা সমস্ত স্নেহ-মায়ার চিতানল জ্বলিয়া গৃহখানি স্বার্থের একটা নরক হইয়া দাঁড়ায়। বিবাহের পর ছেলে ও মেয়ে হয়, তাহাদের চরিত্র, ভাবী জীবন ও ব্যবহার অনেক পরিমাণে পিতা-মাতার উপর নির্ভর করে। সাত পুরুষ পূর্ব্বে, বংশের কোনও ব্যক্তি বিবাহ করিয়া যে শুভাশুভের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্তও সেই বংশ সেই ফলভোগের হাত এড়ায় নাই। আজ বিবাহের সময় আঙ্গিনায় যে শাঁক বাজিয়া উঠিল, তাহার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কত যুগ চলিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিবাহের ব্যাপক ফল

এই ঘটনার স্রোত যে কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিল, সেই ব্যাপারকে শুধু কৌতুক ও রঙ্গরসের বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত নহে; ইহা অতি গুরুতর ঘটনা। স্বামী স্ত্রীর রূপ ধ্যান করিতেছেন এবং স্ত্রী স্বামীর মুখখানি কেমন তাহাই ভাবিতেছেন, এই রূপ-লালসা অনেকে আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম মনে করেন। কিন্তু যিনি জীবনের সঙ্গিনী, তাঁহার বাহিরের রূপের কথা ২।৪ বৎসরের মধ্যে স্বামীর মন হইতে চলিয়া যাইবে, তাঁহার চরিত্রের যে রূপ, তাহাই তখন ভাবনার বিষয় হইবে। চাঁদ যে এত সুন্দর, আমরা কি নিত্যই মাথা উঁচু করিয়া চাঁদের শোভা দর্শন করিয়া থাকি? প্রতিনিয়ত যাহা দেখি, তাহার বাহিরের রূপের কথা আর মনে থাকে না, তাহা একান্ত সহজ হইয়া যায়। কত রূপের ভিতর কুরূপের কথা আমরা জানি। কিন্তু আমরা বলিতে চাই না যে, রূপের কোন আদর নাই। জগৎ যাহার আদর করিতেছে, আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিব কিরূপে? কিন্তু সংসারে গুণেরই আদর বেশী হওয়া উচিত। গুণবান্ ও গুণবতীর মিলন গুণহীন রূপবান্ ও রূপবতীর মিলন হইতে শ্রেষ্ঠতর, ইহাতে সন্দেহ নাই।

রূপ ও গুণ

স্ত্রী সম্বন্ধে স্বামীর অনেক আশা-ভরসা থাকে এবং স্বামী সম্বন্ধে স্ত্রীর আদর্শও খুব বড় রকমের থাকা আশ্চর্য্য নহে। যেখানে দুই পক্ষেরই এইরূপ বাড়াবাড়ি রকমের ধারণা থাকে, সেখানে উভয়ের মন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। দাম্পত্যপ্রেম ক্ষমার ভিত্তির উপর দাঁড়-করাইতেই হইবে; কেবল তাজমহলের স্বপ্ন দেখিলে নিজের কুঁড়ে ঘরের উপর অশ্রদ্ধার ভাব আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের এটা জানা উচিত যে, আমাদের স্বপ্ন দেখিয়া সংসার করা মোটেই চলে না। আমাদের কুঁড়ে-ঘর যদি সামান্য হয়, তবুও সেইখানে আমাদের বাস করিতে হইবে; বাঁশ ও

স্বপ্নের দেশ ও বাস্তব-রাজ্য

বেতের বেড়া না ভাঙ্গে, তাহাই দেখিতে হইবে, ততক্ষণ যাঁহারা সোনার থামের কল্পনা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন—তাঁহারা মোটেই সুখী হইতে পারিবেন না।

ভাগ্যদেবী যাঁহাকে ঘরে আনিয়াছেন, তিনি আমার সুখের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য ঘরে আসিলেন—ইহা মনে যেন না হয়। স্ত্রী পুরুষ যদি উভয়ে সংযত হন, এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের প্রেম যেরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইবে, যাঁহারা শুধু আকাশ-কুসুমের শোভা দেখিতে চাহিবেন, তাঁহাদের প্রেম সেখানে দাঁড়াইবে না। স্বামীর ব্যবহারের অসংযমের পথে স্ত্রীকে পদে পদে বাধা দিতে হইবে। যাঁহারা তাহা না করিয়া স্বামীকে নিজেরাই সর্ব্ববিষয়ে অন্য পথের দিকে লইয়া যাইয়া তাঁহার প্রেয়সী হইতে চেষ্টা করিবেন, শেষকালে তাঁহাদের উপর স্বামীর কোন শ্রদ্ধাই থাকিবে না, এবং যে সকল বিষয়ে স্ত্রীর স্বামীকে বাধা দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা দেন নাই, অনেক সময় দেখিবেন, সেই সকল বিষয়ই গার্হস্থ্য-সুখের পরম বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বামী যদি ছোট ভাইটিকে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করেন ও দুর্ব্ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বদা পিতামাতারই মনে ব্যথা দেন, তবে স্ত্রী স্বামীর সাময়িক ক্রোধ সহ্য করিয়াও বাধা দিবেন, তাহার ফলে স্বামী স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবেন। স্ত্রী স্বীয় প্রেম দ্বারা স্বামীর বাক্য ও ব্যবহারের অসংযমে বাধা দিবেন, তবেই সংসারে তাঁহার সম্মান অটুট্ থাকিবে।

সংযমের পথ

স্বামীই স্ত্রীর সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। স্বামীর কথা স্ত্রী বেদ-কোরাণের মত মানিয়া চলিবেন, এইরূপ কতকগুলি চাণক্য-নীতি আমি প্রচার করিতেছি না। কিন্তু হিন্দুর ঘরে যখন স্বামীর উপরই স্ত্রীর সুখ-দুঃখ সর্ব্ববিষয়েই নির্ভর করে, তখন তিনি ঠাকুর দেবতার স্থানীয় হইয়া আছেন,

সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবন্ত ঠাকুরের ব্যবহার খারাপ হইলে স্বাভাবিক নিয়মেই স্ত্রীর শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতে পারে। প্রকৃত ভালবাসা কোন একটা বড় পদে বসিলেই দৌরাত্ম্য করিয়া আদর করা যায় না। রাজতক্তে যিনি বসিয়াছেন, তিনি জোর করিয়া প্রজার সর্ব্বস্ব লইতে পারেন, কিন্তু একটা জায়গার উপর তাঁহার কোনই অধিকার থাকে না, তাহা প্রজার হৃদয়; সে জিনিসটা সকল সময়ে সমস্ত ক্ষতি ও ফলাফল অগ্রাহ্য করিয়াও আত্মদান করিতে অস্বীকার করে।

পদের মান রাখা

সুতরাং যে স্থানটি লাভ করিলেন, তাহা খুব উঁচু, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি উঁচু স্থানে বসিয়া যেন নীচু কাজ না করেন, ইহা দেখিতে হইবে; নতুবা পদোচিত মর্য্যাদা তিনি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবেন না। স্ত্রী তাঁহাকে অবশ্য সংসারের সকলের অপেক্ষা বড় মনে করিবেন। বড় বই কি? যিনি বিরূপ হইলে লোক-চক্ষে সত্য-সত্যই তিনি হতভাগিনী হন,—যাঁহার অভাব হইলে, সংসারে তাঁহার থাকা না থাকা সমান, তাঁহার চাইতে বড় আবার কে? বিবাহের ফলে তাঁহাকে পাইয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে সমগ্রভাবে কিরূপে পাইবেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

বিবাহের প্রথম কয়েক বৎসর এক ভাবে কাটিয়া যায়, কিন্তু মধুমাসে বড় শান্তির মলয় বহিতেছে দেখিয়া নাবিকের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। হঠাৎ ঝাপ্‌টা বাতাস আসিয়া তরী ডুবাইয়া দিতে পারে। প্রথম হইতে সর্ব্ববিষয়ে সংযত থাকিলে বিপদের আশঙ্কা কম থাকে।

পুরুষ প্রবল, সুতরাং অনেক সময়ে স্বামী অত্যাচার করিতে পারেন; স্ত্রী স্বাধীনা নহেন,—সেই অত্যাচারের হাত এড়াইবার জন্য তিনি মিথ্যা

কথার আশ্রয় লইতে পারেন ; এই দুই-ই স্বাভাবিক। স্বামীর অত্যাচার ভাল নহে, স্ত্রীর মিথ্যাচরণও তদ্রূপ। স্বামীর মন বুঝিয়া তাহার অনুকূল পথে স্ত্রী চলিতে চেষ্টা করিবেন ; যদি কখনও ভুল হয়, তবে স্বামীর নিকটে তাহা গোপন করিবেন না ;—সত্যবাদিনী স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রদ্ধা হইবে। একবার যদি স্বামী বুঝিতে পারেন, তাঁহার স্ত্রী সত্য কথা বলেন না, তবে সংসারে যে আশ্রয়-তরু বিশ্বাস, তাহার মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে। উত্তেজনার সময় স্বামী যদি জিজ্ঞাসা না করেন, তবে কোন অপ্রিয় সত্য তাঁহার নিকট ক্ষণকালের জন্য গোপন রাখা মন্দ নহে, কিন্তু সেই কথা দীর্ঘকাল তাঁহার নিকট গোপন রাখিবেন না। স্বামী যদি একবার বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন এবং বুঝিতে পারেন যে, স্ত্রীর কথায় আস্থা দেওয়া যায় না, তবে স্বাভাবিক প্রেমে ব্যাঘাত পড়িবে। যিনি ক্ষমাশীল, তিনি স্ত্রীর প্রতি কুব্যবহার করিবেন না ; কিন্তু মনে মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইবেন, এবং বাহিরের সৌজন্য দেখা-ইয়াও তাঁহার প্রতি প্রাণের অনুরাগ রক্ষা করিতে পারিবেন না। আর যদি স্বামী উগ্র হন, তবে এইরূপ মিথ্যাচরণের ফলে স্ত্রীর প্রতি ভৌতিক অত্যাচারের আরম্ভ হইবে, কিংবা এইরূপ ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ ও বীতরাগ হইয়া স্বামী নৈতিক অধোগতির পথে ধাবিত হইবেন। রমণীর প্রেমরূপ পবিত্রতায় মিথ্যাচরণের কলুষ মিশ্রিত করিলে, এই সকল কুফল জন্মে।

অত্যাচার ও মিথ্যাচার

স্ত্রীলোকের একটা প্রধান কর্ত্তব্য বাক্য-সংযম। স্বামী যদি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইয়া কোন কথা বলেন, তবে স্বামীর উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া স্ত্রীর নিরস্ত হওয়া উচিত। কেহ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাহাকে বুঝাইতে যাওয়া নিষ্ফল। যখন ঝড় বহিতে থাকে, তখন বাধা দিলে উহা আরও ভয়ানক হয়। সুতরাং শুধু স্বামি-স্ত্রী বলিয়া নহে,—কেহ কাহারও প্রতি যখন ক্রুদ্ধ হন,—সেই সময় অপর

বাক্য-সংযম

পক্ষের ধৈর্য্য অবলম্বন শ্রেয়ঃ। কথার উত্তরে কথা বলিলে তাহা অনেক সময় বড় ভীষণ ভাব ধারণ করে; এই ভাবে কোন কোন পরিবারে খুনো-খুনি মারামারির সৃষ্টি হইয়া থাকে। কোনও জায়গায় দেখিয়াছি যে, (যখন সুবুদ্ধি স্বামী বুঝিলেন, কোনও সময় রাগ করিয়া একটা কথা বলিলেও স্ত্রী সহিবেন না—তখন তিনি একবারে নীরব হইয়া পড়েন—এই ব্যাপারে যে অনুরাগের সূত্র ছিঁড়িয়া যায়, তাহা অনেক স্থলে আর জোড়া লাগে না। কবি লিখিয়াছেন, "ইক্ষুর ফল হইলে তাহা না জানি কত মধুর হইত।" স্ত্রীলোকের যদি বাক্য-সংযম থাকিত, তবে অনেক সংসারের পক্ষে তাহা হইতে শতগুণ মিষ্ট হইত, সন্দেহ নাই। অনেক জ্ঞানহীনা মুখরা রমণীর হাতে শেষ-বয়সে স্বামীরা জব্দ হন; কারণ, স্ত্রীলোক শীলতা ত্যাগ করিয়া সুর উঁচুতে উঠাইলে তাহা যতদূর উঠে, পুরুষ ততটা উঠাইতে সাহসী হন না, কারণ, তাহা হইলে পাড়ায় একটা দস্তুরমত হট্টগোল উপস্থিত হয়, ভয়ে পুরুষবর নিরস্ত হইয়া পড়েন।)

বাক্য-সংযমের ফলে অনেক স্ত্রীলোক প্রতিকূল অবস্থায়ও গৃহস্থালীটি বেশ চালাইয়া যাইতে পারেন, অন্যথা তাহা অচল হইত। স্বামী যদি সহসা উত্তেজিত হইয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন স্ত্রী তাঁহার জিহ্বার বল্‌গাকে খুব টানিয়া না ধরিলে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। আমার এক বন্ধু অতিশয় সৎস্বভাব দয়ার্দ্র-হৃদয় চরিত্রবান্ এবং পরের দুঃখ দেখিলে তাহা আপনার দুঃখ বলিয়া মনে করেন। তিনি ঈশ্বরভক্ত এবং সর্ব্ব-বিষয়ে অনেকটা সাধুর ন্যায়; কিন্তু নিজ বাড়ীতে তাঁহার মেজাজ মাঝে মাঝে হঠাৎ চটিয়া যায়, তখন সেই সহজ লোকটি যেন ভূত হইয়া ঘরে ঢোকেন। স্নান করিবার ঠিক পরেই যদি তিনি ভাত না পান, তবে রক্ষা নাই; একটা লোহার গরাদ লইয়া খান্ খান্ করিয়া ভাতের হাঁড়িগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। প্রায়ই এরূপ হয় দেখিয়া গৃহিণী পিতলের ডেগ ও হাঁড়ীর ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু

সেগুলির কতক কতক এখনও টিকিয়া আছে সত্য, কিন্তু একেবারে তুব্‌ড়ে-মুব্‌ড়ে বেহাল হইয়া আছে। কয়েক দিন এই ভদ্র-লোকটি দেখিলেন যে, বাড়ীতে ভাত ব্যঞ্জন কিছু কিছু নষ্ট হইতেছে; সেগুলি পাতে বেশী পড়াতে ঝি ঝাঁট দিয়া, বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিতেছে; কতক পরিমাণ দুধ বাটিতে পচিয়া আছে, গৃহিণী তাহা লক্ষ্য করেন নাই। দু একদিন সতর্ক করিয়া দেওয়াতে, যখন তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিলেন না, তখন হঠাৎ রুদ্রদেব তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া সংহারমূর্ত্তি ধরিলেন। তিনি বাড়ীর মেয়েদের ডাকিয়া বলিলেন, "এস তামাসগির সব, ভাল ভাল তামাসা দেখাইব।" তখন হ্যামিল্টনের বাড়ীর ভাল সোনার ঘড়িটি পাথরের উপর আছড়াইয়া ভাঙ্গিলেন, ভাল মোহিনফ্লুটটি দোতলা হইতে টান মারিয়া নীচে রকের উপর এমন জোরে ফেলিয়া দিলেন যে, সে বেচারী একটা বেসুরে তান ধরিয়া তাহার শেষ বাজনা বাজাইয়া লীলা সাঙ্গ করিল। বন্ধুবর হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, "আমি কি আর জিনিষ নষ্ট করিতে জানি না? কেবল কি তোমরাই জান? আমি এক ঘণ্টায় যাহা নষ্ট করিব, তোমরা এক বৎসরে তাহা কর দেখি?"

এমন সকল ভৌতিক কাণ্ড সহ্য করিয়াও মাঝে মাঝে গৃহিণীকে জিহ্বা সংযত করিয়া রাখিতে হয়। নতুবা এক পক্ষের কছরত দেখিয়া যদি অপর পক্ষ তাহা হইতেও বড় খেলোয়াড় হইতে চাহেন, তবে সংসারটি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে!

মোটামুটি ক্ষমাগুণের উপরই সংসারের প্রীতি ও সদ্ভাব স্থায়ী হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক স্বামীর ব্যবহার লইয়া দোষ-অনুসন্ধিৎসু হইবেন না।

দোষ-সন্ধান

যাহা দোষ বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে কেবলই খুঁজিবেন না, কারণ যত দোষ খুঁজিবেন, ততই পাইবেন। বেদেরা যেখান সেখান হইতে সাপ বাহির করিতে পারে।

সেই দোষগুলি বাহির করিয়াও তাহা লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া কি লাভ? তাহার দংশনজ্বালায় নিজেরাই পুড়িয়া মরিবেন। যে সকল দোষ—যথা স্বামীর উপেক্ষা বা ভালবাসার ত্রুটি—শুধু স্ত্রীরই কষ্টের কারণ; সে সকল দোষ তিনি উপেক্ষা করিবেন, তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না। তাহা লইয়া কলহের সৃষ্টি করিলে সে দোষগুলি বাড়িয়া চলিবে। যাহা উপেক্ষা ছিল, তাহা ঘৃণায় পরিণত হইবে। ভালবাসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী একেবারেই বক্তৃতা ভালবাসেন না, কেহ কহিয়া বলিয়া কাহাকেও প্রেম শিখাইতে পারেন নাই। (স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য তিনি নীরবে করিয়া যাইবেন; কেহ ইচ্ছা করিলে হাতে স্বর্গ পাইতে পারেন না। স্বামী যদি সেরূপ আদর না করেন, তবে ভগবানের আদরের জন্য লালায়িত হইবেন। তিনি প্রসন্ন হইলে হয় ত স্বামী স্বীয় দোষ নিজেই বুঝিবেন।)

অনেক স্ত্রী সন্দিগ্ধ-চিত্ত। স্বামীর ভালবাসা যদি মনের মত না পান, তবেই সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু সন্দেহ ভাল নহে; কারণ যাঁহাকে সন্দেহ করিবেন, তাঁহাকে কিছুতেই শোধরাইতে পারিবেন না। সন্দেহ অন্ধ; তাহার চক্ষু নাই, সুতরাং আঁধারে রজ্জুকে সর্পভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপে অনেক সময় যাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে; সেই সকল অভিযোগ উপস্থিত করিলে স্বামী নিতান্তই ক্রুদ্ধ হইয়া যাইবেন। যদি বা কোনকালে সেই স্বামী প্রকৃত অপরাধী হইলে তাঁহার অনুতপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সন্দেহের বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে সে সম্ভাবনা থাকিবে না। স্বামী কোন্ সময়ে কি করেন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ লইয়া কল্পনার অশ্বের বল্গা ছাড়িয়া দিলে শেষে বাস্তবরাজ্যের প্রেত-পুরীতে উপস্থিত হইবে। ফুলের শয্যায় শুইয়া মনে হইবে, যেন কাঁটা পাতা আছে। নিজের সুখ অতিরিক্ত পরিমাণে খুঁজিতে গেলেই সন্দেহের উদ্রেক হয়। মনে হয়, হায়, বুঝি

সন্দিগ্ধা স্ত্রী

সম্পূর্ণরূপে পাইলাম না। তাহা না করিয়া যদি এটা মনে করা যায়, আমি সংসারে দিতে আসিয়াছি—কিছু নিতে আসি নাই; আমি ভোগ করিব না, ত্যাগ করিব; আমি ভালবাসা চাহিব না, দিব; তখন বুঝিবেন যে, সন্দেহের নর্দ্দমার জল হইতে উঠিয়া গঙ্গাজলে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়াছেন কি না। সংসারে বাস্তব দুঃখের অভাব নাই, শত শত বৃশ্চিক পথের মধ্যে পড়িয়া আছে, তাহারা দংশন করিতেও ছাড়ে না;—এই অবস্থায় কল্পনার সর্প প্রস্তুত করিয়া তাহার দংশনে জর্জ্জরিত হওয়া কি ভাল? সন্দেহের সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ কল্পনা করিয়া লোকে তাহা হইতে এমন একটা অকাট্য সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে দাঁড় করায় যে, কিছুতেই মনে হয় না যে, সন্দেহ ভুল। এইরূপ ধারণার ফলে লোককে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিয়া বিচারক শেষে দেখিয়াছেন যে, তাঁহার ধারণাগুলি ভুল ছিল, তখন অনুতপ্ত চক্ষের অশ্রু মুছিয়াছেন। এমন অসার ভিত্তির উপর অশান্তির মঠ স্থাপন করিবেন না।

যদি সত্যই সন্দেহের কারণ থাকে, তবে তাহা দাম্পত্য-জীবনে উপেক্ষা করিয়া যাওয়াই উচিত; কারণ, সন্দেহতরু হইতে কখনও প্রেম উৎপন্ন হয় নাই, ক্ষমা কল্পতরু হইতে তাহা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সন্দেহের দ্বারা যে অপরাধ প্রকৃতপক্ষে ছিল না, তাহারও সময়ে সময়ে উৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে।

স্বামী যেরূপ ভালবাসেন, স্ত্রীকে যথাসম্ভব সেইরূপ চলিতে হইবে; তাহা যদি ঠিক সঙ্গত না হয়, তথাপি স্ত্রী যদি তাহাতে বিরক্তির সহিত বাধা দেন, তবে অনেক সময় তাহা হইতে আগুন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার করিবে। কোন কোন স্বামী অত্যন্ত

কৃপণ-স্বামী

কৃপণ, তিনি সকল সহ্য করিতে পারেন, কেবল ব্যয়াধিক্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হন। যাহা নিতান্ত দরকারী, তাহা হইতে তিনি সংসারকে বঞ্চিত করিয়া রাখেন। অবস্থা খারাপ হইলে অবশ্য বাধ্য হইয়া লোককে নানা

কষ্ট অসুবিধা সহিয়া থাকিতে হয়; কিন্তু যদি অবস্থা স্বচ্ছল হয়, তবে কার্পণ্যহেতু বাড়ীর সকলেই মিথ্যামিথ্যি কষ্ট পাইয়া থাকেন। আমি একজনকে জানি, তিনি খরচের টাকা চাহিলে অতি সূক্ষ্ম হিসাব করিতে বসিতেন। বাড়ীর ভিতর হইতে দরকারী জিনিষের যে ফর্দ্দ আসিল, তাহাতে একদিন এক পয়সার হলুদের উল্লেখ ছিল। গৃহস্থটির হিসাব সম্বন্ধে অসাধারণ মেধা ছিল। তিনি বলিলেন, "র'স—বুধবার দিন এক পয়সার হলুদ আনা গিয়াছে; বৃহস্পতি, শুক্র, আজ শনিবার। আরও একদিন সেই হলুদে যাওয়া উচিত ছিল।" এইভাবে প্রত্যেকটি বিষয় লইয়া খেচাখেচি এরূপ হইত যে, শেষে যাঁহারা মৃদুস্বরে কথা কহিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের সুর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে ও সেদিন রাগারাগির ফলে রান্নাবান্না বন্ধ থাকিত এবং ছেলেরা না খাইয়া স্কুলে যাইত। হিসাবের দিকে একটা চোখ রাখা উচিত, কিন্তু দিনরাত্রি যিনি হিসাব লইয়া নাড়া-চাড়া করিবেন, তিনি যক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার রাত্রে ঘুম হইবে না ও অগ্নিমান্দ্যের সৃষ্টি হইবে।

কোন কোন কৃপণ গৃহস্থ বলেন—"যাহা উচিত, তাহাই ব্যয় করিব, তদতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও নহে।" পূজার সময় ছেলেদের কাপড় দিবেন না, তাহাদের যে কাপড় আছে, তাহার সমস্তগুলি ছিঁড়িয়া যায় নাই। দীপান্বিতার দিন সকল ছাতে আলো দেয়, তাঁহার বাড়ীটি মাঝখানে একে-বারে আঁধার থাকিয়া 'হংস মধ্যে বক' হইয়া থাকে। বাড়ীতে কোনও রূপ উৎসব হইবার উপায় নাই। ছোট ছোট মেয়েদের হাতে কোন গহনা নাই, মিলের সাড়ী ছাড়া তাহারা আর কিছু পরিতে পায় না; এ' সম্বন্ধে গৃহস্থ বলেন, "বিয়ের সময়ই ত কাপড়-চোপড় গহনা পাইবে, এখন আবার কি?" হয়ত অল্প-বয়সে মেয়েটি মারা গেল, তখন অপর বাড়ীর ছোট মেয়েরা গহনা ও ভাল সাড়ী পরিয়া আসিলে, সেই মেয়েটি যে মুখ ছোট

করিয়া থাকিত, তাহা মনে পড়িয়া মাতার চক্ষের জল দিনরাত পড়িতে লাগিল। যাহা কিছু লোকে সখ্ করিয়া পরে বা খায়, গৃহস্থ তাহার সকল গুলি হইতে বাড়ীটী রক্ষা করিয়া উহাকে সর্ব্বত্যাগী যোগীর মত দাঁড়-করাইয়া রাখেন। কিন্তু প্রকৃতি শুধু ক্ষেত্রের শস্য দিয়া পালন করেন না, —তিনি চক্ষুর আনন্দের জন্য শত শত ফুল ও তৃণপল্লব সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীর প্রতি কোণে বাহুল্য আছে; এই বাহুল্যের আনন্দ মানুষের মন সরস করিয়া রাখে। শুধু যাহা চাই, তাহা পাইয়া ক্ষুধার সময় অন্ন-জল ও শুইবার সময় বিছানা পাইয়া জীবনটি খাড়া থাকে মাত্র,—কিন্তু মানুষ আনন্দ চায়, নূতন কিছু চায়, এই অতিরিক্ত জিনিষগুলি পাইবার চেষ্টায়ই সে শ্রমকে শ্রম জ্ঞান করে না। সমস্ত অতিরিক্ত জিনিষ ঠেকাইয়া রাখিলে সে গৃহের উদ্যানে ফুলও ফুটিবে না, তাহার কুঞ্জে কোকিলও ডাকিবে না। বালকের হাতে খেলনা না দিলে, গিন্নীর হাতে মাঝে মাঝে ভাল খাওয়ার জন্য অতিরিক্ত কিছু খরচ না দিলে, স্কুলের লাইব্রেরীতে ছেলেকে বাজে বই পড়িবার চাঁদা না দিলে, বাড়ীতে দু একটা সুগন্ধি তৈলের শিশি ও সাবানের বাক্স না থাকিলে,—সে গৃহ কখনই পূর্ণতা পাইতে পারে না। এখন কথা এই যে, স্বামী যদি কৃপণ হন, তবে স্ত্রীর কি করা কর্ত্তব্য? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্ত্রী বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীকে বাধা দিলে সংসারে নিত্য নিত্যই কলহের সৃষ্টি হইতে পারে। চণ্ডীর নিকট ভক্তের প্রার্থনা এই— "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি চিত্তবৃত্ত্যানুসারিণীম্"—এখানে সুন্দরী স্ত্রীর জন্য কামনা নাই—তিনি যেন আমার মনে প্রীতি জাগাইতে পারেন, আমার মনের ভাব যেরূপ, তাঁহার প্রবৃত্তি যেন তদনুকূল হয়, এই প্রার্থনা। সুতরাং কৃপণ স্বামীর স্ত্রীকে কার্পণ্যে দীক্ষিত হইতে হইবে—সংসারের সুখ ও শান্তি যাহাতে থাকে,—তজ্জন্য তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে, স্বামীর প্রতিকূল আচরণ করিয়া তিনি তাহা কখনও করিতে পারিবেন না।

স্বামী যদি বোঝেন, স্ত্রী তাঁহার অনুকূল, তখন প্রীতি জন্মিবে। এই প্রীতির ফলে ধীরে ধীরে স্ত্রী স্বামীর কার্পণ্য সংশোধন করিতে পারিবেন। যে পর্য্যন্ত স্বামীর স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা না জন্মিয়াছে, সে পর্য্যন্ত উপদেশ বা বাধায় ফলোদয় হইবে না। স্বামীর হৃদয়ে ঢুকিয়া তাঁহাকে ভাল করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার হৃদয়ের বাহিরে থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার শত শত ন্যায়সঙ্গত কথাতেও তিনি কর্ণপাত করিবেন না। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর অনুকূল হইলে—তিনি সর্ব্বস্বরূপিণী হইবেন অসাধ্যসাধন হইবে, কৃপণ দাতা হইয়া বসিবে, তাহার থলিয়ার সূতা অনায়াসে খুলিয়া পড়িবে।

স্বামী যদি চরিত্রবিহীন হন, ইহা স্ত্রীর পক্ষে সাংঘাতিক, সেই পরিবারের পক্ষে সাংঘাতিক, কিন্তু বিপদ্ পড়িলে অবশ্যই আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইতে হইবে। যাঁহারা দিবারাত্রি এজন্য বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করিবেন—তাহার ফলে স্বামী কখনই শোধ্রাইবেন না।

চরিত্রহীন স্বামী

কেহ বা স্বামীকে জব্দ করিবার জন্য পরের নিকট নিন্দা প্রচার করেন। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে বাহিরের লোক তামাসাগির ভিন্ন কিছু নহেন। স্ত্রী স্বামীর নিন্দা গাইয়া এবং পরের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া স্বামীর প্রেমলাভ করিতে পারিবেন না, বরং তিনি তাঁহার মন হইতে ক্রমেই দূরে যাইয়া পড়িবেন। কোন কোন স্ত্রী স্বামীকে প্রীত করিবার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টায় নিজে অসংযত হইয়া পড়েন। অসংযতের নিকট অসংযম—উহা আগুনে ঘৃতাহুতি মাত্র; উহাতে স্বামীর চরিত্রের দোষগুলি আরও বাড়াইয়া তুলিবে। স্ত্রীর এ অবস্থায় তপস্বিনীর মত হইয়া থাকা উচিত। আহারে ব্যবহারে সংযত হইয়া স্বামীকে স্নেহের সহিত উপদেশ দেওয়া এবং অন্য ব্যক্তি তাঁহার নিন্দা করিলে যথাসাধ্য তাঁহার দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করা—এই মাত্র উপায় আমি জানি। যখন হিন্দু স্ত্রী কিছুতেই স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, তখন প্রেমের

দ্বারা তপস্যার দ্বারা তাঁহাকে ভাল করিতে চেষ্টা করিবেন। নিজে অসংযত ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইয়া অথবা নিন্দা প্রচার করিয়া বা নিন্দার প্রশ্রয় দিয়া নিজের ভাঙ্গা সংসারটি আরও ভাঙ্গিবেন মাত্র। স্বামীর যাহাতে স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, এইরূপ আচরণ করা উচিত। যে নিজে দোষী, সে নিজেকে সর্ব্বদাই হীন মনে করে। যখন সংসারে কোন বাধা না পায়, তখন বিবেক-বাণী তাহাকে বাধা দিয়া থাকে, সে নিজে লজ্জিত থাকে, কিন্তু স্ত্রী যদি তখন উগ্র-মূর্ত্তিতে গুরুমহাশয় সাজিয়া উপস্থিত হন, তখন স্বামীর মন হইতে ধীরে ধীরে সেই অনুতাপ ও লজ্জার ভাব দুর হইয়া যায়। প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠে, এবং সে কুকর্ম্মে আরও দৃঢ়রূপে রত হয়। কিন্তু সে যদি জানে, যাহার প্রাণে তাহার সেই ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাগিয়াছে, সেই স্ত্রী হৃদয়ের দুঃখ গোপন করিয়া হাসি-মুখে তাহার সেবা করিতেছে, তাহার নিন্দা না হয়—এজন্য প্রাণপণে দোষগুলি ঢাকিয়া রাখিতেছে,—সে তাহার সেবায় ও নিজের ভিতরকার কষ্টে ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে ও মধ্যে মধ্যে ইঙ্গিতে যে উপদেশ দিতেছে, তাহাতে তাহার প্রাণ খাক্ হইয়া যাইতেছে—তাহা হইলে স্বামীর ভাল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। যে দুয়ার দিয়া বিবেকবাণী তাহার কর্ণে পৌছায়, যাহা দিয়া স্বকর্ম্মের জন্য অনুতাপ-শিখা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দগ্ধ করে, স্ত্রীর প্রতি দয়া ও প্রেম সেই পথ দিয়াই নীরবে প্রবেশ করিবে। আমি বলিতে চাই না যে, যিনি এইরূপ করিবেন, তিনিই স্বামীকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। চৈতন্যদেবের মত লোকও উড়িষ্যায় কেশব সামন্তকে উপদেশ ও ভক্তির জীবন্ত রসধারা দিয়া উদ্ধার করিতে পারেন নাই। সুতরাং স্ত্রী সর্ব্বদাই যে স্বামীকে এই উপায়ে পাইবেন, তাহা বলিতে পারি না—তবে যদি পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে—তবে এই উপায়ে। যে পর্য্যন্ত আত্মকর্ম্মের ফল প্রকৃতির নিয়মে পাকিয়া না উঠে, সে পর্য্যন্ত বৃথা টানাটানি

করিয়া উহা পাকান যায় না। একদিনে আম, জাম, কাঁটাল কোন ফলই পাকে না, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত স্বাভাবিক বিধানে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় না আসে, সে পর্য্যন্ত অনেক সময় পরের চরিত্র শোধ্‌রাইবার চেষ্টায় ফলোদয় হয় না। যদি পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াও কোন স্ত্রী স্বামীকে সংশোধন করিতে না পারেন, তথাপি তাঁহার মনে আত্মতৃপ্তির নির্ম্মল সুখ জন্মিবে, সন্দেহ নাই। তিনি নিজ ব্যবহারে কোন অন্যায় করেন নাই, যাঁহার সহিত ভগবান্ তাঁহার ভাগ্য একসূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন,—তাঁহার ভালবাসার জন্য তিনি যথাসাধ্য করিয়াছেন, সেই চেষ্টায় তিনি দৃঢ়তা অবলম্বন করেন নাই, অপ্রিয়বাদিনী হন নাই—ঔদাসীন্য দেখান নাই এবং তপস্যার ত্রুটি করেন নাই। "যতন করিতে তারে বাকী কি রেখেছি আমি"—এ কথা তিনি বলিতে পারেন। আমরা যাহা পারিব, আমাদের যাহা কর্ত্তব্য—তাহাই ত করা উচিত, তদতিরিক্ত আমরা কি করিতে পারি? এবং যাহা আমাদের সাধ্যাতীত, তাহা না করার জন্য ভগবান্ কোন কালেই আমাদিগকে দায়ী করিবেন না।

কোন কোন স্বামী অনেক সময় স্ত্রীকে অকারণে সন্দেহ করেন—যাঁহার চিত্তবেগ প্রবল ও চরিত্র অতিরিক্ত পরিমাণে আগ্রহশীল তাঁহার স্ত্রী যদি কতকটা উপেক্ষার ভাব দেখান,—তবে তিনি যাহা দিয়াছেন, সেই পরিমাণে স্নেহ পান নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ থাকেন।

সন্দিগ্ধ স্বামী

অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, স্ত্রী সংসারের সকল লোকের সেবায় প্রাণপণে খাটিতেছেন, তিনি লজ্জার জন্য হউক কিংবা অন্য কোন কারণে হউক, স্বামীর প্রতি বাহিরে কতকটা তাচ্ছিল্য দেখাইতেছেন। বাড়ীর অপর লোকেরা যাহা করিতে বলিতেছেন, তাহা করিতেছেন, অথচ স্বামীর কথায় ততটা মনোযোগ দিতেছেন না। ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র বিষয়ে যাহাতে স্বামী স্ত্রীর কর্ত্তব্যের উপর দাবী রাখেন, যথা—তাঁহার কাপড়-চোপড় গুছাইয়া রাখা, কি যাহা যখন দরকার, ঠিক করিয়া রাখা—ইত্যাদি বিষয়ে স্ত্রী অমনোযোগী, অথচ অন্যান্য ব্যাপার লইয়া তাঁহার মনোযোগের অভাব নাই। স্বামী যখন এইভাবে পদে পদে স্ত্রীর তাচ্ছিল্য দেখেন, তখন তিনি স্নেহের প্রতিদান পান নাই ;—এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হয়। এইরূপ ভিত্তির উপর পরিশেষে সন্দেহ-তরুর উদ্ভব হইতে পারে। স্বামীর সন্দেহ-নিবারণের একমাত্র উপায়, স্ত্রী স্বামীর প্রতি বেশী মনোযোগ ও স্নেহ দেখাইবেন। সন্দিগ্ধ-চিত্ত পেচকের মত বসিয়া বসিয়া কেবল কুধ্যান করে,—কারণ, পেচক যোগী নহে যে, ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে,—সে তথাপি ধ্যান করে, তাহা কু বৈ কি ? সন্দিগ্ধ-চিত্তের এই ধ্যানের ফলে কত অসম্ভব কথা সম্ভবের মত হইয়া প্রতীয়মান হয়, অনেক সময় স্ত্রী যতই সাবধান হইবেন, ততই সন্দেহ বাড়িয়া চলিবে। স্ত্রীর ঘোমটা বেশী হইলে সে মনে করিবে, ইহা লজ্জার অভিনয় মাত্র, লোক দেখাইবার ভাণ। যদি ঘোম্‌টা কম থাকে, তবে তাহা প্রকাশ্য লজ্জাহীনতা, তাহারও কত অর্থ হইবে। স্ত্রী যদি ঘরে বসিয়া থাকেন,—তবে সে মনে করিবে, একাকী অপর হইতে দূরে থাকিয়া সে কি গুপ্ত-অভিসন্ধি করিতেছে ; যদি সকলের মধ্যে চলাফেরা করেন, তবে স্বামীর চক্ষু ডিটেক্‌টিভের ন্যায় স্ত্রীর ছায়ার পাছে পাছে ফিরিবে। স্ত্রী সাবধান হইয়া কি করিবেন ? রোগ যখন স্বামীর মনে, তখন তিনি বাহিরে চিকিৎসা করিয়া কি লাভ পাইবেন ? যাহার রোগ, তাহারই চিকিৎসার দরকার। এই সন্দেহের ফলে কত স্বামী পাগল হইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের একটি উকীল একদিন স্ত্রীকে প্রহার করিয়া আধমারা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সকলে যাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন, "আমি দেখিলাম, ঐ বাড়ীর জানেলা হইতে একটা লোক পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আমার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিল।

বলা বাহুল্য, তখন তিনি দস্তুর মত পাগল হইয়া গিয়াছেন,—কিন্তু এই পক্ষিরূপ কল্পনার কিছু নীচের শ্রেণীতে যে সকল স্বামী আছেন, তাঁহারা ঠিক পাগল হন নাই, কিন্তু তাঁহাদের অত্যাচার পাগলের অত্যাচার হইতে বেশী, কারণ, তাঁহাদিগের পায়ে বেড়ী দেওয়া যায় না।

স্ত্রীর একেবারে সাবধানতার প্রয়োজন নাই, বোধ হয়, এ কথা বলা ঠিক নহে, কিছু সাবধান তিনি অবশ্যই হইবেন। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় সাবধান হইলে স্বামীর রোগ বাড়িয়া যাইবে। দশজনে যাহা করে, তিনি যদি তাহা করিতে ভয় পান, তবে স্বামী সেগুলি পাপের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু স্বামী যদি প্রকাশ্যভাবে কিছু মানা করেন, স্ত্রীর তাহা না করাই ভাল; সন্দেহ-রোগের এক ঔষধ আমি জানি, তাহা অনেক সময় অব্যর্থ। স্বামীকে স্নেহ দেখান;—মিথ্যাচরণে সন্দেহ বাড়িয়া যাইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। মিথ্যাচরণ না করিয়া যদি সর্ব্ব-বিষয়ে স্বামীর প্রতি বেশী মনোযোগী হওয়া যায়, তবে স্বামী প্রীত হইবেন। অনেক সময়ে অপরের সেবায় এবং স্বীয় উদাসীনতায় সময় ব্যয় না করিয়া, যদি স্বামীর প্রতি যত্ন ও আদরে স্ত্রী আন্তরিক আগ্রহ দেখান, তবে স্বামী বেশী দিন সন্দিগ্ধ থাকিতে পারেন না। সন্দেহ কোন সুখের প্রলোভন দেখাইয়া মানুষকে বিপথে লইয়া যায় না, যাঁহাকে সন্দেহ করা হয়, তিনিও যেরূপ ক্লেশ পান,—যিনি সন্দেহ করেন—তিনিও সেইরূপ। উভয়েই মনে মনে উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। সন্দেহ, স্নেহ বা অনুরাগের অভাবে হয় না, তাহার আতিশয্যে হইয়া থাকে। স্বামীর মনে যদি এই কথাটা লওয়াইতে পারা যায় যে, স্ত্রী সত্য সত্যই তাঁহার অনুরাগিণী, তবে সন্দেহ বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারে না। তাহা না করিয়া স্ত্রী যদি অতিরিক্ত সাবধান হইয়া লোককে দেখাইতে থাকেন যে, তিনি কত সাবধানে চলাফেরা করেন, অথচ স্বামীর সন্দেহ কিছুতেই যায় না,—

তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইবে না। তাঁহার হৃদয় হইতে উপেক্ষার ভাব দূর করিয়া স্বামীর প্রতি তিনি বেশী মনোযোগ দিন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন তাঁহার স্নেহামৃত-বর্ষণে সন্দেহের বিষ ধুইয়া গিয়াছে।

শেষের কথা

কিন্তু যখন গৃহিণী দেখিলেন, অনেক করিয়াও স্বামীর চরিত্র শোধরাইতে পারিলেন না,—তিনি মদ্যপায়ী, কুচরিত্র বা অত্যাচারী ও সন্দিগ্ধ রহিয়াই গেলেন; যখন বুঝিলেন, তাঁহার তপস্যা ব্যর্থ হইল, প্রাণ দিয়া যে সংসারের জন্য তিনি খাটিলেন, সে সংসারে তাঁহার আদর নাই,—সে সংসারে তাঁহার মুখের দিকে চাহিবার লোক নাই, ডানহাতে কাজ করেন, বামহাতে চক্ষের জল মোছেন,—সকলের খাওয়ার জন্য প্রাণপণে পরিচর্য্যা করেন, নিজে যে খান নাই, তাহা কেহ বলে না। তিনি একবার ডাকিয়া যদি বলেন, "তুমি কি আজ খাও নাই?"—এই প্রশ্নটি মাত্র শুনিলে তাঁহার কর্ণ জুড়ায়,—এই খোঁজটি লইলেই তাঁহার সুধাপানের ফল হয়, তিনি একটিবারও শুধু মুখের কথাও তাহা বলেন না। একা কাঁদিয়া বিছানায় লুটপটি হইয়া পড়িয়া থাকেন, যাহা পাওয়া এত সহজ, তাহা যেন কঠিন হইতে কঠিন, অসম্ভব হইতেও অসম্ভব হইয়া পড়ে; যখন দেখিবেন, যে ছেলে তাঁহার কোল ছাড়া ঘুমাইত না,—যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকিত, সন্ধ্যা হইলে "মা" "মা" বলিয়া তাঁহার আঁচলের নিকট আসিত, সে ছেলে তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া

নিরাশ্রয়ের সান্ত্বনা কি?

গেল ; অপর ছেলে যাহার উপর ভরসা রাখিয়াছিলেন, সে ছেলে স্ত্রীর কথা মানিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইল এবং বাড়ীতে আসিল না ;—যখন দেখিলেন, দুঃখের পর কেবলই দুঃখ, উজ্জ্বল কৃষ্ণ চুলগুলি শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া যাইতেছে বা পাকিয়া পড়িতেছে ; তাঁহার দেহের প্রশংসিত রূপ চলিয়া গিয়াছে, উপেক্ষায় দেহ কতকাল টিকে ? এমন কি, যাঁহার শত অত্যাচার যিনি ফুলরাশি মনে করিয়া বুক পাতিয়া লইয়াছিলেন, যাঁহার স্নেহ হারের মত হৃদয়ে গাঁথিয়া পরিয়া মনে মনে গৌরবান্বিতা ছিলেন, যদি এমনও দুর্দ্দিন আসে যে, তিনিও চলিয়া যান, তবে রমণী কি করিবেন ?—যখন দেখিবেন, দারিদ্র্য আসিয়া সংসার ঘিরিয়াছে, নিজে না খাইয়াও স্বামী এবং শিশুগণকে খাওয়াইতে পারিতেছেন না, তখন তিনি কি করিবেন ? যখন দেখিবেন, দুঃখের পার নাই, দুশ্চিন্তার শেষ নাই,—তখন কে আশ্রয় দিবে, কাহার সাহায্যে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবেন, খুঁজিয়া সন্ধান পান না,—তখন সেই দুর্দ্দিনে তিনি কি করিবেন ? আজন্ম সাধনা ব্যর্থ হইলে, জীবনে ধিক্কার জন্মিল, এই দুঃখ-সমুদ্রে ডুবিয়া তিনি তখন কেমন করিয়া উদ্ধার পাইবেন ?

আমাদের একটা সঞ্চিত মূলধন থাকা উচিত। যাহারা যুদ্ধে যায়, তাহাদের পশ্চাতে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিয়া একদল সৈন্য দুর্গে বসিয়া প্রতীক্ষা করে। যে টাকা দৈনন্দিন খরচে লাগে, তাহা ছাড়াও আপনাদের জন্য কতকটা টাকা তুলিয়া রাখা দরকার। সংসারে আমাদিগের সর্ব্বস্ব নীলাম করিয়া দেওয়া উচিত নহে। আমাদের

সংকর্ম্ম ও প্রেম

পতির উপরও পতি আছেন, ছেলে হইতেও প্রিয় সামগ্রী আমাদের আছে—তাঁহাকে স্মরণ রাখিয়া, তাঁহারই জন্য এই সংসারে আমাদের খাটিতে হইবে, না হইলে ইহা শুধুই বেগার খাটা।

আমরা মুখে বলি, তিনি সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু তাহা কি আমরা একবার ভাবি? যদি রাজার সম্মুখে আমরা যাই, তবে কতদূর সংযত হইয়া চলি, কথা বলিতে কত সাবধান হই, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করি। আর যিনি রাজার রাজা, তিনি এই মুহূর্ত্তে এইখানে আছেন, এই কথা যদি সত্যই মনে ভাবি, তবে কি করিয়া আমরা কথায় ও ব্যবহারে এরূপ অসংযত হইতে পারি? তিনি আমার কাছে আছেন ইহা ভাবিলে আমার দুঃখ কোথায়? সংসার-সমুদ্রে যদি একবার ডুবি, তবে তাঁহার তরীর দাঁড় ধরিয়া আবার তাঁহারই পাদপদ্ম ছুঁইব, এই ভরসা রাখিয়া চলিবে। দুঃখ ও শোক হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় সৎকর্ম্ম। যাঁহার ছেলে চলিয়া গিয়াছে, তিনি নিজের অশ্রু মুছিয়া অপরের ছেলের সেবা করুন,— যখন হাসিতে হাসিতে অপরের ছেলে বিদেশ হইতে বাড়ীতে আসিয়াছে, তাহাকে ধানদূর্ব্বা দিয়া বরণ করিয়া লউন। হয় ত তাহার মাতা পীড়িতা, তিনি উঠিতে পারেন না; শোকসন্তপ্তা আজ যাইয়া সেই ছেলের মাথায় চন্দন লেপিয়া দিন; যে ছেলে না খাইয়া আছে, তাহার ক্ষুধা দূর করুন, তখন দেখিবেন, বালগোপালের পূজা হইল। দুর্গোৎসবের সময় সকল ছেলে নূতন কাপড় পাইয়াছে, ঐ ভিখারিণীর ছেলে পায় নাই। সে যতই "নূতন কাপড় নেবো" বলিয়া কাঁদিয়াছে, তাহার মাতা তাহাকে ততই চড় মারিতেছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে সেই শিশু ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার কান্না থামিল, সেই নিদ্রিত শিশুকে শোওয়াইয়া মাতা কাঁদিতে বসিলেন। হে শোকসন্তপ্তা, আপনি যাইয়া সেই ভিখারিণীর ছেলেকে একখানি নূতন কাপড় আনিয়া দিন, তারপরে পূজার ঘরে যাইয়া দেখিবেন, ভগবানের পীতবসন সে দিন উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহার মুখের প্রীতি হাসি দেখিয়া সেদিন আপনার চক্ষু জুড়াইবে। বিদেশাগত পরের ছেলের জন্য আপনি যে ধানদূর্ব্বা কুড়াইয়াছিলেন, দেখিতে পাইবেন, তাহা ভগবানের

পাদপদ্মের প্রভা বাড়াইয়াছে,—যে চন্দন ঘষিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং চন্দনচর্চ্চিত হইয়া আপনাকে দেখা দিতেছেন। অরূপের রূপের আভাস যেদিন পাইবেন, চক্ষুর তৃষা সেই দিন মিটিবে। (সৎকর্ম্মের দ্বারা অবিরত সেবা করিলে, তিনি আপনার কাছে আসিবেন। তখন আবার দুঃখ কিসের? যিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁহাকে পাইলে আবার দুঃখ কিসের? যাঁহাকে মরিবার সময় খুঁজিব, বিপদের দিন খুঁজিব, শ্মশান পার হইয়া যাঁহার নিকট যাইতে হইবে, তাঁহাকে পাইলে আবার দুঃখ কিসের? তাঁহার সন্তানের অশ্রু মোছাইবার জন্য তাঁহার হস্ত চিরদিন উদ্যত হইয়া আছে, আমরা নিজেরা আত্মাভিমানে তাহা ঠেকাইয়া রাখিয়াছি।)

মৌখিক জপ বৃথা

অনেক প্রবীণা স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা জপতপে নিযুক্ত দেখা যায়। জপের মালা ক্রমাগত আঙ্গুলে ঘুরিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাংসারিক ভাবনা-চিন্তা ও খোঁজ লওয়ার অবধি নাই। কাক উড়িয়া ধানের উপর পড়িল, তিনি 'হুস্' বলিয়া তাড়াইতেছেন, আগন্তুক আত্মীয়কে দেখিয়া বলিলেন,—"বো'স বো'স, ছেলেটাকে বাঁচাইতে পারিলাম না, আজও জ্বর হইয়াছে।" সেই সময়ে কনিষ্ঠ পুত্র আসিল, তাহার দিকে স্নেহার্দ্র-চক্ষে চাহিয়া বলিলেন,—"আজ বুঝি এখনও কিছু খাও নাই?" কিছু পরে বলিলেন,—"চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখিতেছি, চিকিৎসা না হইলে চক্ষু দুটি খোয়াইব।" এইরূপ শত শত কথার মধ্যে তাঁহার অঙ্গুলির বিরাম নাই, শাস্ত্রবিহিত-পথে অষ্টোত্তর একশতবার জপ চলিতেছে।

মনের মলা দূর না করিলে ভক্তি ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের শান্তি পাওয়া যাইবে না। তিনি হৃদয়ের ধন, অনেক কষ্ট সহিয়া একাগ্র হইয়া তাঁহাকে পাইতে হয়, নিজের ভোগসুখের পথে সংযমের কাঁটার বেড়া দিয়া তাঁহাকে

পাইতে হয়, একাগ্র না হইলে তাঁহার পায়ের নূপুরের শব্দ শোনা যায় না।

তিনি নিত্যই আসেন

কিন্তু তিনি রোজই আসেন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আসেন, তাঁহার স্নেহের শিশুরা কি করিতেছে তাহা দেখিতে আসেন। তাহারা যদি নিজ সুখের ও স্বার্থের ঠুলি পরিয়া চক্ষু আঁধার করিয়া রাখে, তবে তাঁহার পাদপদ্ম দেখিবে কিরূপে? তাহারা যদি এক মনে বসিয়া, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা না করে, তবে তিনি কাহার নিকট আসিবেন? আমার সমস্ত মন ও কর্ম্মের উপর যখন সংসার চাপিয়া আছে, তখন জপের মালা তাঁহাকে কাছে আনিয়া দিতে পারিবে না। যে দিন কর্ণ তাঁহার মিষ্ট স্বর চিনিবে এবং মন তাঁহার প্রেমে মজিবে, সে দিন জপের মালা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া তাঁহার নাম শুনিয়া ভক্ত কাঁদিবেন আর গাহিবেন :—

"আমার মন যদি রে ভোলে—
তবে বালির শয্যায় মায়ের নাম দিও কর্ণমূলে।
দেহ আপন বশ নহে—সে রিপুর সঙ্গে চলে।
আমায় এনে দে, ভোলা, জপের মালা
ভাসাই গঙ্গাজলে।" (১)

দুর্দ্দান্ত দস্যু চাঁদরায়ের ভয়ে গৌড়ের সম্রাট্ ভীত হইয়াছিলেন। গৌড়দ্বারে এই ব্যক্তি যে দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং অসাধারণ বলসম্পন্ন

চাঁদরায়

সৈন্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—তাহার ভয়ে নবাব-সৈন্য সেদিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই দস্যু ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার কৃপায় নরোত্তমের ভক্তির

(১) এই গানটি নাটোরের রাজা রাণী ভবানীর পুত্র বিখ্যাত রামকৃষ্ণের। যখন তিনি জপতপে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন অনুচর ভোলা তাঁহার কাছে উত্তরসাধকরূপে থাকিত। গানে তিনি এই ভোলার প্রতি সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

উচ্ছ্বাস দেখিয়া তিনি মন্ত্র-মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ শোধরাইয়া গেল, তিনি বৈষ্ণব সাজিয়া দীনাতিদীনের ন্যায় তিলক কাটিয়া তখন তুলসী-মালা গলায় পরিয়া তাহাই তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি অপেক্ষা প্রিয় মনে করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি ভাবিলেন, সেই তুলসী-মালা তিলকই ভগবানের স্মৃতি-চিহ্ন।

এই অবস্থায় মাত্র একশত অশ্বারোহী সৈন্য ও চারিশত পদাতিক লইয়া তিনি একদা গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিলেন। নবাবের চর তাঁহাকে যাইয়া বলিল,—"অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া চাঁদরায় গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন।" নবাব কালবিলম্ব না করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং ভূনিম্নে এক ভীষণ কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। কয়েকদিন পরে চাঁদরায়কে নবাবের আদেশে দরবারে উপস্থিত করা হইল, নবাব তাঁহাকে অনেক ভৎর্সনা করিলেন। চাঁদরায় কেবল এইমাত্র বলিলেন,—"আমি প্রকৃতই অপরাধী, আমাকে দণ্ড দিন।" তাঁহার এই বিনয় দেখিয়া নবাব বিস্মিত হইলেন, এবং কঠোর স্বর কিঞ্চিৎ কোমল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারাগারে তুমি কেমন ছিলে?" চাঁদরায় বলিলেন,—"আমি এত সুখে আর জীবনে কোথাও থাকি নাই।" বিস্ময়ের সহিত সম্রাট্ তাঁহার কি সুখ, তাহা পুনরায় জিজ্ঞাসা করাতে, চাঁদরায় গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন,—"আমার কখনও মনে হইয়াছে, তাঁহার পাদপদ্মে অলক্তক পরাইতেছি, কখনও মনে হইয়াছে, তাঁহাকে ব্যজন করিতেছি, কখনও বিভোর হইয়া মনে মনে পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা তাঁহার আরতি করিয়াছি,—কখনও ধূপ ধূনা দিয়া মনে মনে তাঁহার মন্দির সুগন্ধ করিয়াছি, কখনও বা যুথি, জাতী প্রভৃতি কুসুমদামে অপূর্ব্ব মালা গাঁথিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া ধন্য হইয়াছি, আমার প্রাণের প্রাণকে সেই কারাগারের মধ্যে নির্জ্জনে যেরূপ পাইয়াছিলাম, এরূপ

কোথাও পাই নাই। আমি আনন্দে বিভোর ছিলাম, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল না,—কি ভাবে দিনরাত কাটাইয়াছি, তাহা আমার মনে নাই।”

দান, সেবা ও প্রেম,—এই সংসারে সেই দেবমন্দিরের পথে মানুষকে লইয়া যায়। নারিকেল-বৃক্ষকে সাধারণতঃ হিন্দুগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন; উহা অতি উচ্চ হইয়া আমাদের মাথা ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে, নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য নহে। নিজের মূল তো মানুষের হাতের কাছে পড়িয়াছে, একটা কুড়ালি দিয়া আঘাত করিলেই তরুটি এখনই পড়িয়া যাইবে। কিন্তু লোক-দৃষ্টি হইতে দূরে থাকিয়া সাধনা করিবার জন্য সে এত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। সেই সাধনার ফল মানুষকে দিবে বলিয়াই সে তাহা রক্ষা করিতে এত যত্নপর, পাছে ফল পুষ্ট না হইতে হইতেই লোক তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে; এই জন্য দূরে বসিয়া সে সাধনা করিতেছে, সেই ফলে লোকের ক্ষুধা ও পিপাসা একেবারে নিবারণ করিবে, এই সাধনা। সাধুরা মানব-সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া এই ভাবে সেই সমাজের শুভ-সাধনা করিয়া থাকেন। বৃক্ষ নিজে বৃষ্টি ও রৌদ্র ভোগ করিয়া শুকাইয়া মরিলেও কাহারও নিকট কিছু চাহে না। যে ব্যক্তি কুড়ালি দিয়া তাহার শাখা কাটিতেছে, তাহাকে নিজের ছায়া হইতে বঞ্চিত করে নাই, যে চাহিতেছে, তাহাকেই অকাতরে ফুলফল বিতরণ করিতেছে। এই ত্যাগের কারণ কি? কি সুখে এত কষ্ট সহিয়া সে জীবের উপকার করিতেছে? সে নিভৃতে অন্যের অগোচর তাহার কোমল শিকড়রূপ হস্তে দৃঢ়রূপে ধরিয়া জননীর স্তন্যপানে বিভোর রহিয়াছে, অমৃত পান করাতে তাহার স্বভাব অমৃতময় হইয়া গিয়াছে।

বৃক্ষের অমৃত পান

গোপনে আনন্দময়ের প্রেমরস দ্বারা হৃদয় পুষ্ট রাখিলে, সংসারের দুর্গতি কি করিতে পারে? বিপদ্ ব্যাঘ্রের মত আসিয়া মেঘের ন্যায় হইয়া

যায়। চণ্ডীদাসের গানে আছে,—"আমি শ্যাম-অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু, তিল-তুলসী দিয়া।" তিল-তুলসী দিয়া, যে দান করা যায়, তাহার উপর কোনই স্বত্ব থাকে না। ভগবান্‌কে যদি এ দেহ দান করিয়া বলা যায়, "আমার চক্ষু-কর্ণ তোমারই আদেশে চলিবে, এ দেহ, হে কর্ণধার, তুমি যে ভাবে চালাইবে, সেই ভাবেই চলিবে—আমি ইহার মালিক নই, আজ হইতে স্বত্বত্যাগ করিয়া এ দেহ তোমাকে দিলাম," তখন আর এই দৈহিক সুখের জন্য মাথা কুটিতে হইবে না,—কোন ভয় বা সন্তাপ ইহাকে ছুঁইতে পারিবে না। "আমি তাঁহাকে ইহা দিয়া ফেলিয়াছি," এই চিন্তা করিয়া প্রতি কার্য্যে তাঁহার আজ্ঞা স্মরণ রাখিয়া চলিলে বিপদ্ কোথায়? তিনি অভয় দিতে আসিয়া তোমার স্বেচ্ছাচার দেখিয়া ফিরিয়া যান,—যে পাদপদ্মের প্রভায় তোমার জীবন উজ্জ্বল হইবে, তাহা তোমার মাথার কাছেই আছে। দেহকে পবিত্র কর, সেই দেহেই তাঁহার বেদী হইবে। তখন বিদ্যাপতির কথায় বলিতে পারিবে,—"বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে, ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।" এই দেহ বেদী হইবে এবং মাথার চুল, যাহা এত গৌরবের জিনিষ, তার দ্বারা ঝাঁটা বানাইয়া সেই বেদী পরিষ্কার করিব, অর্থাৎ আমার যত পার্থিব-গৌরব, তাহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করিয়া তাঁহারই পদধূলির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিব। তাঁহারই জন্য পথের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইতে কোন শ্যাম সন্ধ্যায়, বা নিস্তব্ধ রজনীতে, বা প্রাতের শুভ্র সেফালিকার পতন-শব্দে—হয় ত সত্য সত্যই এই হৃদয়কুঞ্জে তাঁহার পাদক্ষেপ শোনা যাইতে পারিবে; তখন দশ ইন্দ্রিয় ধন্য হইয়া তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিতে দাঁড়াইবে,—তখন জীবনে যাহা কিছু বিফল হইয়াছে, তাহা সফল হইবে, এবং যত কিছু দুঃখ, তাহা সৌভাগ্যের শুভ-চিহ্ন হইয়া কপালে ভক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া দিবে।

আত্মদান

পরিশিষ্ট

গৃহচিকিৎসা (১)

(এলোপ্যাথিক মতে)

কলিকাতা ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এম, ডি, মহাশয় কর্ত্তৃক এই পুস্তকের জন্য লিখিত।*

প্রথম অধ্যায়

নবজাত শিশুর প্রতি কর্ত্তব্য

আঁতুড়-ঘরে

সূতিকা বা আঁতুড়-ঘরে :—শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, প্রথমতঃ তাহাকে কাঁদাইবার চেষ্টা করিবে। দুইটি গামলায় ঠাণ্ডা ও গরম জল রাখিয়া শিশুকে একবার গরম জলে, একবার শীতল জলে হাতে ধরিয়া ভাসাইবে। যেন শিশুর মুখে জল না লাগে। এইরূপ করিলে শিশু কাঁদিতে থাকিবে। যত কাঁদিবে, ততই ভাল।

চক্ষু :—বোরিকজলে তুলা ভিজাইয়া, চক্ষু দুইটি ভাল করিয়া মুছাইয়া দিবে। প্রসব-সময়ে শিশুর চক্ষে ময়লা লাগিয়া যায়। পরিষ্কার করিয়া না

---

* ম্যাকলিয়োড স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, এম, ডি মহাশয় কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ফেলো, কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল এবং কলেজ অব্‌ ফিজিসিয়ান্সের অস্ত্রবিদ্যার ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসক, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষক এবং অস্ত্রবিদ্যাসম্বন্ধে বড় কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থের প্রণেতা, ইনি ভবানীপুরের মাননীয় বিচারপতি স্যার্‌ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং অপরাপর বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহ-চিকিৎসক।

দিলে পরে চক্ষের অসুখ হয় ও চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এইরূপে সূতিকা-গৃহেই অনেক শিশু অন্ধ হইয়া যায়।

মুখ :—আঙ্গুলে তুলা জড়াইয়া মুখের ভিতর বেশ করিয়া মুছাইয়া দিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, মুখ মুছাইয়া না দিলে শিশু কাঁদিতে পারে না।

নাভি :—নাভি কাটিবার জন্ম বসিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। জন্মমাত্র নাড়ীটিতে হাত দিলে, নাড়ীর মধ্য দিয়া রক্ত চলাচল করিতেছে বুঝিতে পারা যায়। ক্রমে তাহা বন্ধ হইয়া আইসে। সেই সময়ে সূতা দ্বারা নাড়ীটি দুই স্থান বাঁধিয়া, মধ্যস্থল কাঁচি দ্বারা কাটিয়া দিবে। সূতাটি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবে। তৎপরে লিণ্ট পেটের উপর রাখিয়া নাড়ীটি বসাইবে এবং তুলা দিয়া ঢাকিয়া একটি পটী বাঁধিয়া দিবে। নাড়ীটি খুলিয়া প্রত্যহ তাহার অবস্থা দেখিবে। একটু বোরিক এসিড্ দিবে। প্রদীপের শীষে হাত গরম করিয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই। 'হরিলুটের খোকা' হইলেও হরির তলার মাটী কখনও নাভির ঘায়ের উপর দিবে না। নাভির ঘায়ে কোনরূপ ময়লা-মাটী লাগিলে খোকাটির ধনুষ্টঙ্কার রোগ হইতে পারে। সাধারণে ইহাকে 'পেঁচো পাওয়া' বলে। ইহাতে ছেলেদের চোয়াল ধরিয়া যায়, মাই টানিতে পারে না। এই রোগ হইলে আর নিস্তার নাই। নাভিতে মাটীলাগার দরুণ আমি ২।৩টি ছেলের মৃত্যু হইতে দেখিয়াছি। সূতিকাগৃহে ব্যবহার জন্য "নার্সরি পাউডার" ব্যবহার করিবে।

খাদ্য :—শিশুকে প্রথমতঃ মধু খাইতে দিবে ; পরে মাই খাওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিবে। কেহ কেহ বলেন ২।৩ দিন মাই দিতে নাই ; কিন্তু ইহা বিশেষ ভুল। মাতৃস্তন্যে শিশুর উপযোগী খাদ্য সদাই বর্ত্তমান জানিবে ; কিন্তু কি পরিমাণ খাদ্য শিশুকে খাইতে দিতে হইবে, অনেকে

তাহা বুঝিতে পারেন না। বস্তুতঃ ইহা ঠিক করা একটু কঠিন। খাঁটী ও জল দেওয়া দুই প্রকারের দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়। এক পোয়া খাঁটী দুধ ও তিন পোয়া জল দেওয়া দুধ শিশুর পক্ষে সমান। সপ্তাহে সপ্তাহে শিশুকে ওজন করিলে শিশু বাড়িতেছে কি না, জানা যায়। শিশুর ওজন হিসাবে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইতে ও কমাইতে হয়। সুস্থ শিশুকে কোন্ কোন্ সময় খাদ্য খাওয়াইতে হইবে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

সুস্থ শিশুকে কোন্ কোন্ সময়ে খাদ্য খাওয়াইতে হইবে তাহার তালিকা।

১ সপ্তাহ	১ মাস	২ মাস	৫ মাস	৭ মাস	৯ মাস	১০ মাস
দিবা—	দিবা—	দিবা—	দিবা—	দিবা—	দিবা—	দিবা—
৬টা	৬টা	৬-৩০	৭টা	৬-৩০	৭টা	৭টা
৮টা	৮-৩০	৯টা	১০টা	৯টা	১০টা	১০টা
১০টা	১১টা	১১-৩০	১টা	১০-৩০	১টা	১টা
১২টা	১-৩০	২টা	৪টা	২টা	৪টা	৪টা
২টা	৩টা	৪-৩০	রাত্রি—	৪০-৩০	রাত্রি—	রাত্রি—
৪টা	৫-৩০	রাত্রি—	৭টা	রাত্রি—	৭টা	৭টা
সন্ধ্যা—	রাত্রি—	৭টা	১০টা	৭টা	১০টা	
৬টা—	৮টা	১০টা	৩টা	১০টা		
রাত্রি—	১০-৩০	৩টা				
৮টা	২-৩০					
১০টা						
২টা						

শিশুকে কি পরিমাণ খাদ্য খাওয়াইতে হইবে, তাহার তালিকা

বয়স	কতবার খাওয়াইতে হইবে	গরুর দুধ	জল	প্রতি বারে কত	সমস্ত দিনে কত
		আঃ	আঃ	আঃ	আঃ
১ সপ্তাহ	১০	১	১	২	২০
১ মাস	৯	১½	২½	৪	৩৬
২ মাস	৮	৩	৩	৬	৪৮
৩	৮	৩½	২½	৬	৪৮
৪	৮	৪	৩	৭	৫৬
৫	৭	৫	৩	৮	৫৬
৬	৭	৬	২	৮	৫৬
৭	৭	৭	২	৯	৬৩
৮	৭	৮	১	৯	৬৩
৯	৬	৯ বা ১০	—	৯ বা ১০	৫৪-৬০
১০	৬	ঐ	—	ঐ	ঐ

কোনও শিশুর মাতৃ-স্তনে দুধ না থাকিলে বা মা মরিয়া গেলে, নিম্নের তালিকা মত শিশুকে খাওয়াইতে হইবে।

বয়স	কত বার	গাভী-দুগ্ধ	ক্রিম বা সর	জল বার্লি	প্রতি বারে কত	সমস্ত দিনে
		ড্রাম	ড্রাম	ড্রাম	আঃ	আঃ
৩ দিন	১০	১½	১	৬½	১	১০
৭ ”	১০	৩	১	৮	১½	১৫
১৪ ”	১০	৪	১	১১	২	২০
২১ ”	১০	৬	২	১২	২½	২৫
২৮ ”	১০	৮	২	১৪	৩	৩০
৫ সপ্তাহ	৯	১০	৩	১৬	৩-৫	৩২·৫
৬ ”	৯	১৩	৩	১৮	৪-২	৩৮
৭ ”	৯	১৬	৩	২১	৫	৪৪
৮ ”	৮	২০	২	২৪	৬	৪৮

টীকা :—শিশু তিন মাসের হইলে এবং বিশেষ কোন অসুখ না থাকিলে টীকা দিবে। বাহুতে তিনটি টীকা দিলেই যথেষ্ট হইবে। টীকা দিলে বসন্ত রোগ হইবার তত ভয় থাকে না। টীকা দিবার পর যদিও বসন্ত হয়, সাধারণতঃ তাহা মারাত্মক হয় না। টীকা দিলে শিশুর বিশেষ কষ্ট হয় না। টীকা দিবার ৭।৮ দিন পর, ৩।৪ দিন একটু একটু জ্বর হয়। টীকা বেশী উঠিলে বোরিক কম্‌প্রেস দিবে। টীকার ক্ষত চুলকায়, সেইজন্য তাহাতে হাত দিতে না পারে, এরূপ ভাবে, "টীকা-রক্ষক" (vaccination shield) ব্যবহার করিবে। বোরিক তুলা চাপা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেও হয়। বেশী স্রাব হইলে, একটু বোরিক মলম লাগাইয়া বাঁধিবে।

টীকা

দাঁত উঠা :—৭ মাস বয়স হইতেই শিশুদের দাঁত উঠিতে থাকে। কাহারও অগ্রে, কাহারও বা পরে উঠিতে থাকে। সুস্থ শিশুর দাঁত উঠিবার সময় বিশেষ কোন অসুখ হয় না। কোনও কোনও শিশুর সেই সময় পাঁচড়া, কাসি ও পেটের অসুখ হইতে দেখা যায়। দাঁত দেখা দিলে, মাড়ী একটু শক্ত জিনিষ দ্বারা ঘসিয়া দিলে ভাল হয়। এই কারণেই বোধ হয়, আমাদের দেশের ছেলেদের চুষীকাঠি ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। দাঁত উঠিবার সময় শিশু যদি বেশী কাঁদে, ভাল না ঘুমায়, ছটফট্ করে, তাহা হইলে দুই গ্রেণ ব্রোমাইড জলে গুলিয়া সিরাপের সহিত খাইতে দিবে। দাঁত উঠিবার সময় জ্বরে শিশুদের তড়কা হয়, দাঁত উঠিতে দেরী হইলে ডাক্তার দিয়া মাড়ী একটু কাটিয়া দিবে। সাধারণতঃ দাঁতের মাড়ী কাটিয়া দিবার দরকার হয় না। রেড়ীর তৈলের জোলাপ দিবে। শিশুর দাঁত উঠিলে, সাদা নেকড়া জলে ভিজাইয়া দুই বেলা পরিষ্কার করিয়া দিবে। মানুষের দুইবার দাঁত উঠে। দুধের দাঁত উঠিবার সময়—৫।৭ মাস হইতে ২ বৎসর। প্রতি পাটীতে ১০টী করিয়া ২০টা উঠে। পাকা দাঁত উঠিবার সময়—৭

বৎসর হইতে ২৫ বৎসর। প্রতি পাটীতে ১৬টি করিয়া ৩২টা দাঁত উঠে।

সাধারণতঃ শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় কোন অসুখ হইলেই দাঁত উঠাই তাহার কারণ বলিয়া অনেকে ঠিক করেন। কিন্তু বস্তুতঃ দাঁতের মাড়ী যদি ফুলা, গরম বা বেদনাযুক্ত না হয়, তবে দাঁত উঠার দরুণ শিশুর অসুখ নহে বুঝিতে হইবে। দাঁতের অনেক অসুখ আছে। সেইজন্য দাঁতের চিকিৎসক ডাকিবে। দাঁত ভাল না উঠিলে মুখশ্রী খারাপ দেখায়। চিরণ-দাঁত, গজদন্ত, ইঁদুর-দাঁত হইলে ডাক্তার দেখাইবে। পোকায় খাইলে দাঁতে কন্‌কনানি হয়। বস্তুতঃ কোন পোকা দাঁত খায় না, ইহা একটি দাঁতের অসুখ। বেদিনীরা যে দাঁতের পোকা বাহির করে, তাহা তাহাদের জুয়াচুরী জানিবে। দাঁত কন্‌কনানি হইলে ক্লোরাল হাইড্রাস ও কর্পূর সমভাগে খলে মাড়িয়া জলবৎ হইলে তূলা করিয়া দাঁতে লাগাইবে। দাঁতে যদি গর্ত্ত দেখা যায়, চিকিৎসক দ্বারা তাহা পূরণ (stop) করাইয়া লইবে। দাঁতের মাড়ী ফুলিলে লেবুর রস আঙ্গুলে করিয়া মাড়ীতে ঘসিবে। বেশী ফুলিলে একটু কাটিয়া রক্ত বাহির করাইয়া দিবে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া শিশু অনেক সময় হাসে, ইহাকে এ দেশের লোকে বলে, খোকা দেয়ালী করিতেছে। খোকার পেটের অসুখ হইলে এইরূপ করে। সুতরাং "দেয়ালী" দেখিলে সাবধান হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুদের পীড়া

শিশুর অসুখ হইয়াছে জানিলেই অনেক সময় তাহার খাদ্যের বিষয় ভাবিবে। অনিয়মিত ভোজন করাইলে, বেশী বা কম খাইলে, ভাল দুধ না পাইলে, এইরূপ নানা কারণে অসুখ হয়। 'কন্‌-ডেন্সড্‌ মিল্ক্‌' বা কোনরূপ পেটেণ্ট বিলাতি দুধ ছেলেদিগকে নিয়মিতরূপে কখনই খাইতে দিবে না। বিশেষ আবশ্যক হইলে, চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে খাইতে দিবে। এই সকল দুধ খাইয়া শিশু কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না। ফিডিং বোতলে রাখিয়া দুধ খাওয়ান একেবারেই নিষিদ্ধ জানিবে। বোতলে দুধের কণা থাকিয়া যায়, তাহা পচে এবং তাহা উদরস্থ হইলে শিশুর সাংঘাতিক উদরাময় রোগ দেখা দেয়।

শিশুর খাদ্য

পেটের অসুখ

দাস্ত জলের মত হড়্‌হড়ে, সবুজ ও ৩।৪ বারের বেশী হইলে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। এরূপ হইলে দুধ কম খাইতে দিবে। চূণের জল মিশাইয়া খাওয়াইবে। দুধে যে জল মিশান হয়, তাহা গরম করিয়া দিবে। বেশী দাস্ত হইলে একেবারে দুধ বন্ধ করিয়া বার্লি খাওয়াইবে।

যদি শিশুর মলে দুধের ছানা দেখিতে পাও, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশু হজম করিতে পারিতেছে না। এইরূপ যদি ক্রমাগত হইতে থাকে, তবে রেড়ীর তৈল খাইতে দিবে। বাটীতে সহজে এই ঔষধ তৈয়ারী করিয়া লওয়া যায়।

রেড়ীর তৈল	১ আঃ
গঁদ	৩ ড্রাম
চিনি	৩ ড্রাম
পিপারমেণ্ট তৈল	২ ফোঁটা

বৎসর হইতে ২৫ বৎসর। প্রতি পাটীতে ১৬টি করিয়া ৩২টা দাঁত উঠে।

সাধারণতঃ শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় কোন অসুখ হইলেই দাঁত উঠাই তাহার কারণ বলিয়া অনেকে ঠিক করেন। কিন্তু বস্তুতঃ দাঁতের মাড়ী যদি ফুলা, গরম বা বেদনাযুক্ত না হয়, তবে দাঁত উঠার দরুণ শিশুর অসুখ নহে বুঝিতে হইবে। দাঁতের অনেক অসুখ আছে। সেইজন্য দাঁতের চিকিৎসক ডাকিবে। দাঁত ভাল না উঠিলে মুখশ্রী খারাপ দেখায়। চিরণ-দাঁত, গজদন্ত, ইঁদুর-দাঁত হইলে ডাক্তার দেখাইবে। পোকায় খাইলে দাঁতে কন্‌কনানি হয়। বস্তুতঃ কোন পোকা দাঁত খায় না, ইহা একটি দাঁতের অসুখ। বেদিনীরা যে দাঁতের পোকা বাহির করে, তাহা তাহাদের জুয়াচুরী জানিবে। দাঁত কন্‌কনানি হইলে ক্লোরাল হাইড্রাস ও কর্পূর সমভাগে খলে মাড়িয়া জলবৎ হইলে তূলা করিয়া দাঁতে লাগাইবে। দাঁতে যদি গর্ত্ত দেখা যায়, চিকিৎসক দ্বারা তাহা পূরণ (stop) করাইয়া লইবে। দাঁতের মাড়ী ফুলিলে লেবুর রস আঙ্গুলে করিয়া মাড়ীতে ঘসিবে। বেশী ফুলিলে একটু কাটিয়া রক্ত বাহির করাইয়া দিবে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া শিশু অনেক সময় হাসে, ইহাকে এ দেশের লোকে বলে, খোকা দেয়ালী করিতেছে। খোকার পেটের অসুখ হইলে এইরূপ করে। সুতরাং "দেয়ালী" দেখিলে সাবধান হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুদের পীড়া

শিশুর অসুখ হইয়াছে জানিলেই অনেক সময় তাহার খাদ্যের বিষয় ভাবিবে। অনিয়মিত ভোজন করাইলে, বেশী বা কম খাইলে, ভাল দুধ না পাইলে, এইরূপ নানা কারণে অসুখ হয়। 'কন্‌-ডেন্সড্ মিল্ক্' বা কোনরূপ পেটেণ্ট বিলাতি দুধ ছেলেদিগকে নিয়মিতরূপে কখনই খাইতে দিবে না। বিশেষ আবশ্যক হইলে, চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে খাইতে দিবে। এই সকল দুধ খাইয়া শিশু কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না। ফিডিং বোতলে রাখিয়া দুধ খাওয়ান একেবারেই নিষিদ্ধ জানিবে। বোতলে দুধের কণা থাকিয়া যায়, তাহা পচে এবং তাহা উদরস্থ হইলে শিশুর সাংঘাতিক উদরাময় রোগ দেখা দেয়।

শিশুর খাদ্য

পেটের অসুখ

দাস্ত জলের মত হড়হড়ে, সবুজ ও ৩।৪ বারের বেশী হইলে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। এরূপ হইলে দুধ কম খাইতে দিবে। চূণের জল মিশাইয়া খাওয়াইবে। দুধে যে জল মিশান হয়, তাহা গরম করিয়া দিবে। বেশী দাস্ত হইলে একেবারে দুধ বন্ধ করিয়া বার্লি খাওয়াইবে।

যদি শিশুর মলে দুধের ছানা দেখিতে পাও, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশু হজম করিতে পারিতেছে না। এইরূপ যদি ক্রমাগত হইতে থাকে, তবে রেড়ীর তৈল খাইতে দিবে। বাটীতে সহজে এই ঔষধ তৈয়ারী করিয়া লওয়া যায়।

রেড়ীর তৈল	১ আঃ
গঁদ	৩ ড্রাম
চিনি	৩ ড্রাম
পিপারমেণ্ট তৈল	২ ফোঁটা

এই সকলের সঙ্গে জল ৬ ড্রাম দিয়া বেশ করিয়া খলে ঘুঁটিতে থাক। তার পর আরও জল ঢালিয়া, চার আঃ শিশিতে ঢালিয়া রাখ; চার ঘণ্টা অন্তর এক ছোট চামচ্ (Tea-spoonful) করিয়া শিশুকে খাইতে দাও।

এই ঔষধ রক্ত আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় বেশ দেওয়া চলে। পেটের অসুখে আদার রস বড় উপকারী।

জ্বর :—শিশুদের জ্বর নানা কারণে হয়। দাঁত উঠা, ঠাণ্ডা লাগা, পেটের অসুখ প্রভৃতি সামান্য কারণেই জ্বর হয়। শিশুদের জ্বরের মাত্রা

জ্বর

প্রায়ই হঠাৎ বেশী হয়। একজন যুবকের ১০৪° কি ১০৫° জ্বর হইলে অনেক সময় ভাবনার কথা। কিন্তু শিশুদের জ্বর সহজেই ১০৪°, ১০৫° পর্য্যন্ত উঠে, তাহাতে সেরূপ ভাবনা নাই। ঐরূপ জ্বর হইলে, প্রথমেই এক চামচ্ (Tea-spoonful) রেড়ীর তৈল খাইতে দিবে। তাহাতে দাস্ত পরিষ্কার হইবে। পরে টিং একোনাইট্ ½ ফোঁটা, প্রতি ঘণ্টায় দিয়া, ৫ বার পর্য্যন্ত দিবে। যদি জ্বর না কমে, তাহা হইলে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। জ্বরের সময় শিশুকে কম পরিমাণে খাইতে দিবে। দুধে, জল বা বার্লি মিশাইয়া খাইতে দিবে। একটি থার্ম্মমিটার বাড়ীতে রাখিবে। দিনে তিনবার জ্বর দেখিবে। শিশুর সহজ শরীরে উত্তাপ ৯৮½ ডিগ্রী। জ্বর বেশী হইলে বরফ, বরফ-থলিতে (Ice-bag) পুরিয়া মাথায় দিবে। ১০৩° জ্বর নামিলে বরফ বন্ধ করিবে। একটি ঘড়ি ধরিয়া শিশুর নাড়ীর স্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাস গণিবে।

নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাস

জন্মিবার পর শিশুর নাড়ী এক মিনিটে ১৪০ বার নড়ে।

১ বৎসরে	১০০
২-৩ বৎসরে	১০০

৪র্থ বৎসরে	৯০
৫ম "	৮০
১৪-২০ কিশোর বয়সে	৭৫
২০-৬০ যুবকের ও প্রৌঢ়ের	৭৫-৬৫
বৃদ্ধের	৮৫-৭০

ডান হাতের কজীতে নাড়ী গুণা সহজ হয়। এক বৎসরের শিশুর নাড়ী মাথার ব্রহ্মতলিতে গুণা যায়।

শিশুর শ্বাস :—

১ মাসে ১ মিনিটে	৪০ বার হয়
২ বৎসরে	৩০
৮ বৎসরে	২০

সামান্য কারণেই নাড়ী ও শ্বাস দ্রুত হয়। কিন্তু উত্তাপ বেশী হইলেই জ্বর হইয়াছে জানিতে হইবে।

ঠাণ্ডা, সর্দ্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা :—শিশুর গায়ের চামড়া বড় পাতলা। সেই জন্য সহজেই ঠাণ্ডা লাগে। শিশু অসুস্থ থাকিলে, খাদ্য কম বা পোষাক

ঠাণ্ডা

গরম না হইলে অনেক সময় সর্দ্দি হইয়া পড়ে। দূষিত বায়ু গৃহের মধ্যে যাইলে শিশুর অসুখ করে। ঘরের সকল দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাত্রে আলো জ্বালিয়া ৫।৬ জন একঘরে শুইলে বায়ু দূষিত হইয়া উঠে। প্রতিশ্বাসে এই দূষিত বায়ু শিশু গ্রহণ করে। রাত্রে শিশুর গায়ে হাওয়া না লাগে, এরূপ ভাবে একটি জানালা খুলিয়া রাখিবে। প্রায়ই দেখা যায় যে, শিশুরা প্রাতঃকালে খোলা-গায়ে ঘরের বাহিরে খেলা করে। ইহা অনুচিত। শিশুর মাথায় টুপী দেওয়া উচিত। ভালরূপে চুল উঠিলে আর টুপী না দিলেও চলে। ভালরূপে কাপড়ে ঢাকিয়া শিশুকে বাহিরে লইয়া গেলে কোনরূপ বিপদের ভয় নাই।

গৃহমধ্যে শিশুর গায়ে বেশী পোষাক দেওয়া উচিত নয়। শিশুর পোষাক গরম, বেশ আলগা ও হালকা হওয়া উচিত। শিশুর নাক সর্দ্দিতে বন্ধ হইয়া গেলে, শিশুর নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। ভেসিলিনে একটু ইউ-ক্যালিপ্‌টাস্ তৈল মিশাইয়া নাকের মধ্যে দিলে বা সরিষার তৈল নাকের মধ্যে দিলে উপকার হইবে। গরম জলে শিশুর গা মুছাইয়া গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। জ্বর হইলে, একোনাইট্ টিং ½ ফোঁটা হিসাবে ২ ঘণ্টা বাদ ৫ বার দিবে। পরে ডাক্তার ডাকিবে।

দুধতোলা :—দুধের মাত্রা একটু বেশী হইলে শিশুরা দুধ তুলিয়া ফেলে। দুধ খাওয়াইয়া শিশুকে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া রাখা উচিত। উপুড় হইলেই পেটে চাপ পড়ে এবং শিশু দুধ তুলিয়া ফেলে। জননী মনে করেন যে, দুধ বেশী খাইলেই খোকাটি মোটা হইবে, কিন্তু, বস্তুতঃ তাহা নহে। যতটুকু শরীরের পক্ষে দরকার, ততটুকু দুধ খাওয়ান উচিত। বেশী দুধে শিশুর উপকার দূরে থাকুক বিশেষ অপকার হয়।

বমন :—খোকা বমন করিলে তাহার খাদ্যের দোষ বুঝিতে হইবে। মায়ের শরীর অসুস্থ হইলে, বেশী দুধ খাইলে শিশু বমি করিতে পারে। গরু বা মহিষের দুধ যদি শিশু পান করে, তবে শিশুকে দুধ অল্প পরিমাণে ও অনেকক্ষণ বাদে সাগু বার্লি মিশাইয়া দিবে। বেশী বমন করিলে দুধ বন্ধ করিয়া দিবে।

কোষ্ঠবদ্ধ :—দাস্ত ভালরূপ না হইলে বা মল কঠিন হইলে শিশুর খাদ্যের অনুসন্ধান করিবে। মাতৃস্তন্যে চর্ব্বির ভাগ কম হইলে শিশুর

কোষ্ঠ

দাস্ত হয় না। এই জন্য মাতাকে ভাল দুধ, মাখম ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত। দাস্ত হইবার জন্য ম্যানা, অলিভ অয়েল বা কড্‌লিভার তৈল, মেলিন্স ফুড্ শিশুকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশে ৬।৭ মাসের শিশুকে ভাত দেওয়া হয়। ইহা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুকে দুধ ব্যতীত আর কিছু খাইতে দিতে নাই। ৮ মাসের ছোট শিশুকে এরারুট বা বার্লি খাইতে দিবে না। দাস্ত না হইলে ঔষধ দেওয়া ভাল নয়। এক চামচ গ্লিসিরিন্ একটু গরম জলে মিশাইয়া শিশুর মলদ্বারে পিচ্‌কারী করিবে। এক টুক্‌রা সাবান মলপথে প্রবেশ করাইয়া রাখিলে দাস্ত হয়। ২ আঃ সাবানের জলে ½ আউন্স অলিভ্ তৈল মিশাইয়া ঐরূপে ব্যবহার করিলেও দাস্ত হয়। শিশুকে নিয়মিত সময়ে দাস্ত করাইবার জন্য পায়ের উপর বসান ভাল। ক্রমে অভ্যাস হইলে ঠিক সময়ে বাহ্যে করে। ৫ হইতে ১০ মিনিটের বেশী পায়ে বসাইয়া রাখা উচিত নয়, বেশী কোঁৎ দিলে মলদ্বার বাহির হইয়া পড়ে।

শিশুদের পেটে কড্‌লিভার তৈল মালিশ করিলে সুফল লাভ হয়। একখানি রুমাল গরম-জলে ভিজাইবে, তাহা নিংড়াইয়া, বেশ পাট করিয়া শিশুর পেটের উপর রাখিবে। এক টুক্‌রা অয়েল সিল্ক ঢাকিয়া পটী বাঁধিয়া দিবে। ইহাতেই অনেক সময় দাস্ত হয়।

ক্রিমি :—শিশুদের উদরে সাধারণতঃ দুই প্রকার ক্রিমি দেখা যায়। গোল বড় ক্রিমি হইলে ৫ বৎসরের শিশুকে রাত্রে ক্যালোমেল্ দুই গ্রেণ ও সাণ্টোনিন ½ গ্রেণ মিশাইয়া খাইতে দিবে। পরদিন প্রাতে দাস্ত সহ ক্রিমি বাহির হইয়া যাইবে। সূতার মত ক্রিমি হইলে ৫ বৎসরের শিশুকে ক্যালোমেল্ দুই গ্রেণ সহ জালাপিন এক গ্রেণ খাইতে দিবে। পরদিন দাস্তের পর লঘু পথ্য দিবে। ক্যালোমেল্ একটি বিষাক্ত ঔষধ, একেবারে দুই গ্রেণ না দিয়া ½ গ্রেণ করিয়া ২ ঘণ্টা বাদ ৪ বার দেওয়া ভাল।

শিশুর অন্যান্য রোগ

কান কট্‌কট্ করিলে :—শিশু কাঁদিতে থাকে ও হাত কানের নিকট লইয়া যায়। রাত্রে এই অসুখে অনেক শিশু ঘুমাইতে পারে না। পান

গরম করিয়া তাহার রস কানে দিলে উপকার হয়। অনেকে তৈল গরম করিয়া কানে ঢালিয়া দেন, কিন্তু বেশী গরম হইলে শিশুর বিষম বিপদ্। 'হাত সওয়া' গরম হইলেই হইবে। ডাক্তারখানা হইতে কান কট্‌কটানির একটি ঔষধ ক্রয় করিয়া রাখা ভাল। কানে খইল হইলে, শিশুর কানে যেন কান-খুস্কি দেওয়া না হয়। খইল জমিলে শিশুর কোন বিপদ্ নাই জানিবে। কড়ে আঙ্গুলের দ্বারা কান যতদূর সাফ্ হয় করিবে।

কানে পুঁষ হইলে :—বোরিক জলে তুলা ভিজাইয়া ধারাণি করিয়া ভালরূপে ধোয়াইয়া দিবে। পরে বোরিক গুঁড়া কানের মধ্যে দিয়া তুলা ঢাকিয়া রাখিবে। সাবধান না হইলে শিশু কালা হইতে পারে। হাই-ড্রোজেন পেরসাইড্ দিলে কানের সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হয়। এই ঔষধ জল মিশাইয়া দিবে।

ছেলের মুখে ঘা হইলে :—অপরিষ্কার থাকিবার জন্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শিশুকে বোতলের দুধ খাওয়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। বোতল ভাল করিয়া ধুইবে। চারি মাসের শিশুর জন্য সোডা বাইকার্ব্ব তিন গ্রেণ—দিনে দুইবার খাইতে দিবে। একবার রেড়ির তৈল খাইতে দিবে; দাস্ত পরিষ্কার হইবে। বোরিক জলে লিণ্ট ভিজাইয়া মুখের মধ্য পরিষ্কার করিয়া দিবে। সোহাগার খই ও মধুতে মাড়িয়া বা গ্লিসিরিন্ ও সোহাগায় মাড়িয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিবে।

ডিপ্‌থিরিয়া :—শিশুদের এই সংক্রামক রোগ হইতে দেখা যায়। অল্প জ্বর, লালাস্রাব, খাইতে কষ্ট ও গলায় ঘা দেখিলেই ডাক্তারকে সংবাদ দিবে। অন্য শিশুদের নিকট হইতে পৃথক ঘরে রাখিবে। সেই শিশুর ঝিনুক, চামচে, পেয়ালা ইত্যাদি অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবে না। এই রোগে ডিপ্‌থিরিয়া প্রতিষেধক ইঞ্জেকৃসন একমাত্র ঔষধ জানিবে।

হাম :—শিশুদের হাম হইলে বিশেষ সাবধানে রাখিবে। হাম হইলেই ঔষধ খাওয়াইতে নাই, ইহা একটি ভুল ধারণা। বেশী সর্দ্দিকাসি বা দাস্ত হইলে ডাক্তার মহাশয়কে সংবাদ দিবে। কাসি হইলে ভাইনাম্ ইপিকাক্ দুই ফোঁটা ও সিরাপ টলু ত্রিশ ফোঁটা অল্প জলে মিশাইয়া দুই ঘণ্টা বাদ শিশুকে খাইতে দিবে। আমাদের দেশে যে নিয়ম আছে, তাহা পালন করিবে। এটি ছোঁয়াচে রোগ! এক ঘরে পৃথক্‌ভাবে শিশুকে রাখিবে। হাম হইলে, বিশেষ প্রয়োজন হইলেও অন্য বাড়ী শিশুকে পাঠাইবে না।

বসন্ত :—বসন্ত রোগ হইলে শিশুকে পৃথক্ রাখিবে। বালকদিগকে তাহার সহিতে খেলিতে দিবে না। বসন্ত রোগে বিশেষ কোন ঔষধ দরকার হয় না। তবে যদি রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে বা কোনরূপ উপসর্গ দেখা যায়, তবে ডাক্তার ডাকিবে। বসন্ত রোগ দেখা দিলেই সকলের টীকা দিবে।

হুপিংকফ :—শিশুদের বড়ই কষ্টদায়ক। কাসিতে কাসিতে দম আট্‌কাইয়া যায়, পরে জোরে নিঃশ্বাস টানিবার জন্য হুপ্ করিয়া একটি দীর্ঘ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। শিশুকে গরম জলে স্নান করাইবে। গৃহমধ্যে যাহাতে ভাল হাওয়া খেলে, এরূপ করিবে। গায়ে জামা দিবে, কিন্তু যেন বেশী আঁট না হয়। ব্রোমাইড্ দুই গ্রেণ, ইপিকাক্ দুই ফোঁটা ও সিরাপ টলু ½ ড্রাম মিশাইয়া তিন ঘণ্টা বাদ খাইতে দিবে। ডাক্তার মহাশয়কে সংবাদ দিবে। এই রোগে শিশু তিন মাস পর্য্যন্ত ভুগিতে পারে। ইহাও একটি ছোঁয়াচে রোগ। অন্য ছেলের সহিত মিশিতে দিবে না।

কলেরা :—শিশু খুব পাতলা দাস্ত করিলে সাবধান হইবে। যদি দাস্ত "চাল-ধোওয়া" জলের মত হয়, তবে কলেরা সন্দেহ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বমি হইতে থাকে ও শিশু ছট্‌ফট্ করে। সাল্‌ফিউরিক্ য্যাসিড্ ডাইলিউট্ পাঁচ ফোঁটা জলে মিশাইয়া দুই এক ঘণ্টা বাদে খাইতে দিবে। ডাক্তার

মহাশয়কে সংবাদ দিবে, ইহা বড়ই সাংঘাতিক রোগ। চিকিৎসা করিতে বিলম্ব করিবে না। জল খাইতে দিবে। ডাবের জল, মৌরীর জল, তৃষ্ণা পাইলেই দিবে।

ছোঁয়াচে রোগ—এক জনের কোন রোগ হইলে যদি স্পর্শ করিলে অপরের সেই রোগ হয়, তাহাকে ছোঁয়াচে রোগ বলে; আমাদের দেশে ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে হাম, বসন্ত, হুপিংকাসি, ডিপ্থিরিয়া প্রধান। হাম বা বসন্ত হইলে যে মা শীতলার অনুগ্রহ হইয়াছে বলিয়া একটি পৃথক ঘরে রোগীকে রাখা হয়, তাহা বড়ই ভাল প্রথা জানিবে। সেই ঘরে শিশুর মাতা ব্যতীত আর কাহারও যাওয়া উচিত নয়। যিনি রোগীর সেবা করিবেন, তিনিই কেবল সেই ঘরে যাইবেন। তিনি সংসারের আর কোন কাজ করিবেন না ও কিছু ছুঁইবেন না। অন্য বালক-বালিকাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবেন। বাটীতে বা পাড়াতে বসন্ত হইলে সকলের টীকা দিবে। ছোঁয়াচে রোগ সারিয়া গেলেও ১৫ দিন রোগীকে পৃথক করিয়া রাখিবে। হাম বা বসন্তের যত দিন সমস্ত মামড়ী উঠিয়া না যায় এবং শরীর সুস্থ না হয়, তত দিন সেই রোগীকে কাহারও সহিত মিশিতে দিবে না। "হুপিং কাসি" হইলে কমিয়া যাওয়ার পর দুই মাস সাবধানে রাখিবে। ডিপ্থিরিয়া সারিয়া গেলেও দুই সপ্তাহ শিশুকে সাবধানে রাখিবে। তাহার মাতা যদি তাহাকে মাই দেন, সেই মাই অন্য কোন ছেলেকে চুষিতে দিবেন না। বালক-বালিকাদিগকে শিখাইবেন, যেন, কেহ কাহারও পেন্সিল লইয়া মুখে না দেয়। টাইফইড্ জ্বর সারিয়া যাইবার এক মাস পর পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুর ঔষধ

খোকার একটু অসুখ হইলেই তাহার মা মনে করেন, ঔষধ দেওয়া উচিত। এটি ভুল ধারণা। অনেক সময়ে দেখা যায়, বিনা ঔষধেও শিশু আরাম হয়। যদিই ঔষধ দিতে হয়, ঔষধ যাহাতে ভাল লাগে, এইরূপ ভাবে দেওয়া উচিত। মধু বা চিনির রসে (সিরাপ) ঔষধ দিলে শিশু বেশ খায়। অমুকের ছেলের এই অসুখ হইয়াছিল, অমুক ঔষধ খাইয়া আরাম হইয়াছিল, এইরূপ কোন প্রতিবাসীর নিকট শুনিয়া ছেলেকে ঔষধ খাওয়ান ঠিক নহে, ইহাতে অনেক বিপদ্ হইতে পারে। ঔষধের মাত্রা ঠিক করিয়া খাওয়ান বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই কারণে চিকিৎসকের উপদেশমত চলাই উচিত। যদি নিকটে কোন চিকিৎসক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে গুটিকয়েক ঔষধ কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়, নিম্নে লিখিতেছি।

ঔষধ

ঔষধ তৈয়ারী করিবার জন্য ২টা কাঁচের মাপের গ্লাস চাই। একটি ছোট ফোঁটা বা মিনিম গ্লাস, আর একটি বড় আউন্স গ্লাস। ৬০ মিঃ ফোঁটায় ১ ড্রাম, ৮ ড্রামে ১ আঃ।

চা খাইবার ছোট চামচে (Tea-spoon) এক ড্রাম ধরে। মাঝারি চামচে (Table-spoon) দুই ড্রাম ধরে। বড় চামচে (Dessert-spoon) চার ড্রাম বা আধ আউন্স ধরে। এক আউন্স অর্দ্ধ ছটাকের সমান। এক পাঁইটে দেড় পোয়া হয়। এক পাউণ্ড প্রায় আধসের জানিবে। গুঁড়া ঔষধ খাওয়াইতে হইলে আঙ্গুলের ডগা ভিজাইয়া গুঁড়া ঔষধ তুলিবে, এবং শিশুর জিহ্বাতে বেশ করিয়া লাগাইয়া দিবে।

জননীদিগের সুবিধার জন্য গুটিকতক ঔষধের বিষয় লিখিলাম।

একোনাইট্ টিং:—মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ফোঁটা। শিশুর জ্বর হইলে, গা গরম, ঘস্‌ঘসে ও নাড়ী চঞ্চল হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে। কিন্তু ইহা একটি বিষাক্ত

ঔষধ। ছেলের বয়স এক বৎসর না হইলে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কখনই ঔষধ ব্যবহার করিবে না। এই ঔষধ ৫।৬ বার খাওয়াইবার পর বন্ধ করিয়া দিবে।

ব্রাণ্ডি :—শিশু হঠাৎ বমি বা পেটের অসুখে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে দশ ফোঁটা ৫ গুণ জলের সহিত মিশাইয়া দুই ঘণ্টা বাদ তিনবার খাইতে দিবে। দাঁত উঠিবার সময় ইহা শিশুকে খাওয়ান যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা ব্যবহার করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না।

সোডা-বাইকার্ব্ব :—অম্ল হইলে শিশুদিগকে ইহা খাইতে দিবে। ছয় মাসের শিশুকে একটা আনির উপর যতটা সোডা ধরে, খাইতে দিবে। প্রস্রাব ত্যাগ করিবার সময় যদি শিশু কাঁদে বা যেখানে প্রস্রাব ত্যাগ করে, সেইখানে সাদা দাগ ধরে. তাহা হইলে এই ঔষধ দিনে তিনবার দিবে।

সোহাগার খই মধুর সহিত মাড়িয়া জিহ্বা বা মুখে ঘা হইলে লাগাইবে। এক আঃ সোহাগার চার আঃ গ্লিসিরিণ মিশাইবে, এবং শিশুর পেটের অসুখ হইলে ইহা দশ বা বিশ ফোঁটা জলে মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

পটাশ ব্রোমাইড :—দুই গ্রেণ মাত্রায় শিশুর দাঁত উঠিবার সময় দেওয়া যায়। সিরাপে মিশাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। তিন মাসের শিশুর এই মাত্রা জানিবে। দুই বৎসরের বালককে ঘুম পাড়াইবার দরকার হইলে, বা যাহারা ঘুমাইয়া কাঁদে বা বকে, তাহাদের জন্য পাঁচ গ্রেণ শুইবার সময় খাওয়াইয়া দিলে বেশ সুনিদ্রা হয়।

রেড়ির তৈল :—ছয় মাসের ছেলের জন্য অর্দ্ধ চামচ (Table-spoon) তৈল খাওয়াইবে। অলিভ অয়েল কিংবা গ্লিসিরণ শিশুকে এক ছোট চামচ (Tea-spoon) খাওয়াইলে বেশ বাহ্যে হয়।

খড়ির গুঁড়া :—এ্যারোমেটিক্ চক্ পাউডার নামে এই ঔষধ, টকগন্ধযুক্ত দাস্ত হইলে ছয় মাসের শিশুকে পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় চার ঘণ্টা বাদ খাইতে দিবে।

কডলিভার অয়েল :—ইহা শিশুদিগের পক্ষে একটি খাদ্যবিশেষ। শিশু রোগা ও দুর্ব্বল হইতে থাকিলে ইহা খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। তিন মাসের শিশুকে আঙ্গুলে করিয়া এই ঔষধ চুষিতে দিবে। এক বৎসরের শিশুকে ছোট চামচের (Tea-spoon) এক চামচ তৈল দিনে দুইবার খাইতে দিবে; কিছু খাইবার পর

ইহা দেওয়া উচিত। ক্রমে যত বয়স বাড়িবে, মাত্রাও তত বাড়াইতে হইবে। কেপলার মল্‌ট এক্সট্রাক্ট শিশুদিগের পক্ষে ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

ডিল ওয়াটার বা মৌরীর জল ও পিপারমেণ্ট জল :—শিশুর পেট কামড়াইলে বা ফাঁপিয়া উঠিলে এক চামচ এই সব জলে গরম জল মিশাইয়া তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

গ্লিসিরিন্ :—শুইবার সময় এক চামচ খাওয়াইয়া দিলে শিশুর দাস্ত খোলসা হয়। দাস্ত না হইলে পিচকারী করিয়া চার ড্রাম গ্লিসিরিন্ অল্প গরম জলে মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী দিবে। পাঁচ মিনিট মধ্যে দাস্ত হইবে। সাবানের কাটি করিয়া বা পুরাতন তেঁতুল মলদ্বারে দিলেও দাস্ত হয়।

ইপিকাক্ ওয়াইন্ :—কাসি হইলে ইহা বিশেষ উপকার করে। ২।৩ ফোঁটা দুই ঘণ্টা অন্তর দিলে কাসি বেশ সরল হয় ও উঠিয়া যায়। বেশী মাত্রায় দিলে বমি হয়। সেজন্য হঠাৎ বমি করাইতে হইলে (যেমন হুপিং কফে বুকে বেশী সর্দ্দি বসিলে বা অধিক আহার করিলে) ইহা বিশেষ উপকারী।

কালমেঘ :—ছেলেদের পেটে লিভার বড় হইলে কালমেঘ পাতার রস খাইতে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে শিশুদের লিভার বড় হইলে মেয়েরা "আলুই" * করিয়া খাইতে দেন। ইহা বিশেষ উপকারী।

ম্যানা :—শিশুদের দাস্ত কঠিন হইলে ইহা ব্যবহার করিবে। বড় চামচের এক চামচ হিসাবে দুধের সহিত খাওয়ান যাইতে পারে।

এই সকল ঔষধ ছাড়া অন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। বাহ্য-প্রয়োগের জন্য নিম্নের কথাগুলি মনে রাখা কর্ত্তব্য। ছেলেদের ব্লিষ্টার দিবে না। লিনিমেণ্ট আইওডিনও ডাক্তারের পরামর্শমত ব্যবহার করিবে।

কম্প্রেস্ :—লিণ্ট বা ফরসা নরম নেকড়া জলে বা কোনও ঔষধদ্রব্যে ভিজাইয়া নিংড়াইবে। পরে তাহা যেস্থানে দিতে হইবে, তথায় লাগাইবে। তাহার উপর এক

---

* কালমেঘের পাতা দুই তোলা, যোয়ান, রাঁধুনী, বড় এলাইচ, লবঙ্গ এইগুলি প্রত্যেকটি দুই আনা পরিমাণে একত্রে বাটিয়া বড়ী করিবে, সেই বড়ী পাথর-বাটিতে জল দিয়া ঘসিয়া এক রতি পরিমাণে একটু মধুসহ এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালককে দিনে দুইবার খাইতে দিবে, ইহাতে জ্বর লিভারের দোষ নষ্ট করে। ইহাই আলুই।

কবিরাজ শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত কাব্যবিনোদ

খণ্ড অয়েল সিল্ক দ্বারা ঢাকিয়া পটি বাঁধিয়া দিবে। অবস্থাবিশেষে শীতল ও গরম জল ব্যবহার করিবে।

বোরিক্ কম্প্রেস্ :—ছেলেদের ফোঁড়া বা ক্ষতে বোরিক্ কম্প্রেস্ বিশেষ উপকারী। বোরিক্ এসিড্ গরম জলে গুলিয়া লিণ্ট দ্বারা সেক দিবে, পরে লিণ্টখানি চাপিয়া তাহার উপর অয়েল সিল্ক দিয়া বাঁধিয়া দিবে, ইহা বিশেষ উপকারী। পেটের উপর গরম জলে এইরূপ কম্প্রেস্ দিলে দাস্ত পরিষ্কার হয়।

মালিস :—ছেলেদের চামড়া বড়ই নরম। সেইজন্য তেজাল মালিস ভাল নয়, ফোস্কা হইতে পারে। সরিষার তৈলে কর্পূর দিয়া অথবা তৈল বা সাবানের মালিস ভাল। আস্তে আস্তে ছেলেদের গায়ে মালিস করিতে হয়।

মলম :—ঠোঁট বা গা ফাটিয়া গেলে হেজিলিন্ ক্রিম বা ভিনোলিয়া শিশুদিগের পক্ষে ব্যবহার করা ভাল। ভেসিলিন্ সস্তা ও উপকারী। কোনরূপ ক্ষত বা ঘায়ের জন্য "ভবানীপুর ষ্টার মেডিকেল হলে" প্রস্তুত "হিলিং অয়েণ্টমেণ্ট" বিশেষ উপকারী।

পুলটিস্ :—তিসি বা পাঁউরুটির পুলটিস্ ভাল। একেবারে গরম গরম দিবে না। সাবধান, যেন গা পুড়িয়া না যায়। পুলটিস্ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে আর রাখা উচিত নয়, উহা তুলিয়া ভাল করিয়া মুছাইয়া তুলি দিয়া বাঁধিয়া দিবে। কেহ কেহ পুলটিসের সহিত সরিষার গুঁড়া মিশাইয়া দেয়। এইরূপ পুলটিস্ শীঘ্রই উঠাইয়া লওয়া উচিত। নতুবা দেরী হইলে ফোস্কা হইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

আকস্মিক বিপদ্

বালক বালিকারা প্রায়ই ছুরি ও কাঁচি লইয়া খেলা করে ও নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলে। হঠাৎ কোন যায়গা কাটিয়া গেলে তখনই পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিবে।

কাটিয়া গেলে

একটু ট্যানিক এ্যাসিড্ লাগাইয়া দিবে ও ফরসা ন্যাকড়া দ্বারা বাঁধিয়া

দিবে। বেশী রক্ত বাহির হইলে, ক্ষতস্থানে তূলা রুমাল বা ন্যাকড়া বা অঙ্গুলির চাপ দিবে। তাহাতেও যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তবে ক্ষতের উপর দিকে দড়ি বা রুমাল দ্বারা সজোরে বাঁধিয়া দিবে, এবং ডাক্তার মহাশয়কে সংবাদ দিবে।

দগ্ধ হইলে:—গরম দুধ, জল বা প্রদীপের শিখা দ্বারা দগ্ধ হওয়া সম্ভব। ছেলেরা দিয়াশলাই লইয়া খেলা করে। তাহাতেও অনেক সময় বিপদ্ হয়। ছেলেদের জামা কাপড়ে আগুন লাগিলে তখনই তাহাকে শোয়াইয়া ফেলিবে, এবং তোষক, কম্বল প্রভৃতি চাপা দিলে আগুন নিবিয়া যাইবে। কিছু না পাইলে নিজেই তাহাকে চাপা দিবে বা মেজের উপরে গড়াগড়ি দেওয়াইবে। দগ্ধস্থানে মসিনার তৈল, নারিকেল তৈল বা অলিভ তৈল দিবে। চূণের জল ও মসিনার তৈল সমানভাবে মিশাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। তৎপরে তূলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে। বেশী যাতনা হইলে সোডা জলে গুলিয়া লাগাইবে। অথবা বোরিক্ অয়েণ্টমেণ্ট ও ইউক্যালিপ্টস্ তৈল বাঁধিয়া দিবে। খাইবার জন্য গরম দুধ ও একটু ব্র্যাণ্ডি দিবে।

শিয়াল, কুকুর বা সাপে কামড়াইলে:—ক্ষতস্থান চুষিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। যাহার দাঁত পান্‌সে নয় বা মুখে কোন ঘা নাই, এইরূপ কেহ চুষিলে কোন বিপদ হওয়ায় ভয় নাই। ক্ষতস্থানের উপরে একটি সূতা বা দড়ির তাগা বাঁধিবে। ক্ষতস্থান ছুরী দ্বারা একটু চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবে, তাহার পর একটু পটাশ পারমাংগানেট্ লাগাইয়া দিবে।

বিষাক্ত দংশন

বোল্‌তা, মৌমাছি হুল ফুটাইলে:—যাতনা বিষম হয়। হুলটি উঠাইয়া ফেলিবে, এমোনিয়া বা সোডাদ্রব্য, গ্লিসারিন্ বা সাবান লাগাইবে। কঠিন পদার্থ দ্বারা ব্যথার চারিধারে চাপ দিবে।

বিছা কামড়াইলে বড় যাতনা হয়। এমোনিয়া লাগাইলে ব্যথা কমিয়া

যায়। থেঁত হইলে, চামড়া ছিঁড়িয়া যাইতে পারে বা নাও পারে। অনেক সময়ে কালশিরা পড়িয়া যায়, ফুলিয়া উঠে ও ব্যথা হয়। শীতল জলের পটি বা বরফ লাগাইবে। অডিকলন লাগাইয়া বাঁধিয়া দিবে।

থেঁত হইলে

মচ্‌কাইলে :—বেশী নাড়াচাড়া করা অনুচিত। গরমজলে লবণ দিয়া জল সেক দিবে। ব্যথা কমিলে কোনরূপ মালিস দিবে। "পেন-কিলার" ব্যবহার করা উচিত। ছেলেদের হাত ধরিয়া বা মাথা ধরিয়া উচু করিবে না, কেন না, তাহাতে হাড়ের জোড়-গুলি মচ্‌কাইয়া যাইতে পারে।

মচ্‌কাইলে

হাড় মট্‌কাইয়া বা ভাঙ্গিয়া গেলে :—শিশু যাতনায় কাঁদিতে থাকে—সেই হাড় নাড়িলে যাতনা বাড়িয়া উঠে। এইরূপ হইলে যাহাতে শিশুর যাতনা যায়, এরূপ ভাবে হাত বা পা অন্য হাত বা পায়ের সহিত বাঁধিয়া চিকিৎসককে খবর দিবে বা হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিবে। চেঁচাড়ি বা মোটা কাগজ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে।

কানে পুঁতি, কলাই বা পোকা ইত্যাদি যাইলে :—একেবারে ডাক্তারকে সংবাদ দিবে। সোন্না দ্বারা বাহির করিবার চেষ্টা করিবে না; তাহাতে কানে বা নাকে ঘা হয় ও বিশেষ বিপদ্ হইতে পারে। কানে পুঁতি যাইলে, পিচকারী করিয়া আস্তে আস্তে গরম জল দিলে পুঁতি বাহির হইয়া আসে। এই রূপে আটটি পুঁতি আমি একজন শিশুর কান হইতে বাহির করিয়াছিলাম। জল লাগিলে কলাই ফুলিয়া উঠে; সুতরাং যেরূপে সম্ভব তখনই বাহির করিবে।

নাকে বা কানে কিছু ঢুকিলে

নাকের মধ্যে কোনও জিনিষ যাইলে :—ভাল নাকে এরূপভাবে পিচ-কিরী করিয়া জল প্রবেশ করাইয়া দিবে যে, যেন অপর নাকের মধ্যে

যে জিনিস আছে, জলের সহিত তাহা বাহির হইয়া আসে। খুব ছোট জিনিস হইলে নাকের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গলার মধ্যে পড়িতে পারে। মটর হইলে পিচকারী দিলে ফুলিয়া উঠে। সুতরাং পরে বাহির করা যাইবে বলিয়া রাখিয়া দিবে না।

চক্ষে পড়িলে

চক্ষে কিছু পড়িলে :—ধূলি বা পোকা পড়িলে কাগজের বা রুমালের কোণ পাকাইয়া বাহির করিবে। উষ্ণজলের ধারা দিবে। যদি ব্যথা বলে, এক ফোঁটা রেড়ীর তৈল দিবে ও শীতল জলের পটি বাঁধিবে।

গলায় আট্‌কাইলে

কোন জিনিস গলায় আট্‌কাইলে :—ছেলেরা অনেক সময় পয়সা, বোতাম, খেলনা খাইয়া ফেলে। বড় রুটির টুক্‌রা গলায় আট্‌কাইলে, আঙ্গুল দিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। যদি না পার, শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে, পা ধরিয়া ছেলের মাথা নীচের দিকে করিয়া ধরিবে, পিঠে চড় দিবে। পেটের মধ্যে গেলে বিশেষ কিছু করিবে না। বাহের জন্য রেড়ির তৈল দিবে না। দুধ ও পাঁউরুটি খাইতে দিবে। গলায় মাছের কাঁটা ফুটিলে আঙ্গুল দিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। ভাতের ডেলা করিয়া খাইতে দিবে।

বিষাক্ত কিছু খাইলে

বিষাক্ত হইলে :—অনেক খেলনায় লাল বা সাদা রং মাখান থাকে; দেশেলাই-কাটিতে বিষ মাখান থাকে। রং-করা কাগজ খাইলেও বিষ-ক্রিয়া দেখা যায়। লবণ-জল খাইতে দিবে। কিংবা সরিষার গুঁড়া গরম জলে গুলিয়া খাইতে দিবে। ছেলে যাহাতে বমি করে এরূপ করিবে এবং ডাক্তারকে সংবাদ দিবে।

জলে ডুবিলে :—জলমগ্ন হইলে ছেলেরা অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায়। সুতরাং তখনই জল হইতে উঠাইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিবে। পাঁচ

মিনিটের বেশী জলে ডুবিয়া থাকিলে বাঁচান সুকঠিন। কিন্তু বিশেষ যত্ন করাতে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও বাঁচিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। প্রথমতঃ মুখের মধ্য হইতে জল বাহির করিতে হইবে। অল্প সময়ের জন্য পা উঁচু ও মাথা নীচু করিয়া, ছেলেটিকে উপুড় করিয়া শোয়াইবে। মুখ যেন হাঁ করা থাকে এবং জিব একটু টানিয়া বাহির করিবে। তৎপরে চিৎ করিয়া রাখিবে। ছেলেটির দুইটি বাহু ধরিয়া একবার মাথার পাশে রাখ, আবার নামাইয়া বুক ও পেটের পাশে অল্প চাপিয়া ধর। এইরূপ এক ঘণ্টা চেষ্টা করিবে। গরম জল বোতলে পূরিয়া গা ঘষিয়া দেহ গরম করিবে। এ্যামোনিয়া শুঁকাইবে, ডাক্তার মহাশয়কে ডাকিবে।

জলে ডুবিলে

ঔষধের তালিকা :—চিকিৎসার জন্য যে সমুদায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

নাম	মাত্রা
টিং একোনাইট্ (Tincture Aconite)	½ হইতে ১ ফোঁটা
ব্রাণ্ডি (Brandy)	১০ ফোঁটা
সোডা-বাইকার্ব (Soda Bicarb)	৫—১৫ গ্রেণ
পটাস্ ব্রোমাইড্ (Potash Bromide)	২—৫ গ্রেণ।
রেড়ীর তৈল (Castor oil)	১—৪ ড্রাম
কড্‌লিভার অয়েল (Cod-liver oil)	½—১ ড্রাম
মৌরীর জল (Aqua anethi or Dill water)	১—২ ড্রাম
গ্লিসিরিন্ (Glycerine)	১—২ ড্রাম
ইপিকাক্-ওয়াইন্ (Vinum Ipecac)	২—৫ ফোঁটা
কালমেঘ (Ext. Kalmegha Liq)	৫—১০ ফোঁটা
ম্যানা (Manna)	১—২ ড্রাম
ক্যালোমেল (Calomel)	½—২ ড্রাম
স্যাণ্টোনিন (Santonine)	½—১ গ্রেণ
অলিভ অয়েল (Olive oil)	১—২ ড্রাম

নাম	নাম
বাহিরের প্রয়োগের জন্য :—	
বোরিক্ এসিড্ (গুঁড়া)—Boric Acid.	বোরিক্ মলম—Boric Ointment.
পেন কিলার—Pain Killer.	হিলিং ওয়েণ্ট্মেণ্ট—Healing Ointment
নারিকেল-তৈল—Cocoanut oil.	সরিষার তৈল—Mustard oil.
ক্ষত বাঁধিবার জন্য :—	
বাঁশের চটা, মোটা কাগজ—Splints.	বোরিক লিণ্ট—Boric Lint.
বোরিক তুলা—Boric cotton.	বোরিক গজ—Boric Gauge.
অয়েল সিল্ক—Oil Silk.	ব্যাণ্ডেজ—Bandge.

এই সমস্ত ঔষধ ভবানীপুর ১৫৬ নং হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ষ্টার মেডিক্যাল হলে এবং অন্যান্য ভাল ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

গৃহ-চিকিৎসা (২)

(হোমিওপ্যাথিক মতে)

কলিকাতার উত্তর বিভাগের অন্যতম সর্ব্বপ্রধান হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বরাট্ কর্ত্তৃক এই পুস্তকের জন্য লিখিত।

(যে যে লক্ষণ প্রকাশ হইলে যে যে ঔষধ উপযোগী, তাহা নিম্নে সূচিত হইল)

১। জ্বর

তরুণ জ্বর

১। শুষ্ক ও শীতল বাতাস লাগা, গাত্র ভিজা; ঠাণ্ডা লাগা, ভয় পাওয়া হেতু জ্বর। তরুণ জ্বর, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, শুষ্ক ও তাপ, গাত্র জ্বালা, কাসি, মাথা বেদনা, তিক্ত বমন, কোঁকান, খিট্‌খিটে স্বভাব। প্রস্রাব লাল ও অল্প অনিদ্রা। ঔষধ—একোনাইট ৬শ।

২। মুখ চোখ রক্তবর্ণ, মুখ শুষ্ক, গিলিতে কষ্ট, অনিদ্রা, হঠাৎ চম্‌কে

উঠা, অজ্ঞানাবস্থা, বিড় বিড় ক'রে বকা, চেঁচান এবং কন্‌ভাল্‌সন, ভুলবকা, আলোক অসহ্য, বিছানা হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা, অত্যন্ত মাথা বেদনা, গায়ে চিট্‌চিটে ঘাম, টক্ বা তিক্ত বমন, পাতলা সবুজ মল, পেট ফাঁপা, প্রস্রাব অল্প, অস্থিরতা, গা গরম, কিন্তু পা ঠাণ্ডা। ঔষধ বেলেডোনা ৩০শ।

ভুল বকা

৩। বেলা বারোটার পর কম্প দিয়া জ্বর, অত্যন্ত তৃষ্ণা, একটু একটু জল খাওয়া, গায়ের জ্বালায় শরীর জ্বলিয়া যাওয়া; অত্যন্ত অস্থিরতা; পেট জ্বালা; টক্ দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; পেটে প্লীহা থাকা; দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ মল; মুখ ফুলো ও ফ্যাকাশে বর্ণ, নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল। ঔষধ—আর্সেনিক ৩০শ।

কম্পজ্বর

৪। ছাড়িয়া ছাড়িয়া জ্বর হওয়া; একদিন অন্তর একদিন জ্বরের বৃদ্ধি; দিবাভাগে জ্বর হওয়া; সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া শীত। জল খাইতে শীত বৃদ্ধি; হাত পা ঠাণ্ডা, তাপাবস্থায় তৃষ্ণা না থাকা, গাত্রজ্বালা, মুখ ঠোঁট শুষ্ক, অত্যন্ত ক্ষুধা, ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা; ঘুম ঘুম ভাব; নড়াচড়াতে ঘর্ম্ম; ঘর্ম্মের পর দুর্ব্বল বোধ, কান ভোঁ ভোঁ করা, তিক্ত বমন, অরুচি, প্লীহা বৃদ্ধি, প্রস্রাব ঘোলা, উদরাময়, মলে আস্ত জিনিস থাকা। বুক ধড়্‌ফড়ানি, ম্যালেরিয়ার জ্বর, রাত্রে ঘর্ম্ম, মাথা বেদনা। ঔষধ—চায়না ৩০শ।

ছাড়িয়া ছাড়িয়া জ্বর

৫। রেমিটেণ্ট জ্বর; গ্রীষ্মকালের পীড়া, পিত্তপ্রধান ধাতু, শিরঃপীড়া শুষ্ক কাসি, কাসিতে বক্ষে বেদনা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, কোষ্ঠ বদ্ধ, গা বমি বমি, চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা, নড়া চড়ায় রোগের বৃদ্ধি, মুখ তিক্ত, ডিলিরিয়ম, বিষয়-কর্ম্মের কথা বলা, সমস্ত শরীর বেদনা। ঔষধ—ব্রাইয়োনিয়া ৩০।

রেমিটেণ্ট জ্বর

৬। বালকদিগের রেমিটেণ্ট জ্বর। পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু পীড়া। বমন, অরুচি, পেটে বেদনা, উদরাময়, অথবা কোষ্ঠবদ্ধ। জিহ্বা দুগ্ধের ন্যায় সাদা কোটিং যুক্ত; খিট্‌খিটে স্বভাব। খাবার একটু গোলযোগ হেতু জ্বর হওয়া। অল্প-বেগাপন্ন জ্বর। শিশু এত খিট্‌খিটে যে, তাকাইলে চটিয়া যায়। বমনেচ্ছা। ঔষধ—এণ্টিম্‌ক্রুড্‌ ৬শ।

জলে ভিজা প্রভৃতি কারণে

৭। জলে ভিজা হেতু পীড়া। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মুখ চোখ টস্‌ টস্‌ ভাব। প্রখর জ্বর। অস্থিরতা। সিক্ত স্থানে বাস হেতু পীড়া। উত্তাপ এত বেশী যে, মনে হয়, শিরার ভিতর গরম জল চলিতেছে। গাত্রে আম-বাত বাহির হওয়া। জ্বর-ঠুঁটো হওয়া। জিহ্বার অগ্রভাগ লাল। নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে মলত্যাগ, অল্পবিরাম জ্বর। পৃষ্ঠ, ঘাড়, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। কঠিন স্থানে শয়ন করিলে উপশম। অজ্ঞানতা। ডিলিরিয়াম। শিরঃপীড়া। ঔষধ—রস্‌টক্‌স্‌ ৩০শ।

ঘৃতাদি আহারের ফলে

৮। ঘৃত ও তৈলাদিযুক্ত আহার হেতু পীড়া। মৎস্য ও মাংস আহার জন্য পীড়া। পরিবর্ত্তনশীল পীড়া। অত্যন্ত কুইনাইন্‌ ব্যবহার করার পর পীড়া। নম্র স্বভাব, ভয় ও ক্রন্দনশীলতা। বেলা দুই তিনটার সময় হাত ও পা ঠাণ্ডা হইয়া জ্বর আসা। একটু একটু শীত করিয়া জ্বর আসা। তৃষ্ণাভাব। স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় বিশেষ উপকারী। মুখ তিক্ত। তিক্ত বমন। পিত্তযুক্ত মল রাত্রে বৃদ্ধি। বেদনাযুক্ত প্লীহা, রজঃবন্ধ। মুখে দুর্গন্ধ। ঔষধ—পস্‌সেটিলা ৩০শ।

৯। ম্যালেরিয়া জ্বর। জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসা। বেলা আট্‌টা নয়টার মধ্যে জ্বর আসা। হাড়-গোড়-ভাঙ্গা কম্পজ্বর। কম্পের সময়

তৃষ্ণা। তাপাবস্থায় পিত্তবমন। পিত্ত-জনিত জ্বর। পিত্ত ভেদ।

ম্যালেরিয়া — একদিন প্রাতে ও অন্ত দিন বারটায় জ্বর আসা। ঔষধ—ইউপেটোরিয়াম ৩শ।

১০। খ্যাত-খেঁতে শিশু কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চায়। পেটের

অন্যান্য উপসর্গযুক্ত জ্বর — অসুখযুক্ত জ্বর। নিদ্রায় চম্‌কে উঠা। বিজ্বর অবস্থা প্রায় হয় না। পেট ফাঁপা। কোঁতান। বমি করা। মুখে দুর্গন্ধ। কাসি। শিশুদিগের দন্ত উঠিবার সময় বিশেষ উপকারী। ঔষধ—ক্যামোমিলা ৩০শ।

১১। কুইনাইন্ আট্‌কান জ্বর। সর্ব্বদা গা বমি বমি। ফেনাযুক্ত শেওলার ন্যায় উদরাময়। আহারে অনিচ্ছা। গলা ঘড় ঘড়ানিযুক্ত কাসি। লাল রক্তস্রাব। ঔষধ—ইপিকাক্ ৩০শ।

১২। কুইনাইন্ ব্যবহারের ফলে অন্ত সময় জ্বর না আসিয়া বেলা দশটা এগারটায় শীত করিয়া জ্বর আসা, কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বরঠুঁটো থাকা, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি। তৃষ্ণা। নুন্ খাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা। শরীর শীর্ণ। ঔষধ—ন্যাট্রাম-মিউ ৩০শ।

১৩। কফপ্রধান ধাতু। মাথা ও পেট বড় এমন শিশু। দাঁত উঠিবার সময় পীড়া। মাথায় ঘর্ম্ম। টক্‌গন্ধযুক্ত সাদা মল। কোষ্ঠবদ্ধ। দাঁত উঠার সময় শিশুদিগের যকৃতের দোষ। মাথা গরম। হাত পা ঠাণ্ডা। ঔষধ—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৩০শ।

২। রক্তামাশা

পেটটি ফ্লানেল দ্বারা বাঁধিয়া রাখা উচিত। দরকার হইলে পুল্‌টীস্ দিতে পারা যায়।

রোগের বিবিধ উপসর্গ

১। প্রথমাবস্থায় জ্বরসহ আমাশা, পেটে ব্যথা, অত্যন্ত পিপাসা ও রক্ত বাহে, নাড়ীর প্রবল বেগ। ঔষধ—একোনাইট্ ৩শ।

২। জ্বর, যন্ত্রণাদায়ক কোঁথ, তাহার সহিত শরীর কাঁপিয়া উঠা, মুখ চোখ লাল, মাথায় যন্ত্রণা, পেটে এত বেদনা যে, হাত দিতে দেয় না। অনিদ্রা, মুখের ভিতর শুষ্ক। সবুজবর্ণ রক্তাক্ত আমযুক্ত মল। ঔষধ—বেলেডোনা ৬শ।

৩। জ্বরভাব, সাদা বা রক্তাক্ত আম, নিয়ত বৃথা মলত্যাগের চেষ্টা, কোঁথ বা বমি, নাঁড়ীর স্থানে ব্যথা, মদ্যপানের পর পীড়া। ঔষধ—নক্সভমিকা ৩০শ।

৪। রক্তমিশ্রিত মল, কোঁথ নাভির স্থানে মোচ্ড়ান ব্যথা; চাপিলে ও সাম্‌নে বাঁকিলে উপশম। ঔষধ—ক্যালোসিন্থ ৩০শ।

৫। শরৎকালের আমাশায়, খাদ্যের গন্ধে অসহিষ্ণুতা, বমনের উদ্বেগ বাহ্যের সহিত উকি বা বমন, কাঁচা ও অম্লফল খাইয়া আমাশা, রক্তাক্ত মল ও চক্‌চকে আম। ঔষধ—কলচিকম্ ৬শ।

৬। পেটে বেদনা, কুন্থন, ফেনাযুক্ত কালপানা সবুজবর্ণবিশিষ্ট রক্তাক্ত মল ও আম, সর্ব্বদা গা বমি, বমন, তৃষ্ণা-শূন্যতা, মলত্যাগের পর পেট-বেদনা ও কুন্থন। ঔষধ—ইপিকাক্ ৬শ।

৭। মল রক্তময় সবুজপানা, মিউকাস্‌যুক্ত, শ্লেষ্মাবৎ। অনেকক্ষণ পায়খানা বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা ও কোঁথ দেওয়া। ঔষধ—মার্কসল্ ৩০শ।

৮। পুনঃ পুনঃ, অল্প অল্প, রক্তময় আম, পেট-বেদনা ও কুন্থন। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা। অল্প অল্প প্রস্রাব। জ্বর। শুধু আম ও রক্ত বাহে। ঔষধ—মার্ককর ৩০শ।

৯। হলুদ, সাদা, লালপানা আম; তাহার মধ্যে রক্তের রেখা। সাদা-

পানা বা হলুদপানা কোটিং-যুক্ত জিহ্বা। মুখ তিক্ত,তৃষ্ণা না থাকা। রাত্রিতে বৃদ্ধি। অত্যন্ত কুন্থন বেগ। ঔষধ—পাল্‌সেটিলা ৬শ।

১০। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট-বেদনা, পরে কুন্থন। সাদা আমের মধ্যে রক্তের রেখা, সবুজপানা আম-যুক্ত মল। চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া পীড়া। প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিবামাত্রই পাইখানায় দৌড়ান। রক্ত, আম, পুঁয পড়া। পেটে সেকদিলে উপশম বোধ। রোগ সারিয়া একটু কোস্থ্র থাকা। ঔষধ—সাল্‌ফর ৩০শ।

পথ্যাদি

পথ্য।—পীড়ার বাড়াবাড়ি অবস্থায় বার্লী কিংবা এরারুট ভাল জলে সিদ্ধ করিয়া মিছরি বা লবণ সহ খাইতে দিবেন। (বার্লী অন্ততঃ এক ঘণ্টা সিদ্ধ হওয়া চাই)। বাহ্যে বারে কম, জ্বর না থাকা অবস্থায় ছাগ-দুগ্ধ, বার্লী কিংবা এরারুটের সহিত খাইতে দেওয়া যায়। ঘোল এ রোগের একটী সুপথ্য, কিন্তু জ্বর বেশী থাকিলে নিষিদ্ধ। পুরাতন রোগে, পোরের ভাত সুপথ্য। বেদানা কিংবা ডালিমের রস দেওয়া যায়। কচি বেল পোড়াইয়া মিছরি কিংবা চিনি সহ খাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

৩। উদরাময়

বিবিধ লক্ষণ

১। শিশুদের পিত্তভেদের সঙ্গে পেটবেদনা ও অস্থিরতা। জলবৎ কাল, সেওলার মত সবুজবর্ণ মল। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, মলত্যাগের সময় পেট বেদনা। ভয়, ক্রোধ ও ঘর্ম্ম বন্ধ হেতু পীড়া। পিপাসা। ঔষধ—একোনাইট্‌ ৩শ।

২। জলবৎ বহু পরিমাণ মল, জিহ্বায় সাদা কোটিং। তিক্ত পিত্তময় শ্লেষ্মাবমন। আহার ও পানের পর বৃদ্ধি। ঔষধ—এণ্টিম্‌ক্রুড্‌ ৬শ।

৩। মল ঘন, সবুজবর্ণবিশিষ্ট গাঢ় মিউকাস, কটা কিংবা কালবর্ণের জলবৎ মল। অসাড়ে মলত্যাগ, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, একটু জল খাওয়া, জল খাইলে তৎক্ষণাৎ বমন, ম্যালেরিয়া, উদরাময়। বেলা একটা হইতে রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি। ঔষধ—আর্সেনিক্ ৩০শ।

৪। সবুজপানা শ্লেষ্মাযুক্ত পাতলা মল, বেদনা হঠাৎ আসা ও যাওয়া, চমকে উঠা, মুখ চোখ রক্তবর্ণ। ঔষধ—বেলেডোনা ৩০শ।

৫। স্ক্রফিউলাধাতুগ্রস্তের পেটের অসুখ—পেট বড়, হাত পা শুষ্ক। মল [illegible] জলবৎ। পানাবস্থায় মাথায় ঘাম। পদদ্বয় ঠাণ্ডা। অজীর্ণ দুর্গন্ধ, পচা ডিমের মত মল। মেটে বর্ণের মল। টক্‌গন্ধযুক্ত মল। ঔষধ—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০।

৬। পচা গন্ধযুক্ত পাত্‌লা মল, অসাড়ে বাহে, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ। ঔষধ—কার্ব্ব ভেজ ৩০শ।

৭। বেদনাযুক্ত সবুজপানা জলবৎ মল। খিট্‌খিটে স্বভাব, রাত্রে পীড়ার বৃদ্ধি। ঔষধ—ক্যামোমিলা ১২শ।

৮। থস্‌থসে সাদা মল, নাক খোঁটা, ঘুমিয়ে দাঁত কিট্‌মিট করা, মলে ক্রিমি থাকা। ঔষধ—সিনা ৩০শ।

৯। বমির ইচ্ছা, সবুজ ও হল্‌দে রংএর শ্লেষ্মাযুক্ত বমি, মল ঘাসের মত সবুজবর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত ও ফেনাযুক্ত। পেটফাঁপা ও বেদনা। ঔষধ—ইপিকাক্ ৩০শ।

১০। কটা বর্ণের শ্লেষ্মাময় জলবৎ মল। নানাবিধ মস্‌লা, গরম ঔষধ ও মদ্যপান ইত্যাদি হেতু পীড়া। ঔষধ—নক্সভমিকা ৩০শ।

১১। প্রাতে ভেদ, পুরান উদরাময়। হলুদবর্ণের মল, মলত্যাগের সময় পট্ পট্ করিয়া আওয়াজ। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট ডাকা। ঔষধ—পডোফাইলাম্ ৬শ।

১২। রকম রকম মল। সবুজবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত মল। তৈলাদিযুক্ত আহার, মাংস আহার, ঘামের পর রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি, তৃষ্ণাশূন্যতা, মুখে পচাস্বাদ, আহারের পর মুখ তিক্ত, পেটফাঁপা ও বেদনা। ঘৃতের জিনিস খাইয়া পীড়া। ঔষধ – পাল্‌সেটিলা ৬শ।

১৩। হলুদ, কটা, সবুজ অজীর্ণ, পাতলা ও সাদা মিউকাস, দুর্গন্ধযুক্ত পচা মল হঠাৎ বেগে অসাড়ে নির্গত হওয়া। বেদনাশূন্য, প্রাতে ভেদ। প্রাতে উঠিবামাত্রেই পায়খানা যাওয়া, চর্ম্মরোগ বসিয়া উদরাময়। ঔষধ— সাল্‌ফার ৩০শ।

পথ্য। তরুণ উদরাময়ে এরারুট ও বার্লী খাইতে দেওয়া উচিত। (বার্লী অন্ততঃ এক ঘণ্টা সিদ্ধ হওয়া দরকার)। তরুণ উদরাময়ে দুধ দেওয়া ভাল নয়। বাহ্যের অবস্থা ভাল হইয়া হজম-শক্তি বাড়িলে মাগুর মৎস্যের ঝোল ও অন্ন-পথ্য দেওয়া যায়। টাট্‌কা ঘোল অনেক সময় দেওয়া যাইতে পারে। গাঁদালের ঝোলও একটি ভাল জিনিস। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া একটু একটু বেড়াইতে ও স্নান করিতে দেওয়া উচিত। ফুটন্ত দুগ্ধে লেবুর রস দিয়া ছানা কাটাইয়া, সেই ছানার জল, অর্থাৎ ছাকিয়া ছানা বাদ দিয়া যে জল বাহির হইবে, সেই জল লবণ কিংবা মিছরী সহ খাইতে দেওয়া যায়।

৪। অজীর্ণ দোষ

১। টক্‌ বা তিক্ত পদার্থ উদ্গার বা বমন। কোষ্ঠবদ্ধ, মুখে জল বা শ্লেষ্মা উঠা। আস্বাদন তিক্ত। নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা। ঔষধ— নক্‌সভমিকা ৬০শ।

২। মাংসাদি ও অতিরিক্ত ঘৃত মসলাদিযুক্ত আহারের দরুণ অজীর্ণ রোগ। আম সহ অতিসার, বিশেষতঃ রাত্রে। ঢেঁকুর উঠা। ঔষধ— পাল্‌সেটিলা ৩০শ।

৩। অক্ষুধা, জিহ্বার সাদা-দুধের মত ময়লা, উদ্গারে খাদ্যের আস্বাদন, বমন। ঔষধ—ক্রুটিম্‌ক্রুড ৩০শ।

৪। জিহ্বায় হলুদে ময়লা, পেটে শূল-ব্যথা, সবুজ অতিসার, ডিম্ ঘোলার মত মল। ঔষধ—ক্যামোমিলা ১২শ।

৫। টক্ বা তিক্ত ঢেঁকুর, গা বমি বমি, বমন, কোষ্ঠবদ্ধ, মুখে টক্ বা আস্বাদনশূন্য জল উঠা। ঔষধ—ব্রাইওনিয়া ৩০শ।

৬। অতিরিক্ত বরফ-জল পান বা পেট ঠাণ্ডা লাগিয়া অজীর্ণতা, অবসাদ, পিপাসা, চঞ্চলতা, অস্থিরতা, মৃত্যু-ভয়। ঔষধ—আর্সেনিক ৩০শ।

২। পেট ফাঁপা, অনেকক্ষণ পরে উদ্গার, মলে ভুক্তদ্রব্য থাকা। ম্যালেরিয়ায় রোগীর অজীর্ণতা। ঔষধ—চায়না ৩০শ।

৮। মুখ দিয়া জল উঠা, অম্বল-ঢেঁকুর, পেটের ডাক, পেটফাঁপা, দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ। ঔষধ—কার্ব্ব ভেজ ৩০শ।

৯। নাভির চতুর্দ্দিক্ ব্যথা, অসহ্য ক্ষুধা, পরিষ্কার জিহ্বা, গা বমি বমি করা। মুখে জল উঠা, রাত্রে দাঁতে দাঁতে কিড় কিড় শব্দ। ক্রিমির দোষ। ঔষধ—সিনা ৩০শ।

১০। অল্প আহার করিলেই পেট ফাঁপিয়া উঠা ও অধিক আহার বোধ, টক্ ঢেঁকুর উঠা, তলপেটে বায়ুসঞ্চার। ঔষধ—লাইকোপোডিয়াম্ ৩০শ।

১১। শেষরাত্রে অতিসার সহ অজীর্ণতা ও পেটফাঁপা। ঔষধ—সাল্‌ফার ৩০শ।

পথ্য।—অজীর্ণ রোগের পথ্যাপথ্য বাঁধা গতে চলে না। একের যাহা সহ্য, অন্যের তাহা অসহ্য; এই জন্য রোগীর অবস্থা বুঝিয়া কোন্ কোন্ জিনিস তাহার সহ্য হয় না জানিয়া, পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ কাঠের জালে পুরাতন চালের ভাত, টাট্‌কা মাগুর ও ছোট পোনার ঝোল ; সন্ধ্যায় যাহার যে জিনিস সহ্য হয়, তাহা খাওয়া উচিত। টাট্‌কা সুপক্ক ফল অনেক সময় বিশেষ উপকারী। স্রোতের জলে স্নান, সাঁতার খেলা, প্রফুল্ল-মনে থাকা, গীতবাদ্য শুনা, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সর্ব্বদা থাকিবার চেষ্টা করায় বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। চা, তামাক ও অন্য কোন মাদকীয় দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ।

৫। শিশুর দন্তোদ্গম

১। অতি শীঘ্র বা দেরীতে দাঁত উঠা, মাথায় ঘাম, সাদা এবং অম্লগন্ধযুক্ত মল, কোষ্ঠবদ্ধ, কর্ণে পুঁষ। ঔষধ—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৩০শ।

২। ঘুমাইলে মাথা ঘামা, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় রোগের বৃদ্ধি, কোষ্ঠবদ্ধ ছাগল-নাদির মত মল। ঔষধ—সাইলিসিয়া ৩০শ।

৩। সবুজ বা রক্তাক্ত মল, অনেকক্ষণ ধরিয়া বাহ্যে করা, কোঁথপাড়া। ঔষধ—মার্কারি ৩০শ।

৪। শূলব্যথা, চাপে উপশম। ঔষধ—কলোসিন্থ ৩০শ।

৫। বাহ্যের সময় পট্‌ পট্‌ করিয়া আওয়াজ, হলুদ রংএর পাতলা বাহ্যে, মলদ্বার বাহির হওয়া। ঔষধ—পডোফাইলাম ৩০শ।

৬। স্নায়বিক উত্তেজনা, মুখ লাল, জ্বর, কন্‌ভাল্‌সন, গায়ে আটা আটা ঘাম ; চম্‌কে উঠা। সবুজ রংয়ের পেটের পীড়া। ঔষধ—বেলেডোনা ৩০শ।

৭। কৃমিধাতুগ্রস্ত শিশু ; খিট্‌খিটে স্বভাব। মলে কৃমি থাকা। ঔষধ—সিনা ৩০শ।

জ্বর—একোনাইট্‌, ক্যামোমিলা, জেল্‌স, বেলেডোনা।

অতিসার—ক্যামো ১২শ, চম্‌কে উঠা, পেটে চিম্‌টি মারা ব্যথা, তরল আম, হল্‌দে বা সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত মল। সর্ব্বদা খ্যাঁতখেঁতে ভাব, কোলে উঠিয়া বেড়াতে চাওয়া।

কোষ্ঠবদ্ধ—ব্রাইওনিয়া, নক্স, সল্‌ফার।

৬। হাম

হামের চিকিৎসা।—রোগীকে পৃথক্ বিছানায় রাখা কর্ত্তব্য।

১। প্রথমাবস্থায় কাসি, সর্দ্দিসহ জ্বর, অস্থিরতা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অবস্থায়, ঔষধ—একোনাইট্ ৬শ।

২। দেরিতে ইরাপ্‌সন্ উঠা, জ্বরের সময় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা, কন্‌ভাল্‌সনের সম্ভাবনা থাকিলে ঔষধ—জেল্‌সিমি ৩০শ।

৩। জ্বর, মুখ চোখ রক্তবর্ণ, গলার মধ্যে বেদনা, শুষ্ক কাসি ও ডিলিরিয়াম্ থাকিলে ঔষধ—বেলেডোনা ৩০শ।

৪। শুষ্ক ও বেদনাযুক্ত কাসি, কাসিতে গেলে বক্ষঃস্থলে লাগা, হঠাৎ হাম মিলাইয়া যাওয়া, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি অবস্থায়, ঔষধ—ব্রাইওনিয়া ৩০শ।

৫। কপালে বেদনা, অত্যন্ত সর্দ্দি ও চক্ষু দিয়া জল পড়া, আলোক দেখিতে কষ্ট প্রভৃতি অবস্থায়, ঔষধ—ইউফ্রেসিয়া ৬শ।

পথ্য। হামের সময় প্রায়ই পেটের অসুখ হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য লঘু পথ্য দেওয়া উচিত। সাগু এরারুট কিংবা বার্লির সহিত অল্পমাত্রায় দুগ্ধ মিশাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। অত্যন্ত পাতলা বাহ্যে হইতে থাকিলে দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিবে।

রোগীর যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

৭। বিছানায় প্রস্রাব

এজন্য শিশুকে মারধর্ করা উচিত নয়। রাত্রিতে দুই তিনবার উঠাইয়া প্রস্রাব করান ভাল।

১। নিদ্রাবস্থায় চেঁচাইয়া উঠা। মধ্যরাত্রি ও ভোরের বেলায় মূত্রত্যাগ। ঔষধ বেলেডোনা ৩০শ।

২। রাত্রিতে নিদ্রার প্রথমভাগে। শীতকালে দিনে ও রাত্রে। টন্সিলের পুরাতন বৃদ্ধি অবস্থায়, ঔষধ—কষ্টিকম্ ৩০শ।

৩। কৃমির লক্ষণ, দাঁত কিট্ কিট্ করা বা রাক্ষুসে ক্ষুধা। দিনে অনেকবার প্রস্রাব, প্রস্রাবে কড়া গন্ধ। ঔষধ—সিনা ৩০শ।

৮। কাসি

১। ঘড়ঘড়ে কাসি, বমনের উদ্বেগ, দমবন্ধভাব। বমন। ঔষধ—ইপিকাক্ ৩০শ।

২। শুষ্ক কাসি, অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ ইত্যাদি। ঔষধ—নক্সভমিকা ৩০শ।

৩। ঘন ঘন শুষ্ক কাসি, কাসিলে বক্ষঃস্থলে লাগা। আহারের মধ্যে ও পরে কাসির বৃদ্ধি, কোষ্ঠবদ্ধ। ঔষধ—ব্রাইওনিয়া ৩০শ।

৪। বিছানায় শুইলে কাসি বৃদ্ধি। ঔষধ—হায়সায়ামাস্ ৩০শ।

৯। কর্ণশূল

১। রোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর থাকিলে। ঔষধ—একোনাইট্ ৬শ।

২। উত্তাপে ব্যথার বৃদ্ধি, কতকটা শক্তভাব, পুঁষ হইবার সম্ভাবনা, রাত্রে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ঔষধ—মার্কিউরিয়াস্ ৩০শ।

৩। পুঁষ হইলে; ঔষধ—হিপার সাল্ফার ৩০শ।

১০। চক্ষুপ্রদাহ

১। জ্বর থাকিলে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে, ঔষধ—একোনাইট্ ৬শ।

২। চক্ষু অত্যন্ত লাল, ব্যথাযুক্ত শুষ্ক বা জ্বালাযুক্ত। আলো অসহ্য ও চক্ষু হইতে জল পড়া ঔষধ—বেলেডোনা ৬শ।

৩। আঘাত লাগিয়া পীড়া হইলে। ঔষধ—আর্ণিকা ৩০শ।

৪। চক্ষুতে অত্যন্ত ব্যথা, ক্ষত, স্রাব ও আলোতে কষ্ট। ঔষধ—মার্কিউরিয়াস্ ৩০শ।

১১। দাঁত কন্‌কনানি

১। ঠাণ্ডালাগা হেতু জ্বরভাবাপন্ন। প্রথমাবস্থায় ঔষধ—একোনাইট্ ৬শ।

২। মাথা পর্য্যন্ত দপ্‌দপানি ব্যথা হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। ক্ষয়া দাঁতগুলি লাগার মত ব্যথা—ঔষধ—বেলেডোনা ৩০শ।

৩। ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া, চক্ষু, কর্ণ ও মাথা পর্য্যন্ত বেদনা। ঠাণ্ডা, উত্তাপে ও নড়নচড়নে বৃদ্ধি। ঔষধ—ক্যামোমিলা ৩০শ।

৪। মাড়ী ও গাল ফোলা। ব্যথা, ঘাড় ও কাঁধ পর্য্যন্ত ব্যাপক। দাঁত লম্বা ও নড়চড় হওয়া বোধ, ছুঁইলে উত্তাপ, বিছানার গরমে বৃদ্ধি। মুখ দিয়া লাল পড়া। ঔষধ—মার্কিউরিয়াস্ ৩০শ।

৫। ছিঁড়িয়া যাওয়ার মত ও জ্বালাযুক্ত ব্যথা। চোক, কান ও মাথা পর্য্যন্ত বেদনা। ব্যথা চলে চলে বেড়ান। ঔষধ—পাল্‌সেটিলা ৩০শ।

যে সকল পীড়া ও ঔষধের কথা লেখা হইল, তদ্বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার।

১। ঔষধগুলির যে যে শক্তি প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করিলাম, যদি সেই সেই শক্তির ঔষধ গৃহে না থাকে, কিংবা যদি আমার নির্দ্দিষ্ট শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফল ভালরূপ না হয়, তবে সেই ঔষধের অন্য কোন শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারিবে।

২। পীড়াগুলির যে যে লক্ষণে বিশেষ বিশেষ ঔষধের প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা গিয়াছে, তাহার সকল লক্ষণ যদি রোগীর নাও থাকে,—প্রধান প্রধান কয়েকটি লক্ষণ থাকিলেই সেই ঔষধ সেবন করাইবেন।

৩। এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে এক ফোঁটা ঔষধে জল মিশাইয়া চারি বারের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবেন। তাহার ঊর্দ্ধে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এক ফোঁটা ঔষধ দ্বারা সেই ভাবে দুই মাত্রা প্রস্তুত হইবে। পাঁচ বৎসরের উপরে এক এক ফোঁটায় এক এক মাত্রা। এক এক ফোঁটায় এক এক আউন্স (আধ ছটাক) জল।

গৃহ-চিকিৎসা (৩)

(কবিরাজী মতে)

দেশ-বিখ্যাত কবিরাজ বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ
সেন বিদ্যাভূষণ, এম্-এ মহাশয়ের দ্বারা
এই পুস্তকের জন্য লিখিত।

সদ্যোজাত শিশুর পরিচর্য্যা:—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার গাত্রের জরায়ু অর্থাৎ শ্লৈষ্মিক আবরণ এবং মুখ সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতদ্বারা বিশোধিত করিয়া, শিশুর মস্তকে ঘৃতাক্ত তুলকবর্ত্তি প্রদান করিতে হইবে। তাহার পরে "নাড়ীকাটার"র পালা। সুবর্ণ, রৌপ্য অথবা লৌহদ্বারা প্রস্তুত অস্ত্রেই নাড়ী কাটা প্রশস্ত। অতঃপর শীতল বা (কোষ্ণ) জলে শিশুর

গাত্র বেশ করিয়া পরিষেক অর্থাৎ ছিটা দিয়া ধুইবে। তাহাতে শিশু স্ফূর্ত্তি পাইবে। শিশু এইরূপে আপ্যায়িত হইলে, তাহাকে অনন্তা ও ব্রাহ্মীর রস, সুবর্ণভস্ম, মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা লেহন করাইতে হইবে। অতঃপর যথাকালে শিশুকে বেশ করিয়া তৈল মাখাইয়া কোষ্ণজলে স্নান করাইতে হইবে। এই জল প্রস্তুত করার প্রণালী। হয় বটাদি ক্ষীরবৃক্ষের বল্কল সিদ্ধ করিয়া অথবা রৌপ্যখণ্ড বা স্বর্ণখণ্ড উত্তপ্ত জলের মধ্যে ফেলিয়া অথবা কপিত্থের পত্র সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

প্রসবের পরে সাধারণতঃ দুই তিন দিবস বাদে চতুর্থ দিনে বা কখনও তৃতীয় দিনে প্রসূতির স্তনে স্তন্যের প্রবর্ত্তন হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রথম দিনে তিনবার মাত্র অনন্তার রস, মধু ও ঘৃত পান করিলেই যথেষ্ট হয়। দ্বিতীয় দিনে এবং আবশ্যক হইলে তৃতীয় দিনে লক্ষ্মণামূলসিদ্ধ ঘৃত পান করাইতে পারিলে ভাল হয়। এই লক্ষ্মণামূল বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য না হইলেও দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য, ইহার মূল্যও অত্যধিক। সাধারণপক্ষে একটু একটু মধু অবলেহন এবং জলের সহিত মিশাইয়া দুগ্ধ জ্বাল দিয়া তাহা সদ্যোজাত শিশুকে আবশ্যকমত দেওয়া হইয়া থাকে। জলের সহিত মিশাইয়া দুগ্ধ জ্বাল দিবার উদ্দেশ্য যে, দুগ্ধ জ্বালে গাঢ় হইলে গুরুপাক হয়, কিন্তু জল মিশাইয়া জ্বাল দিলে আর গাঢ় হইতে পারে না, কাজেই গুরুপাক হইবার আশঙ্কা থাকে না। প্রসূতির স্তনে স্তন্যের প্রবর্ত্তন হইলে তাহাই সন্তানের পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু ঐ স্তন্য কোন কারণে দূষিত হইলে, সুলক্ষণা বৎসলা ধাত্রী (স্তন্য পরীক্ষাপূর্ব্বক) নিয়োজিত ক ৷ আবশ্যক।

ছোট ছোট স্তন্যপায়ী শিশুকে বিশেষ করিয়া ঔষধ সেবন করাইবার দরকার হয় না। স্তন্যপায়ী শিশুর কোনও অসুখ হইলে সাধারণতঃ তাহাকে

কোনও ঔষধ না দিয়া তাহার মাতাকে বা ধাত্রীকে সেই সেই রোগের ঔষধ সেবন ও তজ্জন্য পালনীয় নিয়মের অধীন রাখিলেই শিশু রোগমুক্ত হয়। তাহাতে না উপকার হইলে মাতাকে বা ধাত্রীকে নিয়মাধীন রাখিয়া মাতার বা ধাত্রীর স্তনে সেই সেই রোগের ঔষধ মাখাইয়া দিতে হয়। শিশু স্তন্য-পান করিবার সময় স্তনের সহিত উক্ত স্তনলিপ্ত ঔষধ গলাধঃকরণ করিবে। তাহাতেই ফল হইবে। ইহাতেও সুবিধামত ফল না হইলে তখন স্তন্য বা মধু দ্বারা তরল করিয়া লেহন বা পান করাইয়া দিতে হয়। অধিক-বয়স্ক লোকের যে যে পীড়ায় যে যে ঔষধ ব্যবস্থেয়—শিশুদিগকেও তত্তৎ ঔষধ উপযুক্ত কম মাত্রায় দিতে পারা যায়। কেবলমাত্র শিশুদিগের জন্য বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত ঔষধ আছে। ঔষধের কথা পরে বলা যাইবে।

ঔষধের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। ঔষধ যে যে দ্রব্যে প্রস্তুত, তাহাদের বীর্য্য, রোগীর শারীরিক বল, বয়স ও রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিতে হয়। তবে মোটামুটি ভাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, একমাস বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে এক রতি মাত্রায় ঔষধ মধু, দুগ্ধ বা ঘৃতাদির সহিত মিশাইয়া অবলেহন করাইতে হয়। ইহার পরে এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতি মাসে এক এক রতি করিয়া বাড়ান যাইতে পারে। এক বৎসরের পরে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে এক মাষা করিয়া বাড়াইয়া বাড়াইয়া ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইলে পূর্ণমাত্রায় ঔষধ প্রযুক্ত হইবে।

এখানে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই মাত্রা কেবলমাত্র মৃদুবীর্য্য ঔষধের পক্ষেই খাটিবে। সকল স্থলেই বিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে মাত্রা স্থির করা কর্ত্তব্য এবং একান্ত দায়ে না পড়িলে শিশুকে বিরেচন, বমন ও বস্তি প্রয়োগ করিতে নাই।

জ্বরাদি রোগের সাধারণ কতকগুলি মুষ্টিযোগ মাত্র নিম্নে কথিত হইল:—

১। জ্বর হইলে তুলসীপাতার রস, শেফালিকাফুলের পাতার রস, বা ক্ষেৎপাপড়ার ঘুসড়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চিরতার জল বিশেষ উপকারী।

২। সর্দ্দিতে—আদার রস মধুসহ এবং কাসি হইলে গোলমরিচ-চূর্ণ মধুসহ উপকারী। দুই অবস্থায়ই গরম জল সেব্য।

৩। পেটের অসুখে কচি বেল পোড়া ও ইক্ষুগুড় অথবা গান্ধালের ঝোল উপকারী।

৪। কাণ পাকিলে—সৈন্ধবসহ ছাগদুগ্ধ ঈষৎ গরম করিয়া তাহার তিন চার ফোঁটা কাণের মধ্যে ঢালিয়া দিলে উপকার হয়।

৫। জ্বরের বেগ অত্যন্ত অধিক হইয়া দাহ হইলে—রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া তাহার নাভির উপরে কাংস্যাদি নির্ম্মিত পাত্র রাখিয়া তাহাতে জলের ধারা দিলে দাহ প্রশমিত হয়।

৬। পেট গরম হইয়া জ্বর হইলে গুড় বা সৈন্ধব সহ হরীতকী সেবন করিলে উপকার হয়।

৭। ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাতঃকালে ঘৃতসহ রসোন সেবন অথবা হরীতকী ও মধু অথবা সেফালিকা ফুলের পাতার রস সেবনে উপকার হয়।

৮। টাইফয়েড জ্বরে, জ্বরের চিকিৎসার প্রাধান্য না দিয়া অগ্ন্যুদ্দীপক ঔষধের প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। পেট গরম হইয়া জ্বর হইলে তাহার চিকিৎসা এরূপ স্থলে প্রযোজ্য।

৯। আমাশা, ও অজীর্ণজনিত পাত্‌লা দাস্ত হওয়াকে সাধারণতঃ 'আমাশা' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, ইহা আমাশয়োত্থ রোগ বলিয়াই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই রোগই একটু বেশী রকমের হইলে অথবা তাহার সহিত বমনাদি উপদ্রব থাকিলে সাধারণতঃ কলেরা

নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই দুই রোগেই ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং প্রথম হইতেই বিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য।

১০। দন্তশূলে মধু, পিপ্পলী ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে উপকার হয়।

১১। গলনালী ফুলিলে গরম জল পান এবং আদা, গোলমরিচ প্রভৃতি ঝাল দ্রব্য সেবনে উপকার হয়।

১২। ফোঁড়া হইলে—ময়দায় বা মসিনার পুলটিস্ অথবা তোপমারি জল দিয়া লাগাইলে ফোঁড়া পাকিয়া নিজেই গলিয়া যায়।

১৩। খোস হইলে—নিমের বা চালমুগরার তৈল উপকারী।

১৪। দদ্রুরোগে রসাঞ্জন ও চাকুন্দবীজ কপিত্থের রসে অথবা করঙ্গবীজ, চাকুন্দে বীজ ও কুড়, গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

১৫। হঠাৎ কোনও স্থান কাটিয়া গেলে দূর্ব্বার বা গান্দাফুলের পাতার রস দিয়া চাপিয়া ধরিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়। জলপটি দিলেও রক্ত বন্ধ হয়।

১৬। হজম ভাল না হইলে উপবাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। উপবাস অসহ্য হইলে ভোজনের পূর্ব্বে সৈন্ধবলবণ ও আদা সেবন করিলে পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পায়। গুড়ের সহিত হরীতকী অথবা শুণ্ঠী সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ দূর হয়।

১৭। স্ত্রীরোগে স্রাব কম হইলে জবাফুল কাঁজী (অম্লজল) দ্বারা পেষণ করিয়া সেবন করিলে স্রাব প্রবর্ত্তন হয়। স্রাব বেশী হইলে বাসকের রস, চিনি ও মধুসহ অথবা অশোকের রস মধুসহ সেবন করিলে উপকার দর্শায়। রসাঞ্জন ও কাঁটানটের মূল আতপচাউল চূর্ণ ভিজান জল এবং মধুসহ সেবনে অতিস্রাব বন্ধ হয়।

১৮। ক্ষিপ্ত শৃগাল বা কুকুরে কামড়াইলে দষ্টস্থান বেশ করিয়া চিরিয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব করাইতে হইবে। পরে গরম ঘৃত দ্বারা সেই স্থান বেশ করিয়া ধৌত করিয়া তাহাতে শিরীষ প্রভৃতি বিষনাশক দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। রোগীকে পুরান ঘৃত পান করাইবে, পুরান ঘৃত ও অর্কক্ষীর মিশ্রিত করিয়া বিরেচন দিবে এবং কেবল দুগ্ধ (কোনও মতে গব্যঘৃত) সহ অন্নপথ্য দিবে।

কৃষি-পঞ্জিকা

(শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃষিবিভাগের সর্ব্বোচ্চ
ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার মহাশয়
কর্ত্তৃক এই পুস্তকের জন্য লিখিত)

বৈশাখ

ওল, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা (পালা) এই মাসে বপন করা উচিত। শশা, বিলাতী কুমড়া, লাউ, পুঁই, ডেঙ্গো-নটে প্রভৃতি শাকের বীজ এখনও বপন করা চলে, কিন্তু একটু দেরী হইয়া গিয়াছে।

ওল ঃ—হাবড়ার নিকটে সাঁতরাগাছির ওল অতি উত্তম। ওলের গায়ে যে ছোট ছোট গাঁট বা মুখী হয়, তাহাই বীজরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাটী দোআঁশ, হাল্‌কা ও উচ্চ হওয়া দরকার। শীতের ওল বৈশাখমাসে রোপণ করিতে হয়, নতুবা মাসের শেষে ক্ষেতে বসাইতে হয়। এক হাত অন্তর মুখী বসান উচিত। মুখী অঙ্কুরিত হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া দরকার, পরে আর জল দিবার আবশ্যক নাই। জমীতে এক বৎসর থাকিলেই ওলের আকার বেশ বড় হয়; তবে পাঁচ ছয়মাস পর হইতেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। শীতকালে

ওল-গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া ক্রমে মারা যায় এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে আবার নূতন গাছ বাহির হয়। ওলের গোড়ায় যাহাতে জল না জমে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। নিম্ন—স্যাঁতসেঁতে জমীতে ওল জন্মিলে সেই ওলে ছিবড়া হয় এবং তাহাতে মুখ কুট্‌কুট্‌ করে।

চিচিঙ্গা ঃ—লতা গাছ, সুতরাং মাচায় তুলিয়া দেওয়া হয়। মাচার নিম্নে ৩।৪ হাত অন্তর মাদা করিয়া চৈত্রের শেষ হইতে আষাঢ় মাসের প্রথম পর্য্যন্ত বীজ বপন করা যাইতে পারে। আগে পুঁতিলে বর্ষাকালে ফল ধরে, নতুবা আশ্বিনে ফল ধরে। এক প্রকার তিক্ত চিচিঙ্গা আছে, তাহার গাছ ক্ষেত্রে জন্মিলে তুলিয়া ফেলা উচিত এবং বিশ্বাসী লোকের নিকট হইতে বীজ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য; নতুবা তিক্ত বীজ লাগাইয়া কোন ফল নাই।

পালা ঝিঙ্গা ঃ—বাঙ্গালায় সাধারণতঃ দুই প্রকার ঝিঙ্গা হইয়া থাকে—ভুঁই-ঝিঙ্গা ও পালা-ঝিঙ্গা। ভুঁই-ঝিঙ্গার গাছ বেশী লম্বা হয় না, তাই অনায়াসে মাটীতে লতাইয়া থাকে। কিন্তু পালা-ঝিঙ্গার গাছ অধিক দীর্ঘ হয় বলিয়া উহাদিগকে মাচায় তুলিয়া দিতে হয়। বৈশাখ মাসের মধ্যেই পালা ঝিঙ্গা বপন করা উচিত। মাচার নিম্নে ৪।৫ হাত অন্তর মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ৪।৫টি বীজ বপন করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া দরকার। পালা-ঝিঙ্গার ফল খুব লম্বা হয়। পুষ্করিণীর ধারে গাছ পুঁতিয়া জলের উপরে মাচা করিয়া দিলে, গাছ খুব তেজাল হয় এবং তাহাতে ফলও অধিক ধরে। এক প্রকার ঝিঙ্গা অতিশয় তিক্ত, সেই জন্য বিশ্বাসী লোকের নিকট হইতে বীজ সংগ্রহ করা ভাল।

ভুট্টা ঃ—ভুট্টা বারমাসই জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালায় ভুট্টা-চাষের প্রচলন নাই। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর এবং মুখরোচক। বাগানে কতক-গুলি লাগাইয়া রাখা ভাল।

বৈশাখ মাসে বীজ বপন করা উচিত। জমী উত্তমরূপে খুঁড়িয়া এক হাত অন্তর বীজ বপন করিয়া মাটী চাপা দিবে। পরে পাঁচ ছয় দিন ছেঁচ দিলেই চারা বাহির হইবে। তাহার পরে মাসে ২।৩ বার ছেঁচ দিলেই যথেষ্ট। বপনের দুই মাস পরে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। পাটনাই বীজ অপেক্ষা মার্কিণ বীজ ভাল। গাছ অতিশয় তেজাল হইয়া উঠিলে ফলন কমিয়া যায়। এইরূপ হইলে গাছের মাথা ছাঁটিয়া দেওয়া ভাল। গাছের গোড়া ও কাণ্ড হইতে ছোট ছোট ফেঁকড়ি জন্মিলে, সেগুলি ভাঙ্গিয়া দিবে। ভুট্টা গাছে সার দেওয়া বিশেষ দরকার। গোবর সার প্রয়োগ করাই ভাল।

জ্যৈষ্ঠ

লাউ, কুমড়া, ঢাঁড়স, পালা :ঝিঙ্গা, পালা শসা, বর্ষাতি মুলা প্রভৃতির বীজ এই মাসে বপন করা হয়। শাঁক আলু বৈশাখের শেষ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত লাগাইতে পারা যায়। জল্‌দি ফুল-কপির বীজ এই সময় হাপরে বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিতে পারিলে, খুব জল্‌দি ফুলকপি পাওয়া যাইতে পারে।

কুমড়া (বিলাতী)ঃ—বিলাতী কুমড়া প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। একজাতি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে, অন্য জাতি আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এবং অন্য প্রকার শীতকালে কাত্তিক হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে। বর্ষাতি কুমড়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলে। এই বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করা উচিত। বপন করিবার পূর্ব্বে বীজগুলিকে এক রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখা ভাল। হুঁকার জলে বীজ তিন ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে বীজে পোকা ধরিয়া অঙ্কুর বাহির হইবার পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া যায় না।

ক্ষেত্রে ৭।৮ হাত অন্তর মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ২।৩টি করিয়া বীজ বপন করিবে। চারা গাছে প্রতিদিন প্রাতে অথবা সন্ধ্যার সময় জল দিতে হয়। বর্ষা আরম্ভ হইলে আর জল দিবার দরকার নাই।

বর্ষাতি কুমড়ার জন্য মাচা দরকার। নতুবা অন্য জাতীয় ফসলের জন্য মাচা দরকার হয় না, মাটীর উপরে গাছে ফল ধরে। কুমড়ার সকল ফুলে ফল ধরে না, এ কথা সকলেই জানে। 'রাড়া' ফুলগুলি গৃহস্থ ভাজিয়া খাইয়া থাকে।

কুমড়া পাকিয়া পুষ্ট হইলেই তাহাকে আর গাছে রাখা উচিত নহে, তখন গৃহে আনিয়া দড়ির শিকায় ঝুলাইয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত ঠিক থাকে। বর্ষার সময় কুমড়া গৃহস্থের প্রধান তরকারী।

লাউ ঃ—লাউ সাধারণতঃ দুই জাতীয়—এক জাতি চৈত্র-বৈশাখে জন্মে এবং অন্য প্রকার শীতের সময় অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে জন্মে। শীতের লাউ খাইতে সুস্বাদু।

লাউয়ের বীজ মাদায় বপন করিবে। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে এক রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। মাদার মাটী খুব গভীর করিয়া খুঁড়িয়া তাহার সহিত গোবর সার মিশাইয়া দিবে। লাউএর মাচা করিয়া দিতে হয়, অথবা গৃহের ছাদে বা চালের উপর গাছ তুলিয়া দিতে হয়। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় জল জমিতে দেওয়া উচিত নহে। সেইজন্য বর্ষার পূর্ব্বে গোড়ায় মাটী দিয়া ভরাট্ করিয়া দিবে। পুষ্করিণীর ধারে গাছ পুঁতিয়া জলের উপর মাচায় গাছ তুলিয়া দিলে গাছে অধিক ফল ধরে। যে লাউ আকারে লম্বা এবং দেখিতে খুব সাদা নহে, তাহাই অধিক সুস্বাদু ও উপকারী। ৩।৪ মাসের মধ্যেই গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে এবং মাঘ মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

মূলা (বর্ষাতি) ঃ—বর্ষাতি মূলার বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসেই বপন করা উচিত। বর্ষাতি মূলা শীতের মূলার মত আকারে বড় হয় না, কিন্তু খাইতে বেশী মিষ্ট ও স্বাদু।

মূলা মাটীর মধ্যে জন্মায়, সেইজন্য ইহার মাটী খুব হাল্‌কা ও একটু বালিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। খুব গভীর করিয়া খনন করিয়া মাটী বেশ ঝুরা-ঝুরা করিতে হয়, নতুবা মাটী কঠিন থাকিলে, মূলা বড় হয় না। মূলার পাট সহজ নহে, তাই খনার বচনে আছে :—

"শতেক চাষে মূলা। তার অর্দ্ধেক তুলা॥"

গোয়াল-ঘরের জঞ্জাল এবং গোবর সার মূলার পক্ষে ভাল। জমীতে আধ হাত অন্তর সারবন্দি ভাবে বীজ ছিটকাইয়া দিতে হয়। মূলার বীজ অতিশয় ছোট; সেইজন্য চারি গুণ ঝুরা মাটীর সহিত বীজ মিশাইয়া লইয়া জমীতে ছিটাইয়া দিলে বীজ বেশ সমভাবে সকল স্থানে ক্ষেত্রে পড়ে, নতুবা একস্থানে অধিক ও অন্যস্থানে অল্প পরিমাণে বীজ পড়িবার সম্ভাবনা। গাছগুলি ঘন হইয়া বাহির হইলে, পাঁচ আঙ্গুল অন্তর গাছ রাখিয়া বাকি গাছ গুলি চারাইয়া দেওয়া উচিত। গাছে ১০।১২ দিন অন্তর জল দেওয়া দরকার।

দেশী মূলার মধ্যে মেদিনীপুর, বীরভূম ও পাটনার মূলাই উৎকৃষ্ট। বিলাতী মূলা আকারে ছোট হয়, তবে উহার ঝাঁজ অতি তীব্র। অগ্রহায়ণ মাসে বিলাতী মূলা বপন করা উচিত এবং উহা কাঠের বাক্সে বপন করিয়া প্রথমে চারা তৈয়ার করিয়া লওয়া দরকার।

ভাঁড়ুস ঃ—ক্ষেত্রমধ্যে ১॥• হাত অন্তর মাদা করিয়া বীজ বপন করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে অথবা আষাঢ় মাসের প্রথমে বীজ বপন করা উচিত। ফাল্গুন-চৈত্র মাসেও বীজ বপন করা চলে, কিন্তু তাহার ফলন ভাল হয় না। ছোট গাছে অধিক ফুল ধরিলে ফুল ছিঁড়িয়া দেওয়া উচিত। বীজ অঙ্কুরিত হইবার পর এক মাসের মধ্যেই ফল ধরিতে থাকে।

গোবর সার এবং পোড়া উনানের মাটী সাররূপে ব্যবহার করিলে প্রচুর ফল ধরে।

শাঁক আলু ঃ—শাঁক আলু তরকারী নহে, ইহা ফলের ন্যায় কাঁচা খাইতে হয়। শাঁক আলু লতা গাছ, লতার মূলে ইহার জন্ম। জমীতে দেড় হাত অন্তর এক একটি গভীর গর্ত্ত করিয়া এবং গর্ত্তের মাটী খুব চূর্ণ করিয়া তাহাতে ২টি করিয়া বীজ পুঁতিয়া দিবে। বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গাছে মাঝে মাঝে জল দিতে হয়। শীতকালে গাছ শুকাইয়া আসিলে, সেই সময় আলু তুলিয়া ব্যবহার করা হয়। আলু বাহির করিয়া না লইলে, পর বৎসরেও নূতন গাছ বাহির হয় এবং আলু আকারে বড় হয়, কিন্তু তাহাতে অধিক ছিবড়া হইয়া পড়ে, খাইতে ভাল লাগে না। আমাদের বাগানে তিন বৎসরে একটি /৫ সের শাঁক আলু হইয়াছিল।

নটে শাক ঃ—নটে শাক নানা প্রকার—চাঁপা, কনক প্রভৃতি। ইহা বার মাসই জন্মিয়া থাকে, তবে বর্ষার নটেই খাইতে ভাল। অল্প রসাল এঁটেল মাটি নটের পক্ষে উপযুক্ত। উত্তমরূপে জমী তৈয়ার করিয়া বীজ বপন করিবে এবং চারা ঘন হইয়া বাহির হইলে পাতলা করিয়া দিবে। চারা বাহির হইলে বর্ষা পর্য্যন্ত একদিন অন্তর জল সেচন করিবে। এক মাসের মধ্যেই গাছগুলি শাক কাটিয়া লইবার উপযুক্ত হয়। গাছ উপড়াইয়া না লইয়া উপর হইতে শাক কাটিয়া লইলে আবার ২।৪ দিনের মধ্যেই নূতন পাতা বাহির হয়। এইরূপে ৮।১০ বার শাক কাটিয়া খাওয়া যাইতে পারে। ক্ষেত্রে জলের অভাব না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। ক্ষেত্রে গোবর সার এবং আবর্জ্জনা সার দিলেই হইল।

ডেঙ্গো শাক বা ডেঙ্গো ডাঁটা ঃ—বর্ষাকালে ডেঙ্গো ডাঁটা গৃহস্থের প্রধান অবলম্বন। ডেঙ্গো নানা প্রকার। এক প্রকার

ডেঙ্গো আছে, তাহা আকারে খুব লম্বা হয় বটে, কিন্তু কোন স্বাদ নাই। লাল বর্ণের এক জাতীয় ডেঙ্গো আছে, তাহা অতিশয় মিষ্ট ও স্বাদু। ডেঙ্গো গাছ যত বড় হয়, ডাঁটা তত মিষ্ট হইতে থাকে, তবে তখন আর উহার পাতা খাইতে ভাল লাগে না। অল্প রসাল এঁটেল মাটী ইহার উপযোগী। হাপরে বীজ বপন করিয়া, জল সেচন করিয়া হাপর ভিজাইয়া রাখিলে ৪।৫ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। পরে মাটীতে উত্তমরূপে সার মিশাইয়া বৃষ্টি পাইলেই চারাগুলি জমীতে এক হাত অন্তর পুঁতিয়া দিবে। বর্ষা আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত গাছের গোড়ায় মধ্যে মধ্যে জল দিবে। গাছের গোড়ায় জল জমিলে ডাঁটার স্বাদ বিকৃত হইয়া যায়, মিষ্টতা কমিয়া যায়। গাছগুলি ১ হাত উচ্চ হইলে তাহার ডগা কাটিয়া দিবে, তাহা হইলে গাছ বেশী লম্বা না হইয়া চারিদিকে শাখাপ্রশাখাযুক্ত হইবে।

লঙ্কা :—লঙ্কা নানা প্রকার। ইহা নিজে তরকারী নহে বটে, কিন্তু লঙ্কার অভাবে কোন তরকারীই রন্ধন হইতে পারে না। ছোট ছোট 'ধানী' লঙ্কা খুব ঝাল, আবার বড় বড় মোটা মোটা অনেক লঙ্কা আছে, যাহাতে আদৌ ঝাল নাই।

বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে হাপরে বীজ বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিবে। আবশ্যক-মত জল সেচন করিলেই এক সপ্তাহের মধ্যে চারা বাহির হইবে। হাপরে গাছগুলি ৫।৬ ইঞ্চি বড় হইলে, জমী উত্তমরূপে তৈয়ার করিয়া আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে জমীতে দেড় হাত অন্তর সারবন্দি করিয়া চারা বসাইবে। লঙ্কার পক্ষে খোলা উচ্চ জমী ভাল অর্থাৎ যাহাতে রৌদ্র ও বাতাস উত্তমরূপে পায়। মাটী কঠিন হইয়া গেলে জমী খুঁড়িয়া দিবে।

গাছের গোড়ায় কোনরূপে জল জমিবার সম্ভাবনা না থাকিলে শিকড়ের

উপরের মাটী অল্প সরাইয়া শিকড়ে রৌদ্র বাতাস খাওয়াইলে গাছ সতেজ হয়। দিন কুড়ি পরে সরিষার খোল ও মাটি মিশাইয়া গোড়ায় মাটি চাপা দিলে এবং জল সেচন করিলে, গাছে অধিক ফল ধরে এবং ফলের আকারও বড় হয়।

ছাঁচি-কুমড়া, চাল-কুমড়া বা দেশী কুমড়া ঃ—কচি ছাঁচি কুমড়া আমরা রন্ধন করিয়া ব্যবহার করি, পাকা কুমড়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া রসে পাক করিয়া কুমড়ার মিঠাই তৈয়ার হয়। এই মিঠাই বেশ মুখরোচক ও লঘুপথ্য—শিশুদিগের উত্তম খাদ্য। এতদ্ভিন্ন পাকা কুমড়ার ভিতরের শাঁস কুরিয়া পল্লীবধূগণ কুমড়ার বড়ি তৈয়ার করেন। ইহাও অতি উপাদেয়।

সাধারণতঃ এই কুমড়া চালের উপর হয় বলিয়া ইহার অপর নাম চাল-কুমড়া। একটু উচ্চ জমীর উপরে মাদা তৈয়ার করিয়া প্রতি মাদায় ২।৩টি করিয়া বীজ বপন করিবে। মাদার উপর মাচা করিয়া দিবে অথবা গৃহের ছাদে বা চালের উপর গাছটিকে তুলিয়া দিবে। মাচা বা চালের উপর গাছ তুলিয়া না দিলে ভিজা-মাটিতে ফল থাকিলে, ফল শীঘ্র পচিয়া যায়। দুই মাস আড়াই মাসের মধ্যেই গাছে ফল ধরিতে থাকে।

বেগুন ঃ—বেগুন প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। শীতের বেগুন-বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসে, গ্রীষ্মের বেগুন বীজ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে বপন করিতে হয়। বেগুন নানা জাতীয়—তন্মধ্যে বাঙ্গালার মুক্তকেশী বেগুন প্রসিদ্ধ। হাপরে বীজ বপন করিয়া চারা তৈয়ার করা হইয়া থাকে। বেশ শীতল ছায়াযুক্ত স্থানে হাপরে তৈয়ার করিবে। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে এক রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে প্রাতে অল্পক্ষণ বাতাসে রাখিলেই বীজ শুষ্ক হইয়া আসিবে, তখন সেগুলি বপন করিবে। হাপরে চারাগুলি ৮।১০ আঙ্গুল বড় হইলে স্থায়িভাবে ক্ষেত্রে নাড়িয়া পুঁতিয়া দিবে। সন্ধ্যার সময়

হাপর হইতে চারা তুলিয়া ক্ষেত্রে বসাইবে। গৃহস্থের নিজের বাগানে ১০।১২টি চারা বসাইবার আবশ্যক হইলে বীজ হইতে চারা তৈয়ার না করিয়া পুষ্ট চারা কিনিয়া বসাইলেই চলিবে। দুই হাত অন্তর শ্রেণী কাটিয়া ৫।৬ অঙ্গুলি উচ্চ দাঁড়া তৈয়ার করিবে। এই দাঁড়ার উপরে দেড় হাত অন্তর চারা রোপণ করিবে। পরে যত দিন পর্য্যন্ত গাছগুলি মাটিতে শিকড় না ফেলে, তত দিন প্রত্যহ গাছের উপর জল দিবে। ইহার পরে বেগুন গাছে আর জল দিবার দরকার নাই। তবে শীতের বেগুনে ২।১ বার জল সেচন করা মন্দ নহে। পুরাতন ভিটা মাটিতে বেগুন খুব ভাল হয়। বেগুনগাছের গোড়ায় সরিষার খোল, ছাই ও অল্প চূণ মিশাইয়া ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

আষাঢ়

এই মাসে শিম, লঙ্কা, শীতের শসা প্রভৃতি বপন করিতে হইবে। পালং শাকের জল্দি ফসল করিতে হইলে, এই সময়ে বপন করা উচিত।

শসা ঃ—শসা প্রায় বার মাসই পাওয়া যায় এবং কচি শসা কাঁচা ও পাকা শসা রাঁধিয়া খাওয়া হয়। শসা সাধারণতঃ দুই জাতীয়—ভুঁই-শসা ও পালা-শসা। পালা-শসার বীজ আষাঢ় মাসে বপন করা হয়। ক্ষেত্রে ৫।৬ হাত অন্তর মাদা করিয়া প্রতি মাদায় ২।৩টি করিয়া বীজ পুঁতিবে। পুষ্করিণীর মাটি, পোড়া মাটি ও গোবর সার শসার জমীতে দিবে। গাছ বড় হইলে মাদার উপর মাচা করিয়া দিবে। তিন চারিটি মাদার উপর একটি বড় মাচা করিয়া দিতে পারা যায়। পালা-শসা ভাদ্র মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ফল দেয়। মেটে ঘরের পুরাতন দেওয়ালের মাটি ও পুরাতন রাবিসের গুঁড়া সাররূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শিম ঃ—দেশী শিমের মধ্যে আলতাপাটি শিম উৎকৃষ্ট। যে সকল শিম চওড়ায় বড় হয় না, দেখিতে কড়াই-সুঁটির মত, তাহা খাইতে ভাল নহে। আষাঢ় মাসে ক্ষেত্রে মাদা করিয়া প্রতি মাদায় ২।৩টি করিয়া বীজ বপন করিবে। শিমের বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত। চারা বড় হইলে উপরে মাচা করিয়া দিবে কিংবা নিকটে কোন বড় গাছ থাকিলে তাহাতে উঠাইয়া দিবে। চালের উপরেও শিম গাছ তুলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। গাছ মাটিতে থাকিলে ফল ভাল হয় না, এক গাছ হইতে ২।৩ বৎসর ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ফল কম হয় ও খাইতে বিস্বাদ হয়। সুতরাং শীতের পর গাছ নির্জীব হইলেই কাটিয়া দিবে।

শ্রাবণ

লাউ, পুঁই, বরবটি প্রভৃতি বপন করিতে হইবে।

পুঁই ঃ—শাকের মধ্যে পুঁই বিশেষ বলকারক। পুঁই প্রায় সকল সময়েই পাওয়া যায়। ইহা দুই শ্রেণীর :—লাল ও সবুজ। সবুজ পুঁই অধিক প্রচলিত। ক্ষেত্রমধ্যে মাদায় গর্ত্ত করিয়া প্রতি মাদায় ২।৩টি বীজ পুঁতিবে। বৃষ্টি না হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া দরকার। পুঁই গাছ লতাইয়া যায়। অল্প ২।৪টি গাছ হইলে মাচা করিয়া দেওয়াই ভাল, নতুবা উহা যেন জমীতে ইচ্ছামত লতাইয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। অনেকে চালার উপর পুঁই গাছ তুলিয়া দেন। সে প্রথা মন্দ নহে।

বরবটী ঃ—বরবটী অতি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর তরকারী। শ্রাবণ মাসে চৌকার মধ্যে বীজ ছড়াইয়া দিবে। চৌকার মধ্যে চারা ঘন হইলে পাতলা করিয়া দেওয়া উচিত। বরবটী গাছে আশ্বিনের শেষ হইতে ফল

ধরিতে আরম্ভ করে এবং মাঘ মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন বরবটী খাওয়া যাইতে পারে। শুষ্ক বরবটীর দানা হইতে ডাল তৈয়ার হয়। এই ডাল বাঙ্গালা অপেক্ষা পশ্চিমে অধিক প্রচলিত। যে সকল বরবটী লম্বা, উপযুক্ত পরিমাণে চওড়া এবং সাদা হয়, তাহাই খাইতে নরম ও স্বাদু। এইরূপ বরবটির বীজই ব্যবহার করা উচিত।

আশ্বিন

শীতের মূলা, শিম, মটর প্রভৃতি এই মাসে বপন করিতে হয়।

কার্ত্তিক

শীতের সব্জী এখনও বপন করিতে বাকি থাকিলে এই মাসে শেষ করিবে। এই সকল সব্জী 'নাবী' অর্থাৎ বিলম্বে হইবে।

অগ্রহায়ণ

বেগুন, লঙ্কা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি যে সকলের চৈত্র-বৈশাখে ফল ধরিবে, তাহাদিগকে এই মাসে বপন করিবে।

পৌষ

চৈত্রের শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি এই মাসেও বপন করা চলে।

ফাল্গুন

চাঁপা-নটে এই সময় বপন করিয়া ভাল করিয়া জল দিতে পারিলে শীঘ্র শাক পাওয়া যায়।

চৈত্র

লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি এই মাসে বপন করা হয়। ঢ্যাঁড়স ও ভুট্টাও এই সময়ে লাগাইতে পারা যায়। আস্ত বেগুনের বীজ হইতে চারা তৈয়ার করিতে হইবে। আদা ও হলুদ এই মাসে বসাইতে হয়।

আদা ঃ—আদা আমাদের বিশেষ দরকারী। ইহা রন্ধনে আবশ্যক হয় এবং ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থের বাগানে ২।১ ঝাড় আদা লাগাইয়া রাখিলে সময়ে অনেক উপকারে লাগে।

আদা আওতায় এবং ছায়াযুক্ত স্থানে বেশ জন্মায়। বড় গাছের গোড়ায়, আওতাতে, যে স্থানে অন্য কোন ফসল ভাল হয় না, সেই স্থানে আদা ভাল হয়।

জমী বেশ করিয়া খুঁড়িয়া দেড় হাত অন্তর শ্রেণী কাটিবে এবং প্রতি শ্রেণীতে আধ হাত অন্তর আদা পুঁতিয়া দিবে। বেশ এক পসলা বৃষ্টির পরে জমীতে আদা বসাইবে। গাছের গোড়ায় যাহাতে কোন প্রকার জল না দাঁড়ায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। ছাই ও খোল আদার পক্ষে উত্তম সার। অতিশয় হাল্‌কা দোঁয়াশ মাটিই আদার উপযুক্ত জমী। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে আদার গোড়া খুঁড়িয়া কতক আদা ভাঙ্গিয়া লইতে পারা যায়, এবং পরে মাটি চাপা দিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। মাঘ মাসে গাছের পাতা সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলে সকল আদা মাটি হইতে উঠাইবে।

ভৃত্য ও কর্ম্মচারীদের বেতনের হিসাব

২৮ দিনে মাস হইলে

দিন	১৲	২৲	৩৲	৪৲	৫৲
১	৲১০	/২॥	/১২॥	৵৫	৵১৭॥
২	/২॥	৵৫	৶৭॥	।১০	।/১৫
৩	/১২॥	৶৭॥	।/২॥	।৵১৫	॥১২॥
৪	৵৫	।১০	।৵১৭॥	॥/২॥	॥৶১০
৫	৵১৫	।/১২॥	॥১২॥	॥৶৭॥	৸৵৭॥
৬	৶৭॥	।৵১৫	॥৵৭॥	৸/১২॥	১/৫
৭	।০	॥০	৸০	১৲	১।০
৮	।১০	॥/২॥	৸/১২॥	১৵৫	১।/১৭॥
৯	।/২॥	॥৵৫	৸৶৭॥	১।১০	১॥/১৫
১০	।/১২॥	॥৶৭॥	১/২॥	১।৵১৫	১৸১২॥
১১	।৵৫	৸১০	১৵১৭॥	১॥/২॥	১৸৶১০
১২	।৵১৫	৸/১২॥	১।১২॥	১॥৶১৭॥	২৵৭॥
১৩	।৶৭॥	৸৵১৫	১।৵৭॥	১৸/১২॥	২।/৫
১৪	॥০	১৲	১॥০	২৲	২॥০
১৫	॥১০	১/২॥	১॥/১২॥	২৵৫	২॥৵১৭॥
১৬	॥/২॥	১৵৫	১॥৶৭॥	২।১০	২৸/১৫
১৭	॥/১২॥	১৶৭॥	১৸/২॥	২।৵১৫	৩৲১২॥
১৮	॥৵৫	১।১০	১৸৵১৭॥	২॥/২॥	৩৶১০
১৯	॥৵১৫	১।/১২॥	২৲১২॥	২॥৶৭॥	৩।৵৭॥
২০	॥৶৭॥	১।৵১৫	২৵৭॥	২৸/১২॥	৩॥/৫
২১	৸০	১॥০	২।০	৩৲	৩৸০
২২	৸১০	১॥/২॥	২।/১২॥	৩৵৫	৩৸৵১৭॥
২৩	৸/২॥	১॥৵৫	২।৶৭॥	৩।১০	৪/১৫
২৪	৸/১২॥	১॥৶৭॥	২॥২॥	৩।৵১৫	৪।১২॥
২৫	৸৵৫	১৸১০	২॥৵১৭॥	৩॥/২॥	৪।৶১০
২৬	৸৵১৫	১৸/১২॥	২৸-॥	৩॥৶৭॥	৪॥৵৭॥
২৭	৸৶৭॥	১৸৵১৫	২৸৵৭॥	৩৸/১২॥	৪৸/৫

২৮ দিনে মাস হইলে

দিন	৬৲	৭৲	৮৲	৯৲	১০৲
১	৶৭॥	৷০	৷১০	৷/২॥	৷/১২॥
২	৷৵১৭॥	॥০	॥/২॥	॥৵৫	॥৶৭॥
৩	॥৵৫	৸০	৸/১২॥	৸৶৭॥	১/২॥
৪	৸/১৫	১৲	১৵৫	১৷১০	১৷৵১৭॥
৫	১/২॥	১৷০	১৷৵১৫	১॥/১২॥	১৸১২॥
৬	১৷১২॥	১॥০	১॥৶৭॥	১৸৵১৫	২৵৭॥
৭	১॥০	১৸০	২৲	২৷০	২॥০
৮	১॥৶৭॥	২৲	২৷১০	২॥/২॥	২৸/১২॥
৯	১৸৵১৭॥	২৷০	২॥/২॥	২৸৵৫	৩৶৭॥
১০	২৵৫	২॥০	২৸/১২॥	৩৶৭॥	৩॥/২॥
১১	২৷/১৫	২৸০	৩৵৫	৩॥১০	৩৸৵১৭॥
১২	২॥/২॥	৩৲	৩৷৵১৫	৩৸/১২॥	৪৷১২॥
১৩	২৸১২॥	৩৷০	৩॥৶৭॥	৪৵১৫	৪॥৵১৫
১৪	৩৲	৩॥০	৪৲	৪॥০	৫৲
১৫	৩৶৭॥	৩৸০	৪৷১০	৪৸/২॥	৫৷/১২॥
১৬	৩৷৵১৭॥	৪৲	৪॥/২॥	৫৵৫	৫॥৶৭॥
১৭	৩॥৵৫	৪৷০	৪॥/১২॥	৫৷৶৭॥	৬/২॥
১৮	৩৸/১৫	৪॥০	৫৵৫	৫৸১০	৬৷৵১৭॥
১৯	৪/২॥	৪৸০	৫৷৵১৫	৬/১২॥	৬৸১২॥
২০	৪৷১২॥	৫৲	৫॥৶৭॥	৬৷৵১৫	৭৵৭॥
২১	৪॥০	৫৷০	৬৲	৬৸০	৭॥০
২২	৪॥৶৭॥	৫॥০	৬৷১০	৭/২॥	৭৸/১২॥
২৩	৪৸৵১৭॥	৫৸০	৬॥/২॥	৭৷৵৫	৮৶৭॥
২৪	৫৵৫	৬৲	৬৸/১২॥	৭॥৶৭॥	৮॥/২॥
২৫	৫৷/১৫	৬৷০	৭৵৫	৮৷১০	৮৸৵১৭॥
২৬	৫॥/২॥	৬॥০	৭৷৵১৫	৮৷/১২॥	৯৷১২॥
২৭	৫৸১২॥	৬৸০	৭॥৶৭॥	৮॥৵১৫	৯॥/৭॥

২৯ দিনে মাস হইলে

দিন	১৲	২৲	৩৲	৪৲	৫৲
১	৲১০	৴০	৴১২॥	৵২॥	৵১৫
২	৴০	৵২॥	৶৫	৷৭॥	৷৴১০
৩	৴১২॥	৶৫	৷১৭॥	৷৵১২॥	॥৫
৪	৵২॥	৷৭॥	৷৵১২॥	॥১৫	॥৶০
৫	৵১৫	৷৴১০	॥৫	॥৶০	৸৴১৫
৬	৶৫	৷৵১০	॥৴১৭॥	৸৴৫	১৲১০
৭	৶১৫	৷৶১২॥	॥৶১০	৸৶৭॥	১৶৫
৮	৷৭॥	॥১৫	৸৴৫	১৴১২॥	১৷৵০
৯	৷১৭॥	॥৴১৭॥	৸৵১৭॥	১৶১৭॥	১॥১৫
১০	৷৴১০	॥৶০	১৲১০	১৷৵০	১॥৶১০
১১	৷৵০	৸০	১৵২॥	১॥৫	১৸৵৫
১২	৷৵১০	৸৴২॥	১৶১৭॥	১॥৵১০	২৴০
১৩	৷৶২॥	৸৵৫	১৷৴১০	১৸১২॥	২৶১৫
১৪	৷৶১২॥	৸৶৭॥	১৷৶২॥	১৸৵১৭॥	২৷৵১০
১৫	॥৫	১৲১০	১॥১৫	২৴২॥	২॥৴৭॥
১৬	॥১৫	১৴১০	১॥৵১০	২৶৫	২৸২॥
১৭	॥৴৫	১৵১২॥	১৸২॥	২৷৴১৭॥	২৸৵১৭॥
১৮	॥৴১৭॥	১৶১৫	১৸৴১৫	২৷৶১৫	৩৴১২॥
১৯	॥৵৭॥	১৷১৭॥	১৸৶৭॥	২॥৴১৭॥	৩৷৭॥
২০	॥৶০	১৷৵০	২৴২॥	২৸২॥	৩৷৶২॥
২১	॥৶১০	১৷৶০	২৶১৫	২৸৵৭॥	৩॥৴১৭॥
২২	৸০	১॥২॥	২৷৭॥	৩৲১০	৩৸১২॥
২৩	৸১২॥	১॥৴৫	২৷৵০	৩৵১৫	৩৸৶৭॥
২৪	৸৴২॥	১॥৵৭॥	২৷৶১৫	৩৷৴	৪৴২॥
২৫	৸৴১৫	১॥৶১০	২॥৴৭॥	৩৷৶২॥	৪৷১৭॥
২৬	৸৵৫	১৸১২॥	২॥৶০	৩॥৴৭॥	৪৶১২॥
২৭	৸৵১৭॥	১৸৴১৫	২৸১২	৩॥৶১২॥	৪॥৵৭॥
২৮	৸৶৭॥	১৸৵১৭॥	২৸৵৭॥	৩৸৴১৫	৪৸৴২॥

২৯ দিনে মাস হইলে

দিন	৬৲	৭৲	৮৲	৯৲	১০৲
১	৶৫	৶১৭॥	।৭॥	।১৭॥	।৴১০
২	।৵১২॥	।৶১৫	॥১৫	॥৴১৭॥	॥৶০
৩	॥৴১৭॥	॥৶১২॥	৸৴৫	৸৵১৭॥	১৲১০
৪	৸৴৫	৸৶১০	১৴১২॥	১৶১৭॥	১৵০
৫	১৲১০	১৶৭॥	১।৵০	১॥১৫	১॥৶১০
৬	১৶১৭॥	১।৶৫	১॥৵১০	১৸৴১৫	২৴০
৭	১।৶২॥	১॥৶২॥	১৸৵১৭॥	২৵১৫	২।৶১২॥
৮	১॥৵১০	১৸৶০	২৶৫	২৶১৫	২৸২॥
৯	১৸৴১৫	২৵১৭॥	২।৶১৫	২৸১২॥	৩৴১২॥
১০	২৴২॥	২।৵১২॥	২৸২॥	৩৴১২॥	৩৶২॥
১১	২।৭॥	২॥৵১০	৩৲১০	৩৵১২॥	৩৸১২॥
১২	২।৶১৫	২৸৵৭॥	৩।৴০	৩॥৶১২॥	৪৵২॥
১৩	২॥৶০	৩৵৫	৩॥৴৭॥	৪৲১০	৪।৶১২॥
১৪	২৸৵৭॥	৩।৵২॥	৩৸৴১৫	৪।৴১০	৪৸৴৫
১৫	৩৴১২॥	৩॥৵০	৪৵৫	৪॥৵১০	৫৵১৫
১৬	৩।৴০	৩৸৴১৭॥	৪।৵১২॥	৪৸৶১০	৫॥০
১৭	৩॥৫	৪৴১৫	৪॥৵০	৫।৭॥	৫৸৴১৫
১৮	৩॥৶১২॥	৪।৴১২॥	৪৸৶১০	৫॥৴৭॥	৬৶৫
১৯	৩৸৵১৭॥	৪॥৴১০	৫৶১৭॥	৫৸৵৭॥	৬॥১৫
২০	৪৵৫	৫৸৴৫	৫॥৫	৬৶৭॥	৬৸৵৫
২১	৪।৴১০	৫৴২॥	৫৸১৫	৬॥৫	৭৶১৭॥
২২	৪॥১৭॥	৫।৴০	৬৴২॥	৬৸৴৫	৭॥৴৭॥
২৩	৪৸২॥	৫॥১৭॥	৬।৴১০	৭৵৫	৭৸৴১৭॥
২৪	৪৸৶১০	৫৸১৫	৬॥৵০	৭।৶৫	৮।৭॥
২৫	৫৵১৫	৬৲১২॥	৬৸৵৭॥	৭৸২॥	৮॥৴১৭॥
২৬	৫।৵২॥	৬ ১০	৭৵১৫	৮৴২॥	৮৸৶৭॥
২৭	৫॥৴৭॥	৬॥৭॥	৭।৶৫	৮৵২॥	৯। ৭॥
২৮	৫৸৫	৬৸৫	৭॥৶১২॥	৮॥৶২॥	৯॥৵১০

৩০ দিনে মাস হইলে

দিন	১৲	২৲	৩৲	৪৲	৫৲
১	<১০	৴০	৴১০	৵২॥	৵১২॥
২	৴০	৵২॥	৶২॥	।৫	।৴৫
৩	৴১০	৶২॥	।১৫	।৵২॥	॥০
৪	৵২॥	।৫	।৵৭॥	॥১০	॥৵১২॥
৫	৵১২॥	।৴৫	॥০	॥৵১২॥	৸৴৫
৬	৶২॥	।৵৭॥	॥৴১০	৸১৫	১৲
৭	৶১২॥	।৶৭॥	॥৶২॥	৸৵১৭॥	১৵১২॥
৮	।৫	॥১৫	৸১৫	১৴০	১।৴৫
৯	।১৫	॥৴১০	৸৵৭॥	১৶২॥	১॥০
১০	।৴৫	॥৵১২॥	১৲	১।৴৫	১॥৵১২॥
১১	।৴১৫	॥৶১২॥	১৴১০	১।৶৭॥	১৸৴৫
১২	।৵৭॥	৸১৫	১৶২॥	১॥৴১০	২৲
১৩	।৵১৭॥	৸৴১৫	১।১৫	১॥৶২॥	২৵১২॥
১৪	।৶৭॥	৸৵১৭॥	১।৵১৭॥	১৸৴১৫	২৴৫
১৫	॥০	১৲	১॥০	২৲	২॥০
১৬	॥১০	১৴০	১॥৴১০	২৵২॥	২॥৵১২॥
১৭	॥৴০	১৵২॥	১॥৶২॥	২।৫	২৸৴৫
১৮	॥৴১০	১৶২॥	১৸১৫	২।৵৭॥	৩৲
১৯	॥৵২॥	১।৫	১৸৵১৭॥	২॥১০	৩৵১২॥
২০	॥৵১২॥	১।৴৫	২৲	২॥৵১২॥	৩।৴৫
২১	॥৶২॥	১।৵৭॥	২৴১০	২৸১৫	৩॥০
২২	॥৶১২॥	১।৶৭॥	২৶২॥	২৸৵১৭॥	৩॥৵১২॥
২৩	৸৫	১॥১০	২।১৫	৩৴০	৩৸৴৫
২৪	৸১৫	১॥৴১০	২।৵৭॥	৩৶২॥	৪৲
২৫	৸৴৫	১॥৵১২॥	২॥০	৩৴৫	৪৵১২॥
২৬	৸৴১৫	১॥৶১২॥	২॥৴১০	৩।৶৭॥	৪।৴৫
২৭	৸৵৭॥	১৸১৫	২॥৶২॥	৩॥৴১০	৪॥০
২৮	॥৵১৭॥	১৸৴১৫	২৸১৫	৩॥৶২॥	৪॥৵১২॥
২৯	৸৶৭॥	১৸৵৭॥	২৸৵৭॥	৩৸৴১৫	৪৸৴৫

৩০ দিনে মাস হইলে

দিন	৬৲	৭৲	৮৲	৯৲	১০৲
১	৶২॥	৶১২॥	৷৫	৷১৫	৷/৫
২	৵৭॥	৷৶৭॥	॥১০	॥/১০	॥৵১২॥
৩	॥/১২॥	॥৵২॥	৸১৫	৸৵৭॥	১৲
৪	৸১৭॥	৸৵১৭॥	১/০	১৶২॥	১৷/৫
৫	১৲	১৵১২॥	১৷/৫	১॥০	১॥৵১২॥
৬	১৶২॥	১৷৵৭॥	১॥/১০	১৸১৫	২৲
৭	১৷৵৭॥	১॥৵২॥	১৸/১৫	২/১০	২৷/৫
৮	১॥/১৭॥	১৸/১৭॥	২৵২॥	২৷৵৭॥	২॥৵১২॥
৯	১৸১৭॥	২/১২॥	২৷৵৭॥	২॥৶২॥	৩৲
১০	২৲	২৷/৭॥	২॥৵১২॥	৩৲	৩৷/৫
১১	২৶২॥	২॥/২॥	২৸৵১০	৩৷১৫	৩॥৵১২॥
১২	২৷৵৭॥	২৸১৭॥	৩৶২॥	৩॥/১০	৪৲
১৩	২॥/১২॥	৩৲১২॥	৩৷৶৭॥	৩৸৵৭॥	৪৷/৫
১৪	২৸১৭॥	৩৷৭॥	৩॥৶১২॥	৪৶২॥	৪॥৵১২॥
১৫	৩৲	৩॥০	৪৲	৪॥০	৫৲
১৬	৩৶২॥	৩৷৶১২॥	৪৷৫	৪৸১৫	৫৷/৫
১৭	৩৷৵৭॥	৩৸৶৭॥	৪॥১০	৫/১০	৫॥৵১২॥
১৮	৩॥/১২॥	৪৶২॥	৪৸১৫	৫৷৵৭॥	৬৲
১৯	৩৸১৭॥	৪৷৵১৭॥	৫/০	৫॥৶২॥	৬৷/৫
২০	৪৲	৪॥৵১২॥	৫৷/৫	৬৲	৬॥৵১২॥
২১	৪৶২॥	৪৸৵১৭॥	৫॥/১০	৬৷১৫	৭৲
২২	৪৷৵২॥	৫৵২॥	৫৸/১৫	৬॥/১০	৭৷/৫
২৩	৪॥/১২॥	৫৷/১৭॥	৬৵৭॥	৬৸৵৭॥	৭॥৵১২॥
২৪	৪৸১৭॥	৫॥/১২॥	৬৷৵১৭॥	৭৶২॥	৮৲
২৫	৫৲	৫৸/৭॥	৬॥৵১২॥	৭॥০	৮৷/৫
২৬	৫৶২॥	৬/২॥	৬৸৵১৭॥	৭৸১৫	৮॥৵১২॥
২৭	৫৷৵৭॥	৬৷১৭॥	৭৶২॥	৮/১০	৯৲
২৮	৫॥/১২॥	৬॥১২॥	৭৷৶৭॥	৮৷৵৭॥	৯৷/৫
২৯	৫৸১৭॥০	৬৸৭॥	৭॥৶১২॥	৮॥৶১২॥	৯॥৵১২॥

৩১ দিনে মাস হইলে

দিন	১৲	২৲	৩৲	৪৲	৫৲
১	৻১০	⁄০	⁄১০	৶০	৶০
২	⁄০	৶০	৶০	।২॥	।⁄২॥
৩	⁄১০	৶০	।১২॥	।৶২॥	৶১২॥
৪	৶০	।২॥	।৶২॥	॥৫	॥৶৫
৫	৶১০	।⁄২॥	।৶১৫	॥৶৫	৸১৫
৬	৶০	।৶২॥	॥⁄৫	৸৭॥	৸৶১০
৭	৶১০	।৶২॥	॥৶১৫	৸৶৭॥	১৶০
৮	।২॥	॥৫	৸৭॥	১৻১০	১।১২॥
৯	।১২॥	॥⁄৫	৸⁄১৭॥	১৶১০	১।৶২॥
১০	।⁄২॥	॥৶৫	৸৶১০	১।১২॥	১॥⁄১৫
১১	।⁄১২॥	॥৶৫	১⁄০	১।৶১২॥	১৸৫
১২	।৶২॥	৸৭॥	১৶১০	১॥১৫	১৸৶০
১৩	।৶১২॥	৸⁄৭॥	১।২॥	১॥৶১৫	২⁄১০
১৪	।৶২॥	৸৶৭॥	১।⁄১২॥	১৸১৭॥	২।২॥
১৫	।৶১২॥	৸৶৭॥	১।৶৫	১৸৶১৭॥	২।৶১২॥
১৬	॥৫	১৻১০	১॥১৫	২⁄০	২॥⁄৫
১৭	॥১৫	১⁄১০	১॥৶৫	২৶০	২॥৶১৫
১৮	॥⁄৫	১৶১০	১॥৶১৭॥	২।⁄২॥	২৸৶১০
১৯	॥৶১৫	১৶১০	১৸⁄৭॥	২।৶২॥	৩⁄০
২০	॥৶৫	১।১২॥	১৸৶০	২॥⁄৫	৩৶১২॥
২১	॥৶১৫	১।⁄১২॥	২৻১০	২॥৶৫	৩।৶২॥
২২	॥৶৫	১।৶১২॥	২৶১০	২৸⁄৭॥	৩॥৫
২৩	॥৶১৫	১।৶১২॥	২৶১২॥	২৸৶৭॥	৩॥৶৫
২৪	৸৭॥	১॥১৫	২।⁄২॥	৩⁄১০	৩৸৶০
২৫	৸১৭॥	১॥⁄১৫	২।৶১৫	৩৶১০	৪৻১০
২৬	৸⁄৭॥	১॥৶১৫	২॥৫	৩।⁄১২॥	৪৶২॥
২৭	৸⁄১৭॥	১॥৶১৫	২॥৶১৫	৩।৶১২॥	৪।⁄১২॥
২৮	৸৶৭॥	১৸১৭॥	২॥৶৭॥	৩॥⁄১৫	৪॥৫
২৯	৸৶১৭॥	১৸⁄১৭॥	২৸১৭॥	৩॥৶১৫	৪॥৶১৫
৩০	৸৶৭॥	১৸৶১৭॥	২৸৶১০	৩৸⁄১৭॥	৪৸⁄১০

৩১ দিনে মাস হইলে

দিন	৬৲		৮৲	৯৲	
১	৶০	৶১০	।২॥	।১২॥	।/২॥
২	।৵২॥	।৶২॥	॥৫	॥/৫	॥৵৫
৩	॥/০	॥৵১৫	৸৭॥	৸/১৭॥	৸৶৭॥
৪	৸৭॥	৸৵৭॥	১৲১০	১৵১০	১।১২॥
৫	৸৶১০	১৵০	১।১২॥	১।৶২॥	১॥/১৫
৬	১৵১০	১।/১২॥	১।৶১৭॥	১॥৶১৫	১৸৵১৭॥
৭	১।/১২॥	১॥/৫	১৸১৭॥	২৲১০	২।২॥
৮	১॥:৫	১৸১৭॥	২/০	২।/২॥	১॥/৫
৯	১॥৶১৭॥	২৲১০	২।/২॥	২॥/১৫	২৸৵৭॥
১০	১৸৶০	২ ২॥	২॥/৫	২৸৵৭॥	৩৶১০
১১	২৵০	২।৶১২॥	২৸/৭॥	৩৶০	৩॥১৫
১২	২।/২॥	২॥৶৫	৩/১০	৩।৶১৫	৩৸/১৭॥
১৩	২॥৫	২৸৵১৭॥	৩।/১২॥	৩৸৭॥	৪৶০
১৪	২॥৶৭॥	৩৵১০	৩॥/১৫	৪/০	৪॥৫
১৫	২৸৵১০	৩।৵২॥	৩৸/১৭॥	৪।/১২॥	৪৸/৭॥
১৬	৩/১০	৩॥/১৫	৪৵০	৪॥৵১৭॥	৫৵১০
১৭	৩।১২॥	৩৸/১৫	৪।৵২॥	৪৸৵১৭॥	৫।৶১২॥
১৮	৩।৶১৫	৪/০	৪॥৵৫	৫৶১২॥	৫৸১৭॥
১৯	৩॥৵১৭॥	৪।১:॥	৪৸৵৭॥	৫॥৫	৬৵০
২০	৩৸৵০	৪॥৫	৫৵১০	৫৸১৭॥	৬ ৶:॥
২১	৪/০	৪॥৵১৫	৫।৵:২॥	৬/১০	৬৸৭॥
২২	৪।:॥	৪৸৶৭॥	৫॥৵১৫	৬।৵২॥	৭/১০
২৩	৪।৶৫	৫৶০	৫৸৵১৭॥০	৬॥৵১৫	৭।৵১২॥
২৪	৪॥৵৭॥	৫ ৵১২॥	৬৶০	৬৸৶১০	৭॥৶১৫
২৫	৪৸/১০	৫॥৵৫	৬।/২॥	৭।২॥	৮/০
২৬	৫৲১০	৫৸/১৭॥	৬॥৶৫	৭॥১৫	৮।৵২॥
২৭	৫৶১২॥	৬/০	৬৸৶৭॥	৭৸/৭॥	৮॥৶৫
২৮	৫।৵১৫	৬/২॥	৭৶১০	৮৵০	৯৲১০
২৯	৫॥/৭॥	৬॥১৫	৭।৶১২॥	৮৵১৭॥	৯/১২॥
৩০	৫৸/০	৬৸৭।	৭॥৶১৫	৮॥৶৭।	৯॥৵১৫

/ক	/ধ	/৷	/৷৵	/।	/৵	//
এক সেরের মূল্য এত হইলে	তিনপোয়ার মূল্য	আধসেরের মূল্য	দেড়পোয়ার মূল্য	একপোয়ার মূল্য	আধপোয়ার মূল্য	একছটাকের মূল্য
।০	৶০	৵০	/১	/০	৹১০	৹৫
।/০	৶১০	৵:০	/১৭॥	/৫	৹১২॥	৹৭॥
।৵০	।১০	৶০	৵৫	/১০	৹১৫	৹৭॥
।৶০	।/৫	৶১০	৵১২॥	/১৫	৹১৭॥	৹১০
॥০	।৵০	।০	৶০	৵০	/০	৹১০
॥/০	।৵১৫	।১০	৶৭॥	৵৫	/২॥	৹১২॥
॥৵০	।৶১০	।/০	৶১৫	৵১০	/৫	৹১২॥
॥৶০	॥৫	।/১০	।২॥	৵১৫	/৭॥	৹১৫
৸০	॥/০	।৵০	।১০	৶০	/১০	৹১৫
৸/০	॥/১৫	।৵১০	।১৭॥	৶৫	/১২॥	৹১৭॥
৸৵০	॥৵:০	।৶০	।/৫	৶১০	/১৫	৹১৭॥
৸৶০	॥৶৫	।৶১০	।/১২॥	৶৪৫	/১৭॥	/০
১৲	৸০	॥০	।৵০	।০	৵০	/০
১/০	৸১৫	॥১০	।৵৭॥	।৫	৵২॥	/২॥

/১ এক সেরের মূল্য এত হইলে	/৸ তিনপোয়ার মূল্য	/॥ আধসেরের মূল্য	/।৶ দেড়পোয়ার মূল্য	/। একপোয়ার মূল্য	// আধপোয়ার মূল্য	// একছটা মূল্য
১৶০	৸/১০	॥/০	।৶১৫	।১০	৶৫	/২॥
১৵০	৸৶০	॥/১০	।৵২॥	।১৫	৶৭॥	/৫
১।০	৵০	।৶০	।৵১০	।/০	৶১০	/৫
১।/০	৸৵১৫	॥৶১০	।৵১৭॥	।/৫	৶১২॥	/৭॥
১।৶০	১৻১০	॥৵০	॥৫	।/১০	৶১৫	/৭॥
১।৵০	১/৫	॥৵১০	॥১২॥	।/১৫	৶১৭॥	/১০
১॥০	১৶০	৸০	॥/০	।৶০	৵০	/১০
১॥/০	১৶১৫	৸১০	॥/৭॥	।৶৫	৵২॥	/১২॥
১॥৶০	১৵১০	৸/০	॥/১৫	।৶১০	৵৫	/১২॥
১॥৵০	১।৫	৸/১০	॥৶২॥	।৶১৫	৵৭॥	/১৫
১৸০	১।/০	৸৶০	॥৶১০	।৵০	৵১০	/১৫
১৸/০	১।/১৫	৸৶১০	॥৶১৭॥	।৵৫	৵১২॥	/১৭॥
১৸৶০	১।৶১০	৸৵০	॥৵৫	।৵১০	৵১৫	/১৭॥
১৸৵০	১।৵৫	৸৵১০	॥৵১২॥	।৵১৫	৵১৭॥	৶০
২৲	১।০	১৲	৸০	॥০	।০	৶০

১৴০	৸০	॥০	।০	৴৫	৴২॥০	৴১	৴॥	৴।
একমণের মূল্য এত হইলে	ত্রিশসেরের মূল্য	আধমণের মূল্য	দশসেরের মূল্য	পাঁচসেরের মূল্য	আড়াইসেরের মূল্য	একসেরের মূল্য	আধসেরের মূল্য	একপোয়ার মূল্য
১৲	৸০	॥০	।০	৵০	৴০	‹৭॥	—	—
২৲	১॥০	১৲	॥০	।০	৵০	‹১৭॥	‹৭॥	—
৩৲	২।০	১॥০	৸০	।৵০	৶০	৴৫	‹১২॥	—
৪৲	৩৲	২৲	১৲	॥০	।০	৴১২॥	‹১৭॥	‹৭॥
৫৲	৩৸০	২॥০	১।০	॥৵০	।৴০	৵০	৴০	‹১০
৬৲	৪॥০	৩৲	১।০	৸০	।৵০	৵১০	৴৫	‹১২॥
৭৲	৫।০	৩॥০	১৸০	৸৵০	।৶০	৵১৫	৴৭॥	‹১২
৮৲	৬৲	৪৲	২৲	১৲	॥০	৶৫	৴১২॥	‹১৭॥
৯৲	৬৸০	৪॥০	২।০	১৵০	॥৴০	৶১২॥	৴১৭॥	৴০
১০৲	৭॥০	৫৲	২॥০	১।০	॥৵০	।০	৵০	৴০

আয় ও ব্যয়

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক লিখিত।*

সংসার করিতে হইলে একটি আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখা কর্ত্তব্য। কি প্রণালীতে সরলভাবে হিসাব রাখা যাইতে পারে, নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। একটি কল্পিত সংসার মনে না করিলে হিসাবের আদর্শ দেওয়া অসম্ভব, এই জন্য একটি কল্পিত পরিবার উপস্থিত করিতেছি, ধরুন,—

নরহরি রায় বাটির কর্ত্তা; চাকরী করেন। রাখালচন্দ্র রায়—নরহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্যবসা করেন। কৃষ্ণদাস রায়—নরহরির কনিষ্ঠ পুত্র; স্কুলে পড়েন। কেশবচন্দ্র—নরহরির জামাতা; লক্ষ্মীর স্বামী। কার্ত্তিকচন্দ্র—কৃষ্ণদাসের পুত্র। রামচরণ—নরহরির চাকর। মহামায়া—নরহরির স্ত্রী। লক্ষ্মী—নরহরির জ্যেষ্ঠা কন্যা। সরস্বতী—নরহরির কনিষ্ঠা কন্যা। মণিমালা—রাখালচন্দ্রের স্ত্রী। হলধর দাস—মুদী। পতিতপাবন ঘোষ—গোয়ালা। জগন্নাথ—ধোপা। একটি গাভী।

---

* গার্হস্থ্য-হিসাব-রক্ষা বিষয়ে ক্ষেত্রবাবুর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। তাঁহার বাড়ীতে হিসাব যে ভাবে রক্ষিত হইতে দেখিয়াছি—সংসার-খরচের এরূপ সূক্ষ্ম ও পরিশুদ্ধ হিসাব আমি কোথাও দেখি নাই।

শ্রী.....

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

বুধবার— ১লা বৈশাখ ১৪ই এপ্রেল—

জমা—		খরচ—	
নগদ –		নগদ—	
হস্তে মজুত—		হলধর দাস—	
নরহরি রায়		চৈত্রমাসের মুদীর	
চৈত্রমাসের বেতন—	৫০৲	দেনা—	৩০৲
রাখালচন্দ্র রায়		পতিতপাবন ঘোষ—	
৩১ চৈত্র তারিখের দোকানে		চৈত্রমাসের দুগ্ধের	
বিক্রয়—	৫৲	দেনা—	৫৲
	৫৫৲	রামচরণের মাহিয়ানা—	
বাদ —	৫৪৶০	দরুণ চৈত্র—	৮৲
মজুত—	৸৶০	কৃষ্ণদাসের ইস্কুলের মাহিয়ানা	
		দঃ এপ্রেল—	৪৲
		জগন্নাথ ধোপা	
		দঃ চৈত্র—	২৲
		মহামায়ার	
		শাড়ী ১ জোড়া—	২৲
		কার্ত্তিকের জন্য	
		ডাক্তারের ফি—	২৲
		ঔষধ—	৷৹
		বাজার —	।৶০
			৫৪৶০

শ্রী......

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

বুধবার— ১লা বৈশাখ— ১৪ই।

জমা—		খরচ—
ধার—		ধার—
হলধর দাস—		জগন্নাথ ধোপা—
চাউল—	৭৲	৩০ খানা কাপড়—
১/০		
ঘৃত—	২৸০	
/২		
সর্ষপ তৈল	১৸৵০	
/৫		
ডাল—	৸০	
/৫		
লবণ—		
/২॥	৶০	
	১২॥/০	
পতিতপাবন ঘোষ		
দুগ্ধ	।০	
/১		

ধার জমা অর্থাৎ যে কোন দ্রব্য ক্রয় করা হইল, পরে তাহার মূল্য দেওয়া হইবে, তাহাকে ধার জমা বলা হয়—যেমন হলধর দাসের দোকান হইতে চাউল ইত্যাদি ১২॥/০ মূল্যের দ্রব্যাদি ধারে কেনা হইল, পরে মাস-কাবারে তাহার মূল্য দেওয়া হইবে। অদ্য তারিখে চৈত্র মাসের মুদীর দোকানে ধারে যে সকল জিনিস কেনা হইয়াছিল, মূল্য ৩০৲ টাকা নগদ দেওয়া হইল—ইহা নগদ খরচ।

পতিতপাবন ঘোষ প্রত্যহ দুগ্ধ দেয়, কিন্তু তাহার দাম মাসকাবারে দেওয়া হয়, সুতরাং এই দুগ্ধের হিসাব ধার জমা হইল।

ধার খরচ—জগন্নাথ ধোপাকে কাপড় কাচিবার জন্য ৩০ খানি কাপড় দেওয়া হইল। এটী জগন্নাথের নামে ধার-খরচ পড়িল। পরে যখন জগন্নাথ কাপড় ফিরাইয়া দিবে, তখন তাহার নামে ঐ কাপড় পড়িবে। (৩রা বৈশাখ দেখ)

ধোপাকে কি কি কাপড় দেওয়া হইল, তাহার জন্য একখানি খাতা রাখা কর্ত্তব্য। যেমন ৩০ খানি কাপড় দেওয়া হইলে এই প্রকার লিখিতে হইবে।

নরহরি বাবু—
সাদাধুতি—১
কামিজ—১
পাণ্টলুন—১
চাপকান—১
মোজা—১ জোড়া
রুমাল—১

কার্ত্তিক—
ফ্রক—১
পেনী—১

মহামায়া—
কস্তা পাড়—১

লক্ষ্মী—
লাল পাছা—১
ডুরে—১

রাখালচন্দ্র—
কালাপেড়ে—১
কোট—১
উড়ুনী—১

কৃষ্ণদাস—
পাঞ্জাবী—১
লাল পাড়—১

সরস্বতী—
লেশ পাড়—১
সেমিজ—১

মণিমালা—
বেগুনী দাঁত পাড়—১
বডিস্—১
বিছানার চাদর—২
বালিশের ওয়াড়—৮

মোট- ৩০ খানা

শ্রী......

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

বৃহস্পতিবার ২রা বৈশাখ— ১৫ই এপ্রেল—

জমা—		খরচ—	
নগদ—		নগদ—	
মজুত—	৸৴০	রাখালচন্দ্র রায়—	
রাখালচন্দ্র রায়ের দোকানে—		দোকান ভাড়া	
১লা বৈশাখের বিক্রয়—২০৲		দঃ চৈত্র—	১০৲
		দোকানের জিনিস খরিদ—৫৲	
	২০৸৴০	গোরুর ভূসী	৸৴০
বাদ—	১৮৸৴০	।০	
	২৲	খইল	।১০
		৴৫	
		লক্ষ্মীর শ্বশুরবাড়ীর তত্ত্ব	২৲
		বাজার—	॥০
		জলখাবার	৴১০
		ট্রামভাড়া	৴১০
		ডাকের টিকিট্	৶১০
			১৮৸৴০

রাখালচন্দ্রের দোকানের ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব জন্য দোকানের অন্য খাতা থাকিবে। যে টাকা রাখালচন্দ্র বাড়ীতে দিবে, তাহাই তাহার নামে জমা পড়িবে এবং যে টাকা লইবে, তাহাই তাহার নামে খরচ পড়িবে।

শ্রী......

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

বৃহস্পতিবার— ২রা বৈশাখ— ১৫ই এপ্রেল

জমা—		খরচ—	
ধার—		ধার—	
হলধর দাস—			
নারিকেল তৈল—	॥০		
পতিতপাবন ঘোষ—	।০		
দুগ্ধ—			
⁄১			

শ্রী......

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

শুক্রবার— ৩রা বৈশাখ ১৬ই এপ্রেল—

জমা—		খরচ—	
নগদ—		নগদ—	
মজুত—	২৲	বাজার—	।৷০
	॥০		
	১॥০		

শ্রী......

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

শুক্রবার— ৩রা বৈশাখ— ১৬ই এপ্রেল—

জমা—		খরচ—
ধার—		ধার—
জগন্নাথ—		
৩০ খানা কাপড়		
পতিতপাবন ঘোষ—		
দুগ্ধ—	।০	
/১		

এই প্রকারে সংসারের জমা খরচের হিসাব লিখিতে হইবে। ১লা তারিখের মুদী, গোয়ালা ও ধোপার খরচ বুঝাইবার জন্য পর-পৃষ্ঠায় মাসের শেষ তারিখে একটি হিসাব দেওয়া গেল। শেষ-তারিখে মুদীর মোট কত পাওনা, গোয়ালার মোট কত পাওনা ও ধোপার মোট পাওনা হিসাব করিয়া ধার জমা দেখাইতে হইবে, পরে যখন টাকা দেওয়া হইবে, সেই তারিখে তাহাদের নামে নগদ খরচ লেখা হইবে—যেমন ১লা বৈশাখে লেখা হইয়াছে।

শ্রী......

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

শুক্রবার— ৩১শে বৈশাখ— ১৪ই মে—

জমা—	খরচ—
নগদ—	নগদ—
মজুত—	বাজার ইত্যাদি—

শ্রী......

সন ১৩২২ সাল

ইং ১৯১৫ সাল

শুক্রবার— ৩১শে বৈশাখ— ১৪ই মে—

জমা— খরচ—

ধার— ধার—

পতিতপাবন ঘোষ—*

দুগ্ধ—।০

/১

হলধর দাস—

১লা—১২॥/০

২রা——॥০

ইত্যাদি

মোট—

পতিতপাবন ঘোষ—

বৈশাখ মাস

মোট দুগ্ধ—৭৶০

৮০

জগন্নাথ ধোপা—

বৈশাখ মাস

মোট কাপড়—

৮০ খানা ৪৲

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক—

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (চতুর্থ সংস্করণ) ... ৫৲
২। রামায়ণী কথা (তৃতীয় সংস্করণ) ... ১৷৹
৩। বেহুলা (সপ্তম সংস্করণ) ... ৸৹
৪। জড়ভরত (চতুর্থ সংস্করণ) ... ৸৹
৫। ফুল্লরা (তৃতীয় সংস্করণ) ... ৸৹
৬। সতী (সপ্তম সংস্করণ) ... ৸৹
৭। ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ (পঞ্চম সংস্করণ) ... ৸৹
৮। তিন বন্ধু (তৃতীয় সংস্করণ) সাধারণ সংস্করণ ... ১৲
৯। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ... ৪৲
১০। কাশীদাসী মহাভারত (তৃতীয় সংস্করণ) ... ৫৲
১১। সুকথা ... ৸৹
১২। সতী (ইংরাজী অনুবাদ, গ্রন্থকার কৃত) ... ২৲

[২]

১৩। History of Bengali Language and Literature ১২৲
১৪। Typical selections from old Bengali Literature 2 vols ... ১২৲
১৫। Medeaval Vaisnab Literature of Bengal ২৲
১৬। Chaitanya and his companions ... ২৲
১৭। Folk Lore of Bengal ... যন্ত্রস্থ
১৮। The Bengali Ramayana ... ঐ
১৯। The forces that developed our early Literature ঐ